আঁধার প্রদীপ

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
অক্ষয় তৃতীয়া ১৭ বৈশাখ ১৩৬৪

প্রকাশক :
বিজয়কৃষ্ণ দাস
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬, কলেজ রো
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :
ধ্রুব রায়

মুদ্রক :
শুভাশীষ মজুমদার
চয়নিকা
৪৭ কেশব সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০০৯

আকাশটা লাল হয়ে রয়েছে। জোরে হাওয়া বইছে। হাওয়ার দাপটে গাছগুলো ভীষণ ভাবে দুলছে।

নারকেল গাছগুলোকে দেখলে ভয় লাগছে, এই বুঝি ভেঙে পড়বে। চারিদিকে নিকষ কালো অন্ধকার।

চারিদিকে শুধু সোঁ সোঁ আওয়াজ। ধুলো উড়ছে। মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিড়ে বিদ্যুতের ঝিলিক্, তারপরেই বাজ পড়ার আওয়াজ।

চারিদিকে ক্ষেতের মাঝে সরু আলের উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছে আকাশ। হাতে ছোট একটা সুটকেশ।

আবার বিদ্যুতের চমক্ খেলে যায়। আকাশ হাঁটতে হাঁটতে একবার ওপরের দিকে তাকায়। টর্চের আলো ফেলে অসমান মাটির রাস্তার ওপর দিয়ে আরো তাড়াতাড়ি হাঁটার চেষ্টা করে, কিন্তু হাওয়ার বেগে আর ধুলোর ঝড়ে হাঁটার গতি মন্থর হয়।

আর একটা বিদ্যুতের চমক্। কাছেই কোথাও একটা বাজ পড়ার আওয়াজ হয়। কেমন যেন ভয় ভয় করে আকাশের। আবার একবার ওপরের দিকে তাকায়।

আচম্কা বৃষ্টি শুরু হয়। মুসলধারে বৃষ্টির মধ্যেই আকাশ হাঁটতে থাকে।

হাওয়ার বেগ আর বৃষ্টির দাপটে টর্চের আলোতেও ভালো করে রাস্তা দেখা যায় না। এদিক-ওদিক তাকায় আকাশ।

চারিদিকে শুধু অন্ধকার, গাছপালাগুলো ভয়ঙ্কর ভাবে দুলছে। আকাশের মনে হয় ওরা বুঝি সবাই মিলে আকাশকেই দেখছে।

হাঁটতে অসুবিধা হয় আকাশের। বৃষ্টির জলে সরু আলের মাটির রাস্তা পিছল হয়ে যাওয়ার দরুন মাঝে মাঝে আকাশের পা হড়কে যাচ্ছে। নিজের মনেই বলে, — 'আজ কপালে দুর্ভোগ আছে। এখনো প্রায় চার ক্রোশ। বেঘোরে প্রাণটা না যায়।'

জোরে আওয়াজ করে একটা বাজ পড়ল। মাথা নিচু করে এগিয়ে যায় আকাশ।

হাওয়ার বেগের সাথে বৃষ্টিটা বাড়তে থাকে। ভিজে জবজবে হয়ে, চারিদিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলে, — 'নাহ্, বৃষ্টিটা আবার বাড়ল, কোথাও দাড়ানোরও জায়গা দেখছি না।'

দূরে ক্ষীণ একটা আলো দেখা যায়। সেদিকে এগিয়ে যায় আকাশ।

আলের রাস্তা ছেড়ে চওড়া মাটির রাস্তায় এসে ওঠে। বিদ্যুতের চমকে সামনে কিছু দূরে একটা পুকুরের মতো যেন দেখা যায়। আকাশ টর্চের আলো ফেলে। একটা বড় পুকুর। আকাশ টর্চের আলো ফেলে এগিয়ে যায় দূর থেকে আসা আলো লক্ষ করে।

পুকুরটাকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে গিয়ে সামনের সরু রাস্তাটা দিয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়ে আর একটু এগিয়ে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে পৌছায়। জোরে বিদ্যুতের চমকে বাড়িটাকে একঝলক্ দেখতে

পায় আকাশ। আলোটা বাড়ির জানালা দিয়ে আসছে। টর্চের আলোয় বাড়িটাকে দেখার চেষ্টা করে।

খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়ি, সামনে দালান। বাঁশের খুঁটির ওপর খড়ের ছাউনি নেমে এসেছে। সামনে উঠোন। আকাশ টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করে। মাঝখানে তুলসি মঞ্চ, দালানের ডানদিকের কোনায় আর আকাশের বাঁদিকে দুটো বড় গাছ আর বেড়ার দরজার পাশেই সম্ভবত একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ, কারণ গন্ধরাজ ফুলের একটা সুন্দর গন্ধ অনুভব করে আকাশ। উঠোনের চারিদিকে বাঁশের বেড়া দেওয়া, তার সাথে গায়ে লাগানো বেতের ঝোপ বাড়ির পিছন দিকে চলে গেছে। আকাশের সামনে বাঁশের বেড়ার ছোট দরজা।

একটু ইতস্তত করে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে হেঁটে তুলসি মঞ্চের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দালানে উঠে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। হাতের সুটকেশটা পাশে রেখে, জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ভেতরটা একবার দেখার চেষ্টা করে আকাশ।

ঘরে ছোট একটা টেবিলের ওপর একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। সামনে একটা চেয়ার। এপাশের জানালার কাছ বরাবর তক্তাপোষের ওপর বিছানা পাতা। টেবিলের পাশে মাটিতে জলচৌকির ওপর ছিট্ কাপড়ের আসনের ওপর রাধাকৃষ্ণের দুটি মূর্তির গলায় ফুলের মালা পড়ানো ও তার সামনে একটা ধূপদানি আর দাঁড় করানো একটা প্রদীপ রাখা রয়েছে। ঠাকুরের আসনের পাশে ভেতরের ঘরে যাওয়ার দরজায় পরদা ঝুলছে। খাটের সামনে ডানদিকের দেওয়ালে একজন বিবাহিতা মহিলা হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে কাপড় সেলাই করছে। সামনে মাটিতে বসানো আরো একটা হ্যারিকেন।

আকাশ ঘুরে দাঁড়ায়। বৃষ্টিটা মুসলধারে হয়েই চলেছে, সাথে ঝড়ের তাণ্ডব। আকাশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি পড়া দেখতে দেখতে পকেট থেকে রুমাল বের করে হাতমুখ মুছতে থাকে।

ভিতরের ঘর থেকে মহিলা কণ্ঠের গান শুরু হয়। আকাশ নিজের মনেই বলে, — 'বাঃ! খুব সুন্দর গলাতো মহিলার।'

একদিকে বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ, তার সাথে বিদ্যুতের চমক্, আর একদিকে গানের সুর, অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি করে। ঝড়ের দাপটটা একটু কম মনে হয়।

আকাশ বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে শরীরে লাগাতে একটু শীত শীত করে আকাশের।

অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে বৃষ্টি দেখার চেষ্টা করে আকাশ। ঝাপ্‌সা আস্তরন ভেদ করে টর্চের আলো গিয়ে পড়ে গাছের পাতায়। কি চক্‌চকে আর সজীব লাগছে সবুজ পাতাগুলোকে। একটা পাতা থেকে আর একটা পাতায়, তার থেকে আর একটা পাতায় বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে। কি সুন্দর লাগছে দেখতে। যেন একটা পাতা আর একটা পাতাকে মাতৃস্নেহে জল খাওয়াচ্ছে, আর তার নীচের পাতাটা যেন জলের অপেক্ষায় ওপরের পাতার দিকে তৃষিত নয়নে তাকিয়ে আছে।

আকাশ টর্চের আলোটা সরিয়ে অন্য গাছে ফেলে। সেখানেও একই দৃশ্য।

ভিতরের ঘরে গান গাওয়া শেষ হয় মহিলার। আকাশ টর্চের আলো নিভিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে।

জানালার ওপাশে মহিলাকে দেখা যায়। বাইরের দিকে তাকিয়ে জানালার একটা পাল্লা বন্ধ করে আর একটা পাল্লা বন্ধ করতে যায়। হঠাৎ বিদ্যুত চম্‌কায়। বিদ্যুতের আলোয় আকাশকে একঝলক্ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে মহিলা,— কে?
আকাশ জানালার সামনে আসে। মহিলা ভালো করে দেখার চেষ্টা করে আকাশকে। আবার জিজ্ঞাসা করে,— কে আপনি?
আকাশ ইতস্তত করে উত্তর দেয়,— আমি এই রাস্তা দিয়ে ফিরছিলাম। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি শুরু হওয়াতে এখানে দাঁড়িয়ে গেছি। একটু কমলেই চলে যাব।
মহিলা কয়েক মুহূর্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে জানালা থেকে সরে যায়। আকাশ জানালার কাছ থেকে সরে গিয়ে খুঁটিতে হেলান দিয়ে আবার বাইরের দিকে তাকায়।
ঝড়টা কমে গেছে, কিন্তু বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। আকাশ মনে মনে ভাবে,— 'এই বৃষ্টিতো এক্ষুনি থামবে বলে মনে হচ্ছে না।'
নিজেকেই মনে মনে প্রশ্ন করে,— 'কি করব, চলে যাব? কিন্তু যাবই বা কি করে? এতটা রাস্তা এই বৃষ্টিতে যাওয়া যায়?'

দরজা খোলার আওয়াজে আকাশ ঘুরে দাঁড়ায়।

দরজা খুলে যায়, হ্যারিকেন হাতে বেরিয়ে আসে মহিলা। হ্যারিকেনটা তুলে ধরে আকাশকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করে।

কম বয়সি সুন্দরী এক বিবাহিতা মহিলা। একপ্যাঁচ্ করে ঘরোয়া ভাবে শাড়ি পড়া। কপালে সিঁদুরের টিপ জ্বলজ্বল করছে হ্যারিকেনের আলোয়, সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা-পলা। কোমর অবধি ঘন কালো চুলের ঢল নেমেছে। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আকাশ, আর মনে মনে ভাবে,— 'এই অজ্ পাড়াগাঁয়ে এত সুন্দরী একটা বউ!'
মহিলা প্রশ্ন করে আকাশকে,— আপনি যাবেন কোথায়?
আকাশ উত্তর দেয়,— স্টেশনে যাব, কলকাতায় ফিরব।
— কিন্তু এত রাতে তো গাড়ি পাবেন না। গাড়ি তো চলে গেছে। আবার সেই কাল সকালে। — মহিলা বলে।
আকাশ হাতঘড়িটা হ্যারিকেনের আলোয় দেখার চেষ্টা করে,— সে কি! এখন তো সবে আটটা কুড়ি বাজে, গাড়িতো নটা পাঁচে।
ঘড়ির থেকে মুখ তুলে মহিলার দিকে তাকায় আকাশ। মহিলা হেসে উত্তর দেয়,— আপনার ঘড়ি বোধহয় বন্ধ, নটা বেজে গেছে। ভালো করে ঘড়িটা দেখুন।
আকাশ এগিয়ে এসে হ্যারিকেনের আলোয় ঘড়িটা ভালো করে দেখার চেষ্টা করে। দেখে ঘড়িটা সত্যিই বন্ধ হয়ে গেছে।
— তাই তো, তাহলে?
— এই বৃষ্টি এত তাড়াতাড়ি কমবে বলে মনে হয়না। আপনি বরং ভিতরে আসুন, ভিজে গেছেন পুরো, - বলে মহিলা।
আকাশ দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে বলে,— না না ঠিক আছে। আমি ঠিক চলে যাবো।

মহিলা হেসে বলে,— সংকোচ করার কিছু নেই আপনি ভেতরে আসুন।
কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ইতস্তত করে আকাশ সুটকেশটা তুলে নিয়ে এগিয়ে যায়। মহিলা ঘরে ঢুকে যায় হ্যারিকেন হাতে, পিছনে পিছনে আকাশও ঘরে ঢোকে।

(২)

মহিলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, আকাশ ঘরে ঢুকে আসে। মহিলা দরজা বন্ধ করে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে হ্যারিকেনটা টেবিলে রাখা আর একটা হ্যারিকেনের পাশে রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে,— আমি গামছা দিচ্ছি, সঙ্গে জামাকাপড় আছে?
— তা আছে।
— তাহলে পাল্টে ফেলুন নাহলে গায়ে জল বসবে।
কথাটা বলে মহিলা ভিতরের ঘরে চলে যায়।

আকাশ ঘরের চারিদিক দেখতে দেখতে মনে মনে ভাবে,— 'মেয়েটির সাহস আছে, নাহলে এই দুর্যোগের রাতে অচেনা একজন পুরুষ মানুষকে আতিথেয়তা দেখায়।'

বাইরে একই ভাবে বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ পাওয়া যায়। আকাশ সুটকেশটা খাটের কাছে রাখে।

মহিলা আবার ঘরে ঢোকে, হাতে গামছা আর চিরুনী। আকাশ এগিয়ে যায়।
— নিন,— মহিলা বলে।
আকাশ হাত বাড়িয়ে গামছা আর চিরুনীটা নেয়। মহিলা আবার ভিতরের ঘরে চলে যায়, দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেয় ভিতর থেকে। আকাশ জামা খুলতে থাকে।
ভিতরের ঘর থেকে একনাগাড়ে কাশির আওয়াজ কানে আসে আকাশের। দরজার দিকে একবার তাকিয়ে গায়ের জামাটা খুলে মাটিতে রাখে। গেঞ্জিটা খোলার চেষ্টা করে। ভিতরের ঘর থেকে মহিলার গলা পাওয়া যায়,— খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা?
একজন বয়স্ক পুরুষ কণ্ঠের গলা পাওয়া যায় এবার,— খোকা এলো?
মহিলা উত্তর দেয়,— না বাবা, এসে যাবে এইবার।
— কিন্তু আমার যে সময় কমে আসছে।
— তুমি চুপ করে শোও, এক্ষুনি এসে যাবে।
আবার কাশির আওয়াজ হয়। আকাশ গেঞ্জিটা জামার ওপর রেখে বিছানা থেকে গামছা নিয়ে কোমড়ে জড়ায়।

(৩)

ভিতরের ঘরে তক্তাপোষের ওপর বিছানা পাতা, তার ওপর বালিশে মাথা রেখে এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ শুয়ে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অবিরাম কাশছে। সাগর পাশে বসে বৃদ্ধর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। খাটের পাশে চেয়ারের ওপর একটা হ্যারিকেন রাখা আছে। মাথার দিকে খাটের বাঁদিকে ভিতরের ঘরে যাওয়ার পরদা ঝোলানো আর একটা দরজা।

বৃদ্ধ চোখে দেখে না। বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ, কিন্তু গত তিনদিন ধরে শরীর খারাপটা যেন বেশী হয়েছে। কখনো একটা ঘোরের মধ্যে থাকছে, আবার কখনো হুঁশ থাকছে। এখন যেটা

বলছে, কিছুক্ষণ পরে আর মনে থাকছেনা সেটা। ছেলের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। যতক্ষণ হুঁশ থাকছে খালি ছেলের কথাই জিজ্ঞাসা করছে। আজ সকাল থেকে যেন একটু বেশী রকমই বাড়াবাড়ি হয়েছে। সাগরের কেন জানিনা মনে হচ্ছে, সময় খুব কম। কাশতে কাশতে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে সাগরকে,-- এখনো এলোনা?

— তুমি চুপ করে শোও-তো, কথা বললে কাশি বাড়বে।

— খোকা কখন আসবে মা?

— এইতো এসে যাবে এবার।

— আমার বোধহয় যাওয়ার সময় হোল।

— কিছু হয়নি তোমার, তুমি কথা বোলনা বাবা, একটু ঘুমোনোর চেষ্টা করতো।

বৃদ্ধ মুখ দিয়ে আওয়াজ করে,— ওফ্ — ওফ্ — কি কষ্ট।

চুপ করে যায় বৃদ্ধ। চিন্তিত মুখে সাগর খাট থেকে নেমে যেখানে জলের কলসীটা রাখা আছে এগিয়ে গিয়ে কলসীর ওপর উপুর করা গ্লাসটা নিয়ে তাতে কলসী থেকে জল ঢালে। তাক্ থেকে রাংতার ওষুধের পাতা নিয়ে তার থেকে একটা ট্যাবলেট্ ছিঁড়ে বার করে আবার খাটে এসে বসে বৃদ্ধকে ডাকে,— বাবা —

বৃদ্ধ কোন সাড়া দেয় না। সাগর আবার ডাকে,— বাবা —

এবার সাড়া পাওয়া যায় বৃদ্ধর,— উঁ।

— এই ওষুধটা খেয়ে নাও তো।

— এই তো খেলাম।

— না বাবা, সেই বিকেলে ওষুধ খেয়েছ।

— ও — আচ্ছা দাও।

সাগর বৃদ্ধর মাথাটা একটু তুলে ধরে আধশোয়া করে, তারপর ওষুধটা মুখে দিয়ে আলগোছে জল খাইয়ে দেয়।

বৃদ্ধকে আবার শুইয়ে দিয়ে শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে দেয়। খাট থেকে নেমে গিয়ে তাকের ওপর গ্লাসটা উপুর করে রেখে এগিয়ে এসে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধর দিকে। মনে মনে বলে,— 'হে মধুসূদন, তুমি দেখো, তুমি রক্ষা কোরো।'

(৪)

জামার শেষ বেতামটা আটকে চিরুনী দিয়ে আন্দাজে মাথাটা আঁচড়ে নিয়ে বিছানার ওপর থেকে গামছাটা তুলে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর গামছা আর চিরুনীটা রাখে আকাশ। ভিজে জামাকাপড় গুলো দেওয়ালের ধারে পড়ে আছে। এগিয়ে এসে সুটকেশটা বিছানার ওপর রেখে সুটকেশটা খুলে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট বার করে, সুটকেশটা বন্ধ করে এগিয়ে এসে নীচু হয়ে জামাকাপড় গুলো প্যাকেটে ঢুকিয়ে মেঝেতে রেখে দেয়। তারপর উঠে জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়।

বাইরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে একই রকম ভাবে। ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগে আকাশের মুখে।

আকাশ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে ভাবে,— এতো ভালো বিপদে পড়া গেল।

শেষ পর্যন্ত রাতটা এখানেই কাটাতে হবে নাকি?

ভিতরের দরজায় দুবার ঠক্ ঠক্ করে আওয়াজ হয়, সাথে মহিলার গলা পাওয়া যায়,— আসব?
আকাশ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে,— আসুন।
দরজা খুলে পর্দা সরিয়ে সাগর ঢোকে। বাইরে বিদ্যুত চমকায়, ঘরের ভিতরে আলোর ঝিলিক্ খেলে যায়। সাথে সাথেই জোরে বাজ্ পড়ার আওয়াজ হয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে সাগর বলে,— এই বৃষ্টি এত তাড়াতাড়ি কমবে বলে মনে হয়না, তাছাড়া রাস্তার অবস্থাও ভালো নয়। এই দুর্যোগে, অন্ধকারে যাওয়াটা ঠিক হবে না, অনেকটা রাস্তা।
দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে চিন্তিত মনে আকাশ বলে,— কিন্তু —
ভিতরের ঘরে আবার কাশির আওয়াজ পাওয়া যায়।
— আজ আপনি থেকেই যান। যাওয়াটা ঠিক হবে না। একটু অসুবিধা হবে আপনার, একটা রাতের ব্যাপারতো।
— পাশের ঘরে আপনার বাবা?
— না, আমার শ্বশুর মশাই।
— আপনার স্বামী?
— উনি বাইরে থাকেন।
মনে মনে ভাবে আকাশ,— এভাবে কারুর স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার বাড়ীতে রাত কাটানোটা ঠিক নয়। তার ওপরে আবার সম্পূর্ণ অপরিচিতা। আমি-ত চলে যাব, কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীরা জানতে পারলে হয়ত নানাজনে নানারকম কথা বলবে। গ্রামের সরল সোজা মেয়ে বুঝতে পারছে না। আতিথেয়তা দেখাতে গিয়ে পরে শেষে বিপদে পড়বে।
সাগর হেসে জিজ্ঞাসা করে,— কি হোল, কি ভাবছেন?
আকাশ তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়,— না না আমি ঠিক চলে যাব।
সাগর বুঝতে পারে আকাশের সংকোচের কারণটা।

হাওয়ায় খাটের ওদিকের জানালাটা খুলে যায়, ঘরে এক ঝলক্ ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঢোকে। সাগর তাড়াতাড়ি খাটে উঠে জানালা বন্ধ করার আগেই আর একবার বিদ্যুতের ঝিলিক্ খেলে যায়। সাগর তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দেয়। দূরে কোথাও বাজ পড়ার শব্দ শোনা যায়।

খাট থেকে নেমে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— বাগাঘাট এতক্ষণে জলে থৈ থৈ করছে। পারবেন না যেতে, এতো সংকোচ করছেন কেন? আপনার কোন চিন্তা নেই, থেকে যান আজকের রাতটা।
ভিতরের ঘর থেকে আবার কাশির শব্দ আসে। সাগরের শ্বশুরমশাইয়ের গলা পাওয়া যায়,— খোকা এলি?
আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— কি হয়েছে ওনার?
— আজ সকাল থেকেই শরীরটা বেশ খারাপ হয়েছে। মাঝে মাঝে ঘোরের মধ্যে কথা বলছেন, ছেলেকে দেখতে চাইছেন। আমার স্বামী অনেকদিন হল বাইরে আছেন।
— ডাক্তার দেখান নি?
— লাভ হোত না। পাশের গ্রামে একজন ডাক্তার আছেন, উনি মাঝে দেখতেন। হাল ছেড়ে দিয়েছেন। তিন-চার দিন আগে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু ওখানে না আছে

ডাক্তার, না আছে ওষুধ। নামেই হাসপাতাল, ভর্ত্তি নেয়নি।
— আমি একবার দেখব?
— আপনি? — একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করে, সাগর।
— আমি একজন ডাক্তার।
— ও আচ্ছা আচ্ছা, ভালোই হল আসুন।
সাগর এগিয়ে গিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে যায়। আকাশ সুটকেশ খুলে স্টেথোটা বার করে সুটকেশটা বন্ধ করে এগিয়ে গিয়ে ভিতরের ঘরে ঢোকে।

(৫)

সাগর ভিতরের ঘরে ঢুকে বিছানায় এসে শ্বশুরের পাশে বসে। একটু পরেই আকাশ স্টেথো হাতে ঘরে ঢুকে এগিয়ে এসে বিছানায় বসে। স্টেথোটা কানে লাগিয়ে বৃদ্ধর বুক দেখে। আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— একটু ওপাশ ফেরাতে হবে।
সাগর ডাকে,— বাবা —
কোন সাড়া পাওয়া যায় না। সাগর আবার ডাকে,— বাবা একটু ওপাশ ফেরো তো।
বৃদ্ধ পাশ ফেরার চেষ্টা করে। আকাশ ও সাগর ধরে ধরে পাশ ফিরিয়ে দেয়। পাশ ফিরে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে,— কে?
সাগর বলে,— ডাক্তারবাবু এসেছেন বাবা।
— ডাক্তার বাবু এসেছেন? - ও - খোকা এসেছে?
— আসার সময় হয়ে গেছে বাবা।
আকাশ পিঠে স্টেথো লাগিয়ে দেখতে থাকে।
— কটা বাজে মা?
— ট্রেনের সময় হয়নি এখনো বাবা।
বৃদ্ধ চুপ করে যায়। আকাশ কান থেকে স্টেথোটা খুলে নেয়। সাগর শ্বশুরকে চিৎ হয়ে শুতে বলে। আকাশ ও সাগর ধরে ধরে চিৎ করে শুইয়ে দেয়। আকাশ এবার একটা হাত ধরে পাল্‌স দেখতে থাকে। পাল্‌স দেখা হয়ে গেলে কপালে চিন্তার ভাঁজ নিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— আগের প্রেসক্রিপ্‌সান-টা নিয়ে আসুন একবার। সাগর বিছানা থেকে নেমে তাকটার দিকে এগিয়ে যায়। আকাশ পর্দা সরিয়ে বাইরের ঘরে চলে যায়।

(৬)

আকাশ সুটকেশটা খুলে স্টেথোটা ঢুকিয়ে সুকেশটা বন্ধ করে দেয়। বিছানার ওপর বসে পড়ে। মনে মনে ভাবে,— যা অবস্থা দেখছি তাতে বড়োজোর এক-দুদিন। সাগর ঘরে ঢোকে, হাতে প্রেসক্রিপসানটা ধরা। এগিয়ে এসে আকাশকে দেয়।

প্রেসক্রিপসানটা দেখে আকাশ সাগরকে বলে,— আমি ভালো বুঝছিনা, বুকের অবস্থা ভালো নয়। সাগর চুপ করে থাকে। প্রেসক্রিপসানটা ফেরৎ দিয়ে দেয় আকাশ। বলে,— ঠিক আছে, আজকে থেকে যাচ্ছি আমি।
সাগর জিজ্ঞাসা করে,— আজকের রাতটা —

কথা শেষ করতে না দিয়ে আকাশ বলে,— এত তাড়াতাড়ি হয়ত কিছু হবে না, কিন্তু বড়োজোর বাহাত্তর ঘণ্টা।
একটু চুপ করে থেকে সাগর বলে,— আপনি বসুন আমি আসছি। সাগর চলে যায় ভিতরের ঘরে আকাশ দালানের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। আকাশ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে তার থেকে একটা সিগারেট বার করে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে। প্যাকেটটা পকেটে ঢুকিয়ে দেশলাই বার করে জ্বালানোর চেষ্টা করে। দেশলাইটা বৃষ্টিতে ড্যাম্প হয়ে গেছে। চার পাঁচ বার চেষ্টা করার পর কাটিটা জ্বলে। আকাশ সিগারেটটা ধরায়। পোড়া কাটিটা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে সিগারেটটায় একটা লম্বা টান দেয়। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকিয়ে থাকে বাইরের অন্ধকারে।

রাত্রি বেলা বৃষ্টি হলে বেশ ভালো লাগে আকাশের। রাত্রে শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে খুব ভালো লাগে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। শহরের বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ আর গ্রামের বৃষ্টি পড়ার আওয়াজের মধ্যে অনেক তফাৎ। এখানের অনুভূতিটা যেন আরও বেশী। অন্তত আকাশের-ত তাই মনে হয়।

জানালার ওপর কনুই দুটো রেখে, সিগারেটটায় টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে চুপচাপ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ শোনে।

নিজের অজান্তেই আকাশের মনটা চলে যায় আর একটা বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যায়।

(৭)

সবে অন্ধকার নেমেছে, মুসলধারে বৃষ্টির জন্য চারিদিক ঝাপসা হয়ে রয়েছে। আউট্রাম ঘাটের গঙ্গার পারে একটা ঝুড়ি বিস্তার করা ডালপালা প্রসারিত বিশাল ঝাঁকড়া বট গাছের নীচে আকাশ আর সুলেখা দাঁড়িয়ে বৃষ্টি থেকে বাঁচার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে ভিজে জামাকাপড়ে এদিক-ওদিক তাকায় দুজনে।

বড়লোকের মেয়ে সুলেখা। নিজের ফিগারের ব্যাপারে খুব সচেতন। নিয়মিত যত্ন ও পরিচর্যা করে শরীরের। যেকোন পুরুষের কাছে সুলেখার শারীরিক কাঠামোটা যে আকর্ষনীয় সেটা সুলেখা জানে। তাই শাড়ী পড়ার সময় কোমড় থেকে একটু নীচু করে পরে সুলেখা নিজের ফিগারের যথাযথ মর্যাদাও দেয়।

পাতলা শাড়ীটা বৃষ্টির জলে ভিজে সুলেখার শরীরে সেঁটে গেছে একেবারে। সামনে পিছনে অনেকটা নীচু গোল করে কাটা স্লিভ্‌লেস ব্লাউজের ওপর ভিজে শাড়ীতে সুলেখার যৌবন যেন আরো ফুটে বেরোচ্ছে।

সুলেখা নিজের শরীরটা একবার দেখার চেষ্টা করে। বুক, পেট, কোমড়। তারপর শাড়ীর কুঁচিটা ধরে জল ঝাড়ার চেষ্টা করতে করতে একবার আড়চোখে আকাশকে দেখে নেয়।

আকাশ একমনে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজের ভিতরের আলো এসে পড়ে জলের সাথে মিশে একসাথে যেন নেচে বেড়াচ্ছে। তার ওপরে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়ে

কেমন ছোট ছোট গোলাকার তরঙ্গের সৃষ্টি করছে। বেশ লাগছে দেখতে। সুলেখার সেদিকে কোন লক্ষ নেই, নিজের শাড়ী ঠিক করতেই ব্যস্ত। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আকাশ সুলেখাকে বলে,— দেখো কি সুন্দর লাগছে।

সুলেখা বিরক্ত হয়ে বলে,— দূর, আমি ভাবছি আমার শাড়ীর কথা, আজ সকালেই অঞ্জন আমাকে এটা প্রেজেন্ট করেছে, তেইশশো টাকা দাম। কি যে অবস্থা হল শাড়ীটার। এটা পড়েই আজ ডিনার করতে যাওয়ার কথা। একদম্ নষ্ট হয়ে গেল শাড়ীটা। সব তোমার জন্য হল। আমি তখনই বললাম, চল ট্যাক্সি করে চলে যাই। এখন গঙ্গার পাড়ে প্রেম করার মজা দেখ। তোমার আর কি বল, শাড়ীটাতো আমার নষ্ট হল।

আকাশ কোন উত্তর না দিয়ে সুলেখাকে জিজ্ঞাসা করে,— কোথায় যাচ্ছ?

অন্য দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয় সুলেখা,— অঞ্জন বলেছে আজ আমাদের গ্র্যাণ্ডে খাওয়াবে। অঞ্জনের বাবার বিরাট ব্যবসা। একটা মাত্র ছেলে। কলকাতায় পাঁচটা বাড়ি, দিল্লীতেও দুটো ফ্ল্যাট আছে। এমনিতেই তিনটে গাড়ি, আবার একটা কিনছে।

আকাশ গঙ্গার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,— তোমার বাবা কি বলছেন?

সুলেখা কাঁধ ঝাকিয়ে বলে,—'বাবা-মা-ত চাইছে আমি অঞ্জনকেই বিয়ে করি।

— মুখ দিয়ে আওয়াজ করে একটা জোরে নিঃশ্বাস ফেলে মজা করে আকাশ বলে,— বড়লোকের একমাত্র ছেলে বলে কথা।

সুলেখা আকাশের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে,— সাধারণ এম.বি.বি.এস ডাক্তারের সাথে বাপী আমার কিছুতেই বিয়ে দেবে না। তোমায় বিদেশ যেতেই হবে, যেভাবেই হোক। তবেই তুমি বড় ডাক্তার হতে পারবে। গাড়ী, বাড়ি, অর্থ, যশ সব হবে। দেখ আকাশ, সাধারণ ভাবে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।

সুলেখার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে আকাশ, জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়,— 'বিদেশে ডাক্তারী পড়তে যাওয়াটা কি শুধুই ডিগ্রীর মোহে, না শেখার জন্য? আর বড় ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছেটা কি আরো বেশী অর্থ উপার্জন, নাকি আরো ভালোভাবে মানুষের সেবা করা।'

আকাশ মনে মনে ভাবে সুলেখাকে এইসব প্রশ্ন করা মানে শুধুই কথা আর সময়ের অপচয়। গঙ্গার দিকে মুখ ফেরায় আকাশ।

— কি হল? কিছু বলছ না যে? — আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে সুলেখা।

— বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছে আমারও আছে, তবে ডিগ্রীর মোহে নয়, শেখার জন্য, সত্যিকারের বড় ডাক্তার হওয়ার জন্য। কিন্তু লেখা, একজন ডাক্তারী পড়তে আসা গ্রামের ছেলের পক্ষে বিদেশ যাওয়ার খরচ যোগাড় করা যদি সম্ভব না হয়!

রেগে যায় সুলেখা, বলে,— আমি এসব শুনতে চাই না আকাশ। আমি জীবনটা উপভোগ করতে চাই। হোটেল, ক্লাব, পার্টি। অঞ্জন বলে চেষ্টা করলে সব হয়।

বোঝাবার চেষ্টা বৃথা বুঝে আকাশ চুপ করে থাকে।

(৮)

— কই, আসুন —

পিছন থেকে সাগরের ডাকে সম্বিত ফিরে আকাশের চিন্তাছিন্ন হয়।

জানালা থেকে মুখ সরিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় আকাশ। সাগর থালায় করে ভাত তরকারী মাটিতে রেখে,

জলের গ্লাসটা পাশে রাখে। থালা থেকে তরকারীর বাটি দুটো তুলে মাটিতে রাখে। সাগরের আতিথেয়তা দেখে আকাশের অস্বস্তি হয় মনে মনে। বলে,— এসব কি করেছেন?
কোমরে গোঁজা আসনটা মাটিতে পাততে পাততে সাগর হেসে বলে,— সারারাত উপোসী থাকবেন?
— এত কিছুর দরকার ছিলনা, একটু মুড়ি হলেই চলত।
— বেশী কিছুই দিইনি। চলুন হাত ধোবেন।

আকাশ দরজা খুলে বাইরে দালানে গিয়ে দাঁড়ায়।

সাগর এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে জলের ঘটিটা নিয়ে বাইরে আসে। বাইরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে।

সাগর ঘটি থেকে জল ঢালে, আকাশ হাত ধুয়ে ঘরে ফিরে আসে। সাগর পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর ঘটিটা রেখে তার ওপর ঢাকনাটা চাপা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। আকাশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে,— কি হল বসুন —
— এত খেতে পারব না।
— খুব পারবেন, বসুন তো।

আকাশ আসনের ওপর বসে খাওয়া শুরু করে।
— আপনি খাবেন না?
— পরে খাবো। আগে বাবাকে খাওয়াবো, তারপর।
আকাশ মাথা নীচু করে খেতে থাকে। সাগর সামনে বসে থাকে।

সাগর জিজ্ঞাসা করে,— কোথায় গিয়েছিলেন?
খেতে খেতে আকাশ উত্তর দেয়,— কাজল ডাঙা, কয়েকদিন থাকার কথা ছিল।
সাগর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,— সেতো অনেক দূর। এখান থেকে চার ক্রোশ। ওখান থেকে এই ঝড় বৃষ্টিতে হেঁটে হেঁটে আসছেন?
আকাশ মুখে ভাত নিয়ে উত্তর দেয়,— হ্যাঁ, যাদের বাড়ি গিয়েছিলাম তারা কেউ নেই। বাইরে গেছে বেড়াতে।
— আজ তাহলে সারাদিন বিশ্রামও হয়নি, খাওয়াও হয়নি, তারওপর এতটা পথ হাঁটা, অথচ খাবেন না বলছিলেন। আমি তখনই আপনার মুখ দেখে বুঝেছিলাম। — হেসে কথাগুলো বলে সাগর।
সাগরের কথায় কেমন যেন মাতৃসুলভ স্নেহ ফুটে ওঠে। আকাশ মনে মনে ভাবে,— 'একজন অপরিচিতর জন্য এবকম আতিথেয়তা বোধহয় গ্রামের সহজ সরল মহিলা বলেই সম্ভব।'
আকাশ হেসে জিজ্ঞাসা করে,— আপনি তাহলে মানুষের মুখ দেখে তাকে বুঝতে পারেন?
সাগর হেসে উত্তর দেয়,— সবার নয়, তবে কিছু কিছু মানুষকে দেখলে বোঝা যায়।
ভাতের ওপর ডাল ঢালতে ঢালতে মজা করে আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— তাই, তা আমায় দেখে আর কি কি বুঝলেন?
সাগরের সপ্রতিভ উত্তর,— এই, যে আপনি মানুষটা খারাপ না।
-- ব্যাস! তাই বুঝি আমাকে ঘরে ঢুকতে দিতে ভয় হয়নি?

— এই দুর্যোগের রাতে আপনি আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। আমার অতিথি, আর অতিথি নারায়ণ। আমি তাকে কখনো ঘরের বাইরে রাখতে পারি?
আকাশ হেসে বলে,— কিন্তু আমি যদি দুষ্টু নারায়ণ হতাম?
— তাহলে আমার মধুসূদন আমায় বাঁচাত, যেমন এতদিন বাঁচিয়েছেন।
একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় সাগর। আকাশ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,— সে আবার কে?
জলচৌকির ওপর বসানো রাধাকৃষ্ণের মূর্তি দেখিয়ে সাগর বলে,— কেন ওই যে —
আকাশ রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটা একবার দেখে সাগরের দিকে তাকায়। মনে মনে ভাবে,— 'এদের অন্ধবিশ্বাস যে কবে যাবে।'
আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— খুব পূজো আর্চ্চা করেন?
সাগর হেসে উত্তর দেয়,— পূজো আর্চ্চা বলতে যা বোঝায় তার কিছুই করিনা আমি। দিনান্তে একবার ফুল-মালা দিই। মনের যত কথা বন্ধুকে বলি, আর যখন খুব মন খারাপ লাগে তখন তার কাছে কাঁদি।
খেতে খেতে অবজ্ঞা ভরে অলস ভাবে জিজ্ঞাসা করে আকাশ,— লাভ হয়?
— আমরা কজন সবসময় লাভ-লোকসানের বিচার করে কাজ করি বলতে পারেন? অনেক কাজই আমরা করি যেগুলো করতে আমাদের ভালো লাগে, মন চায়। — হেসে উত্তর দেয় সাগর।
আকাশের থালার ভাত কমে আসে।
— আর একটু ভাত দিই। আপনার পেট ভরেনি। - সাগর বলে।
আকাশ বাধা দিয়ে বলে,— না না, রাত্রে আমি এর থেকেও কম খাই। আজ বরং একটু বেশীই হয়ে গেল।
— রান্না ভাল লাগছে না?
— না না খুব সুন্দর রান্না হয়েছে। অনেকদিন পরে এতো ভালো রান্না খেলাম। ঠিক আমার মায়ের মতো।
ভেতরের ঘর থেকে কাশির আওয়াজ পাওয়া যায়।
— বাবা বোধহয় উঠে পড়েছে আবার, আপনি খান আমি এক্ষুনি আসছি।
সাগর উঠে পড়ে ভেতরের ঘরে চলে যায়।
আকাশ খেতে খেতে ভাবে,— 'মহিলা বেশ চট্ করে মিশে যেতে পারে মানুষের সাথে।'

(৯)

বিছানায় শুয়ে পায়ের দিকে জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে আকাশ। কিছু দেখা যাচ্ছে না, ঘুট ঘুটে অন্ধকার। শুধু বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ আর তার সাথে একনাগারে ব্যাঙেদের ডাক কানে আসছে। একসাথে যেন হাজার হাজার ব্যাঙ গলা মিলিয়ে ডাকতে শুরু করেছে। তার সাথে সুন্দর করে, সুক্ষ্ম ভাবে তাল বজায় রেখে চলেছে ঝিঁঝির আওয়াজ।

লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে মাথার দিকে মেঝেতে রাখা রয়েছে। নতুন জায়গায় ঘুম আসছে না আকাশের। একমনে বৃষ্টির আওয়াজ শুনছে। কত রকমের আওয়াজ হচ্ছে। রক্তিমের কথা মনে পরে আকাশের।

কলকাতায় ডাক্তারী পড়ার সময় আলাপ হয়েছিল আকাশের সাথে। সুদর্শন রক্তিমের চেহারার সাথে তার মনের মিল ছিল।

রক্তিম বলতো,— 'পাখিদের ডাক আর বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ থেকেই সঙ্গীতর সৃষ্টি, আর হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রনা থেকে শিল্পের সৃষ্টি। এটা অদ্ভুত একটা অনুভূতির ব্যাপার। সবাই অনুভব করতে পারে না।'

অদ্ভুত জেদী, খেয়ালী আর শিল্পীমনের ছেলে এই রক্তিম। খুব কাছ থেকে যে না দেখেছে সে ওকে বুঝতে পারবে না। এইমুহুর্তে যে লোকটার ওপর রেগে গিয়ে যা-তা বলেছে, পরমুহূর্তে তাকে আবার কাছে টেনে নিয়েছে। এমন দিনও গেছে, নিজে অভুক্ত থেকে পকেটে সামান্য যে পয়সা আছে তার সবটাই দিয়ে এসেছে আর একজন কোন অভুক্ত মানুষকে। এরকম বহুদিন গেছে রক্তিমের পকেটে সারাদিন একটা পয়সাও নেই, খাওয়া জোটেনি, অথচ ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ছেলেটার মুখের হাসিটা কেউ কেড়ে নিতে পারে নি। এই নিয়েই নিজের লেখা কতো কবিতা শুনিয়ে গেছে। এটাই বোধহয় শিল্পী মনের বৈচিত্র।

দুটো ঘটনা আকাশের মনে পড়ে যায়।
'একবার কোন এক বয়স্ক রিক্সা ওয়ালাকে পিচ্ গলা রোদ্দুরে খালি পায়ে রিক্সা চালাতে দেখে, আগের দিন কেনা নতুন চটিটা দিয়ে খালি পায়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল।

আর একদিন —
দুপুর বেলা পকেটে আড়াই হাজার টাকা নিয়ে বাসে করে ফিরছিল। ভীড়ে ঠাসা বাস থেকে নামার সময় গেটের সামনে চেঁচামেচি শুনে মুখ বাড়িয়ে দেখে, একজন মাঝবয়সী লোককে কয়েকজন মিলে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। রক্তিম জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে যে লোকটার অপরাধ হোল, এই ভর দুপুরে মদ খেয়ে বাসে উঠেছে। রক্তিম তাড়াতাড়ি করে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে লোকটাকে নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়ে। সামনের চায়ের দোকান থেকে জল নিয়ে লোকটার মুখের রক্ত পবিস্কার করতে করতে লোকটাকে সেদিন বলেছিল,— ভরদুপুরে বেহেড মাতাল হয়ে ভীড় বাসে উঠতে আপনার লজ্জা করল না? বয়স তো কম হল না। আজ আমি আপনাকে না বাঁচালে তো মরেই যেতেন।
লোকটা তার উত্তরে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি নিয়ে বিষ ছড়ানো জড়ানো গলায় বলেছিল,— না লজ্জা করে না। যার একমাত্র ছেলে পেটের যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে হাসপাতালের মাটিতে শুয়ে থাকে, আর সেই ছেলের মা হাসপাতালের দরজার সামনে আকুল নয়নে বসে থাকে স্বামীর পথ চেয়ে, কখন তার স্বামী ছেলের অপারেশনের টাকা যোগাড় করে আনবে, আর সেই অপদার্থ স্বামী, অসহায় বাপ যখন সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে টাকা যোগাড় করতে ব্যর্থ হয়ে ভাবে কি মুখ নিয়ে হাসপাতালে ফিরে স্ত্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন একপেট মদ গিলে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য বাসে উঠতে তার লজ্জা করে না।
সেদিন রক্তিম লোকটার কাছ থেকে কথা গুলো শুনে একটুও সময় নষ্ট না করে, লোকটার সাথে হাসপাতালে গিয়ে ওনার স্ত্রীর হাতে পকেটের সব টাকা দিয়ে বলে এসেছিল,— মা, আপনার ছেলে ভালো হয়ে গেলে মায়ের মন্দিরে পাঁচ সিকের পূজো দিয়ে দেবেন।' ওর নিজের লোকেরাই ওকে কোনদিন বোঝেনি। রক্তিমের দিদি রক্তিমের খুব প্রিয় ছিল। খুব ভালোবাসতো দিদিকে, সমস্ত মনের কথা বলতো দিদির কাছে। অভাবের তাড়নায় বেশ কয়েকবার হাত পেতে

আর্থিক সাহায্যও নিতে হয়েছিল দিদির কাছ থেকে। রক্তিম বুঝতে পারত দিদি অসন্তুষ্ট হচ্ছে, তাসত্ত্বেও কোন উপায় থাকত না। অবশ্য দিদিরও অসন্তুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। বেশীর ভাগ টাকাটাই শোধ করতে পারত না রক্তিম। কোন এক দুর্গা পূজোর আগে সেই দিদিই একদিন খুব সামান্য একটা অজ্ঞাত কারণে নিজের মনগড়া নীতির যুক্তি খাড়া করে রক্তিমের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে দেয়। রক্তিমের ছেলে মেয়েকে দেওয়া পূজোর জামাকাপড় কেনার টাকা ফেরত চেয়ে নিয়েছিল। ছেলেমেয়েদের সেই টাকায় আগেই জামাকাপড় কেনা হয়ে গিয়েছিল, তাই রক্তিমকে সেই টাকা সুদে ধার করে এনে ফেরত দিতে হয়েছিল। খুব কষ্ট পেয়েছিল সেদিন রক্তিম। আকাশকে এসে বলেছিল এজীবনে আর কোন দিন দিদির সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না।

আকাশের সাথে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল রক্তিমের। কোথায় যেন একটা মনের মিল খুঁজে পেত আকাশ রক্তিমের সাথে।

খুব ভালো লেখার হাত ছিল রক্তিমের। ভগবান দত্ত গানের গলা ছিল। অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর চাইতে ভালো গান গাইর্তে পারতো, গানের চর্চা না করেই। খুব সুন্দর অভিনয়ও করতো। কয়েকটা বাংলা ছবিতে অভিনয়ও করেছে।

রক্তিম খুব ছোট একটা প্রিন্টিং-এর ব্যবসা করত। কিন্তু বরাবরের ইচ্ছা ছিল অভিনয়কে পেশা করবে। জোর দিয়ে বলতো,— 'দেখিস আকাশ, আমি একদিন খুব বড় অভিনেতা হবো।'
কিন্তু পরিচালকের দরজায় দরজায় গিয়ে বহুভাবে চেষ্টা করেও কিছু করে উঠতে পারেনি ছেলেটা। খুব যখন হতাশ হয়ে পড়তো, মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়ে, আকাশকে মনের সব কথা বলে একটু হাল্কা হোত। বলতো,— 'নারে আকাশ, আমার দ্বারা হবে না। আমার ভাগ্যে নাম যশ নেই। আমার ভাগ্যটাই মন্দ, নাহলে এতচেষ্টা করা সত্ত্বেও ব্যর্থ হই। আসলে কি জানিস, মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে তখন তার প্রতিমুহূর্তের ভাগ্যের ফলাফলটা সঙ্গে নিয়েই আসে। তার বাইরে আমরা কেউ যেতে পারি না। আমি জানি, তোরা আমার একথা বিশ্বাস করবি না, কিন্তু এ আমার জীবনের অভিজ্ঞতা ভাই।'
আকাশ কোন কথা না বলে চুপ করে রক্তিমের কথা শুনে ওকে একটু হাল্কা হতে দেওয়ার চেষ্টা করত।

সুন্দর করে কথা বলতে পারত রক্তিম। বলত,— 'দেখ্, আমরা কোন মানুষ সম্পূর্ণ নই। অথচ এই আমরাই সম্পূর্ণতার খোঁজে দৌড়ে বেড়াই, একজনকে ছেড়ে আর একজনের পিছনে। তাকে কাছে পেয়ে দেখি যেটা চেয়েছিলাম সেটা হয়ত তার মধ্যে আছে, কিন্তু আগের জনের মধ্যে যেটা ছিল এর মধ্যে সেটা আবার নেই। তখনই আমাদের মন চায় আবার অন্য জনের খোঁজ। এইভাবেই কত মানুষ দৌড়ে বেড়াচ্ছে পাগলের মতো সম্পূর্ণতার খোঁজে। না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ছে বোকাগুলো। আসলে সম্পূর্ণতার চাবিতো আমাদের মনের মধ্যেই আছে। আমরা নিজেরাই একমাত্র পারি আমাদের মন দিয়ে অপরের অপূর্ণতাকে সম্পূর্ণতায় ভরিয়ে তুলতে।'

রক্তিম সাথে আর দেখা হয় না আকাশের। ঈশ্বরে বিশ্বাসী, সকাল-সন্ধ্যে ঠাকুর ডাকা, পরোপকারী, অভাবী এই ছেলেটা দুচোখে বড় শিল্পী হওয়ার সোনার স্বপ্ন নিয়ে — এতবড় সংসার চালাতে গিয়ে ধার-দেনায় জর্জড়িত হয়ে, চূড়ান্ত অভাবের মাঝেও হার না মানা জেদ

নিয়ে লড়াই করেও হতাশ হয়ে, হৃদয়ের মধ্যে ব্যর্থতার যন্ত্রনা নিয়ে, নীরবে চোখের জল ফেলে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

অনেক চেষ্টা সত্বেও প্রতিভার প্রকাশ করতে পারেনি রক্তিম। কেউ জানতেও পারেনি যে, অকালে — সবার অলক্ষ্যে এক শিল্পীমনের নিঃশব্দে মৃত্যু হয়ে গেছে। আসলে কেউ কোনদিন বোঝার বা জানার চেষ্টা করেনি রক্তিমকে।

রক্তিমরা হারিয়েই যায় একসময় জনতার ভীড়ে, কিন্তু রেখে যায় আজীবন তার শিল্পীমনের পরিচয় ও শিল্পীস্বত্তার ছাপ আকাশেরই মতো কোন এক বন্ধুর স্মৃতির মণিকোঠায়।

আকাশ মনে মনে ভাবে,— রক্তিমরা হারিয়ে গেলেও, পরাস্ত হয়েছে ভেবে হতাশ হলেও আসলে এরা হারে না। হারতে পারে না! এমনকি চারিপাশের সমস্ত সাহায্যের হাত যদি বন্ধও হয়ে যায় তাহলেও না। জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে না পারলেও অদম্য লড়াই করার মানসিকতা নিয়ে আজীবন, আমৃত্যু চোয়াল চাপা লড়াই চালিয়ে যায় এরা। কারণ রক্তিমরা সুজয় নয়।

আকাশের মনে পড়ে, রক্তিম আকাশকে বলেছিল,— 'যে ভাবেই হোক তোকে বিদেশ যেতেই হবে।'
আকাশ হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল,— 'আমি বিদেশ গেলে তোর লাভ?'
রক্তিম অবাক চোখে বলেছিল,— 'বা-রে, তুই আমার বন্ধু না! তুই বড় ডাক্তার হলে, আমিও তো সবাইকে বলতে পারবো। কত আনন্দ হবে আমার বলতো?'
একটু চিন্তা করে আবার বলেছিল,— 'তুই যেমন চেষ্টা করছিস কর, আমিও তোর জন্য চেষ্টা করছি।'
— 'তুই আবার কি চেষ্টা করবি?'
— 'কেন, টাকা ধার করে আনবো!'
— 'সে তো অনেক টাকা! শোধ করবি কি করে?'
— 'সে একটু একটু করে শোধ করে দেব। ওনিয়ে তুই ভাবিস না।'

আকাশ সেদিন একটু অবাক হয়ে রক্তিমের দিকে তাকিয়ে মনে মনে, ভেবেছিল,— 'বড় মনের মানুষেরা তাদের মনটাকে কি নিজেরাই বড় করে, নাকি এরা বড় মন নিয়েই জন্মায়? এই বড় মনের মানুষ গুলো তাদের নিজেদের কাছে আশীর্ব্বাদ না অভিশাপ?'

আকাশকে অবশ্য রক্তিমের থেকে টাকা নিতে হয়নি। আকাশের বাবাই সব ব্যাবস্থা করে দিয়েছিলেন।

নিজের গ্রামের বাড়ির কথা মনে পড়ে আকাশের। মন স্মৃতির অতলে ডুব দেয়।

(১০)

মাটির ঘরে একপাশে খাটের ছত্রির ওপর কয়েকটা কাপড় ভাঁজ করে রাখা আছে। পাশের দেওয়ালের কাছে কিছু খাতা-বই ভর্তি একটা টেবিল, তার সামনে একটা চেয়ার। টেবিলের ওপর দেওয়ালে একটা কালী ঠাকুরের বাঁধানো ছবি। তার পাশে একটা তাকের ওপর কিছু জিনিস, ছোট বাক্স, বই দিয়ে ভর্তি করা। ভেতরের ঘরে যাওয়ার পর্দা ঝোলানো দরজার পাশে

একটা আলনায় জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখা রয়েছে।

আকাশের বাবা কালী ঠাকুরের ছবিতে জবা ফুলের মালা পড়াতে পড়াতে বলে,— সেতো খুব ভালো কথা বাবা, কিন্তু বিলেত যাওয়ার খরচ যোগাড় করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। তোমার ডাক্তারী পড়ার খরচ চালাতেই আমি হিম্‌শিম্‌ খেয়ে যাচ্ছি।
আকাশ চুপ করে থাকে।
মালা পড়ানো হয়ে যায়, আকাশের বাবা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে, আকাশ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলের মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরে টেবিলের ওপর থেকে কতগুলো বই নিতে নিতে বলে,— আচ্ছা দেখছি আমি।
আকাশের বাবা বইগুলো হাতে নিয়ে বাইরের দরজায় দিকে এগিয়ে যায়।

ভিতরের ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে আকাশের মা মুখ বাড়ায়। আকাশের সাথে চোখাচোখি হতে হাত দিয়ে ইশারা করে ছেলেকে ভিতরে ডাকে।

আকাশের বাবা বাইরের দরজার পাশ থেকে দেওয়ালে ঝোলানো ছাতাটা পেড়ে নিয়ে বাইরে যেতে যেতে বলে,— আমি আসছি।
আকাশের বাবা বেরিয়ে গেলে আকাশের মা ঘরে ঢুকে আকাশের সামনে এসে দাঁড়ালে আকাশ মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। ছেলের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে মা বলে,— তুই অত চিন্তা করছিস কেন? ঠিকই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার গয়নাগুলো আছে কি করতে? ভেড়ির পাশের জমিটাওতো অনেক দিন এমনি পড়ে আছে। তোর বাবার বয়স হয়েছে। অতদূরে গিয়ে দেখাশোনাও আর করতে পারে না। কি হবে অত জমি দিয়ে?
আকাশ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে মার দিকে, বলে,— আমার ডাক্তারী পড়তে যাওয়ার জন্য তুমি আর বাবা গয়না জমি বেচে দেবে? তাহলে তোমাদের চলবে কি করে?
নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয় আকাশের.— 'বাবা-মাকে কোথায় বৃদ্ধ বয়সে দেখবে, তা না হয়ে এতো আরও সর্বহারা করে দেওয়ার জোগাড়! — আকাশের মন সায় দেয় না।'
আকাশ বলে,— না মা, তাহলে আমার বিদেশ যাওয়ার কোন দরকার নেই, আমি যাব না।
মায়ের দুচোখে ছেলের বড় হওয়ার সাফল্যের স্বপ্ন ফুটে ওঠে। বলে,— তা বললে হয় খোকা, তুই মস্তবড় ডাক্তার হবি, কত গরিব দুঃখীর সেবা করবি, তোর কত নাম হবে। আর আমি বলব আমার ছেলে।
আকাশের হঠাৎ যেন মনে হয় সত্যিই বিদেশে চলে গেছে, মার থেকে কত দূরে আছে। বুকের ভিতর কেমন যেন একটা কষ্ট হয়। মাকে ছেড়ে দাঁড়িয়ে দুহাত দিয়ে মার মুখটা তুলে ধরে বলে,— কিন্তু মা, বিদেশে অতদিন তোমাকে না দেখে থাকব কি করে?
হেসে আকাশের মাথায় হাত দিয়ে মা বলে,— পাগল ছেলে কোথাকার।

কাশি আর সাগরের কথার আওয়াজে আকাশ অতীতের স্মৃতির অতল থেকে উঠে আসে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পায় ভিতরের ঘরে সাগর কথা বলছে।
— তুমি এমনি করছ কেন বাবা, কি কষ্ট হচ্ছে, বলো আমায়?
আকাশ তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে পড়ে, এগিয়ে যায় ভিতরের ঘরের দরজার দিকে।

সাগরের শ্বশুর মশাই একনাগারে কাশতে কাশতে উঠে বসার চেষ্টা করে। সাগর বাধা দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বলে,— এরকম কেন করছ বাবা? কি হয়েছে, আমায় বলো।
কথাটা বলে সাগর শ্বশুরের বুকে হাত বোলাতে থাকে।
শ্বশুরমশাই অদ্ভুত আচরণ করছে দেখে সাগর কেমন যেন ভয় পেয়ে যায়। অসহায় ভাবে তাকায় দরজার দিকে। বৃদ্ধ হাত প্রসারিত করে আবার উঠে বসার চেষ্টা করে।
সাগব উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করে,— কি কষ্ট হচ্ছে বাবা তোমার?
বৃদ্ধ কাঁপা গলায় উত্তেজিত ভাবে বলে,— আমার যাওয়ার সময় হয়েছে মা, এবার আমি চলে যাব। ওই দেখ কে যেন ডাকছে আমায়।
সাগর কি করবে বুঝতে না পেরে ভাবে আকাশকে ডাকবে কি না। বলে,— কেউ ডাকেনি তোমায় বাবা, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

আকাশ ঘরে ঢুকে, এগিয়ে গিয়ে বিছানায় বসে। কোন কথা না বলে বৃদ্ধের হাতটা টেনে নিয়ে পালস্ দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু বৃদ্ধ হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নেয়। সাগর অসহায় ভাবে আকাশের দিকে তাকালে, আকাশ সাগরকে চোখ দিয়ে ইশারা করে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে। বৃদ্ধ উত্তেজিত ভাবে বলতে থাকে,— খোকা ডাকছে আমায়। খোকা — খোকা।
সাগর শ্বশুরের বুকে হাত বোলাতে বোলাতে বলে,— একটু চুপ করে শোও বাবা।
কিন্তু বৃদ্ধ একইরকম উত্তেজিত ভাবে বলে,— না না, আমার খোকা কেন এলো না?
সাগব তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়,— একটু আগে তোমার ছেলের চিঠি এসেছে বাবা, কাল আসছে। বৃদ্ধ যেন একটু শান্ত হয়। উঠে বসার চেষ্টা না করে শুয়ে শুয়ে উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে,— চিঠি এসেছে, কি লিখেছে মা আমার খোকা? আমায় পড়ে শোনাও না মা।
আকাশ হাতটা টেনে নিয়ে আবার পালস্ দেখার চেষ্টা করে।
— এই যে বাবা বলছি।
চুপ করে শুয়ে থাকে বৃদ্ধ। সাগর বিছানার নীচ থেকে একটা কাগজ বার করে পড়তে থাকে,— শ্রীচরণেষু বাবা, আমি ছুটি পেয়েছি। এমাসের চব্বিশ তারিখে বাড়ি আসছি। অনেক দিন থাকব, শরীরের যত্ন নিও। আজ আর বেশী কিছু লিখছি না। বাড়ি গিয়ে সব কথা হবে। তুমি আমার প্রণাম নিও। ইতি তোমার খোকা।

একটানা চিঠিটা পড়ে সাগর বৃদ্ধ শ্বশুরের দিকে জল ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। আকাশ পালস্ দেখতে দেখতে লক্ষ করে সাগর যে চিঠিটা পড়ছে, ওটা একটা সাদা কাগজ।

আকাশের পালস্ দেখা হয়ে যায়। হাতটা ছেড়ে দিয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকে।
বৃদ্ধ বলে,— খোকা আসছে? কিন্তু আমার সময় যে বড় কম মা। কই চিঠিটা আমায় দাও।
বৃদ্ধ ছেলের চিঠিটা পাবার জন্য হাত বাড়ালে, সাগর কাগজটা হাতে ধরিয়ে দেয়। বৃদ্ধ বাপ ছেলের চিঠিটা বুকে চেপে ধরে। আকাশ লক্ষ করে সাগরের দুচোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

সাগরকে চিঠিটা ফেরৎ দেওয়ার জন্য আবার হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধ বলে — চিঠিটা যত্ন করে রেখে দাও মা।
সাগর 'হ্যাঁ' বলে, হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধর দিকে তাকিয়ে বলে,— সময় তো হয়েই গেল তুমি এবার

ঘুমোও বাবা।

বৃদ্ধ চুপ করে থাকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে সাগর বলে,— আপনি শুয়ে পড়ুন, অনেক রাত হোল।

আকাশ কোন কথা না বলে উঠে গিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরের ঘরে চলে যায়।

(১২)

নানা রকম পাখীদের ডাকে ভোরের আলো ফুটছে সবে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। গতকাল রাত থেকে একটানা ভিজতে থাকা পাখী গুলো দিনের শুরুতেই তাই অবোধ্য ভাষায় বিরক্তি প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে।

আকাশ দালানে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে আপন মনে সিগারেট খেতে খেতে বৃষ্টি ভেজা ভোরের দৃশ্য উপভোগ করছে। ঠাণ্ডা বাতাসে কেমন যেন শীত শীত করছে।

দিনের আলোয় বাড়ির সামনেটা ভালো করে দেখে আকাশ। ভিজে উঠোনটা কর্দমাক্ত হয়ে রয়েছে। আকাশ যেদিকটা বসে আছে সেদিকের বেড়ার কাছে হাসনুহানা গাছের ঝোপ। বেড়ার দরজার পাশেই বাঁদিকে ফুলে সাদা হয়ে থাকা গন্ধরাজ ফুলের গাছ, আর দরজার ঠিক ডানপাশটায় দুটো গোলাপ ফুলের গাছ। অনেক গুলো গোলাপ ফুটে রয়েছে গাছ গুলোতে। আধফোটা কলিগুলো পূর্ণতার আশায় ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। বৃষ্টির জল পড়ে ফুল গুলো যেন তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্যের অধিকারিনী কোন সদ্যস্নাত অল্প বয়সী যৌবনা বন্য সুন্দরী। আর একদম ডানদিকের কোনায় হলুদ হয়ে থাকা একটা সোঁদাল গাছ। ঘুমুরের মতো ফুল গুলো একটা শিকল তৈরী করে একসাথে অনেক গুলো হয়ে জলসাঘরের ঝাড় বাতির মতো নেমে এসেছে। তার থেকে বৃষ্টির জল ফোঁটা ফোঁটা হয়ে মাটিতে ঝরে পড়ছে। গাছের তলার মাটিটা সোঁদাল ফুলে হলুদ হয়ে রয়েছে। গন্ধরাজ গাছটার একদম বাঁদিকের কোনায় একটা ফুল ভর্তি মাতৃত্বের আস্বাদ ভরা রসাল বিশাল বকুল গাছ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে অনেক দিনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আকাশ দালানের বাঁদিকের কোনায় তাকিয়ে লাল হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে দেখতে পায়। ঋজু এবং বীরদর্পে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া যেন যৌবনের প্রতীক। আকাশের মনে হয়, যেন অপর দিকে গায়ে-হলুদ হওয়া লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকা ভাবি বধূর দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে আছে। কৃষ্ণচূড়া গাছটার পাশে, একটু দূর থেকে বকুল গাছের প্রায় কাছ বরাবর বেতের ঝোপের গায়ে লাগানো হলুদ, সাদা, গাঢ় গোলাপী রঙের ফুলের সন্ধ্যা মালতী গাছের ঝোপ। চারিপাশে সবুজ গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকে আকাশ। সদ্য স্নান করে ভিজে শরীরে খোলা চুলে অল্প বয়সী মেয়েদের যেমন দেখায়, গাছগুলোকে ঠিক সেরকম লাগছে। সেই একই দৃশ্য। ওপরের পাতাটা নীচের পাতাটাকে মাতৃ স্নেহে জল পান করাচ্ছে, আর তার নীচের পাতাটা তৃষিত নয়নে জলের অপেক্ষায় ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে।

একটা কোকিলের ডাক শুনে আকাশ ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে কোকিলটাকে খোঁজার চেষ্টা করে। কি মিষ্টি ডাক এই পাখীটার। প্রকৃতির অন্যতম এক সুন্দর সৃষ্টি। আবার ডেকে ওঠে কোকিলটা। আকাশের মনে হয়,— 'এই পাখীটা বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র প্রাণী যার এত

সুন্দর একটা শিল্পী সুলভ গুণ থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সবসময় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। অহংকার বর্জিত, নাম প্রচার বিমুখ এক প্রাণী। সারাদিন অপরের মন ভোলাচ্ছে অথচ নিজের হারানো মনটাকে নিজেই খুঁজে বেড়ায়। হায়রে,- প্রকৃতির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। এত বড় শিল্পীর নিজের কোন ঘর নেই, তাই বোধহয় লজ্জায় নিজেকে লুকিয়ে রাখে পাতার আড়ালে।'
কোকিলের ডাক আর শোনা যায় না। আকাশ মনে মনে বলে,— 'এরা তো আবার এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকতে ভালোবাসে না। শিল্পীমনের অন্যতম একটা উদাহরণ।'

ছোট হয়ে যাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখে আকাশ। কি সুন্দর ঝরে ঝরে পড়ছে। সামনে, দুপাশে আরো ওপরে নারকেল গাছ গুলোর দিকে আকাশ তাকিয়ে থাকে।

একসময় বৃষ্টি ভেজা মনটা চলে যায় আর একটা বৃষ্টি ভেজা মেঘলা দুপুরের সবুজে ঘেরা একটা জায়গায়।

(১৩)

বৃষ্টি ভেজা ছুটির দিনের দুপুরের নির্জনতায় ভরা মেঘলা আকাশের নীচে সীমাহীন রাস্তার দুধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লাল, হলুদ, বেগুনী ফুলে সজ্জিত কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া আর ফুরুশ গাছগুলো নির্জনতাকে যেন আরোও বাড়িয়ে তুলেছে।

সকাল থেকেই মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। এরকম মেঘলা দিনে মাটির সোঁদা গন্ধ মিশে থাকা প্রকৃতির সবুজ ছোঁয়ায় আকাশের মনটা সেই ছোট বেলা থেকেই কোথায় যেন হারিয়ে যায়। কি যেন কবতে ইচ্ছে করত। কিন্তু কি করতে ইচ্ছে করত সেটা বুঝতে পারত না। কিন্তু খুব ভালো লাগছে এটা বুঝতে পারত।

আজ মনে হয় এরকম বর্ষা মুখর দিনে চারপাশে সবুজের মধ্যে নির্জনে, একান্তে সুলেখাকে কাছে পেতে, ঘনিষ্ট হতে, একটু উষ্ণতার ছোঁয়া পেতে।

আকাশ আর সুলেখা পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। দুধারে রাস্তায় পড়ে থাকা লাল হলুদ বেগুনী ফুলের সমারোহ যেন নীরব স্বাক্ষী। আকাশ মনে মনে ভাবে,— 'আচ্ছা, আজকের দিনে আমার মতো কি সুলেখারও আমায় কাছে পেতে ইচ্ছা করছে? হয়তো লজ্জায় বলতে পারছে না।'
হাঁটতে হাঁটতে আকাশ বলে,— এই সময়টাই সব থেকে ভালো। বাচ্চাটাচ্চা হওয়ার আগে পর্যন্ত।
সুলেখা আঁতকে ওঠে, বলে,— বাচ্চা, না বাবা না, আমার কোন বাচ্চার দরকার নেই।
আকাশ অবাক হয়ে তাকায় সুলেখার দিকে, বলে,— তা বললে হয় নাকি?
সুলেখা আকাশের কথার গুরুত্ব না দিয়ে বলে,— বাচ্চা হলে ফিগার নষ্ট হয়ে যায়, তারপর বাচ্চার জন্য রাত জাগো, পটি পরিস্কার করো,— ম্যাগো, — ওসব আমার দ্বারা হবে না। তারপর একটু বড়ো হলে তাদের স্কুল, পড়াশুনো। — ওরে বাবা, আমার দ্বারা অসম্ভব। আমার সবকিছু বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে। এসব পুরানো মানসিকতা ছাড়ো আকাশ।
বোঝানোর চেষ্টা যে বৃথা সেটা বুঝতে পারে আকাশ। একটু নিরাশ হয়ে সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলে, — আচ্ছা, ওসব অনেক পরের কথা, পরে দেখা যাবে।
আকাশ বুঝতে পারে কথা বাড়ালে বিপদ আছে। এদিকের সময় নষ্ট হবে, ববং পবে কোন এক

আবেগ ঘন মুহূর্তে সুলেখাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে।
সুলেখা বিরক্ত হয়ে বলে,— না না আকাশ, প্লীজ, আমি এখন থেকেই তোমাকে বলে রাখছি, ওসব পুরানো মানসিকতা তোমাকে ছাড়তে হবে। তুমি অঞ্জনকে দেখে শেখো। ও কত আধুনিক মানসিকতার। অঞ্জন বলে, পৃথিবীতে যখন এসেছ, তখন শুধু টাকা রোজগার করো — প্রচুর টাকা, আর ফুর্তি করে যাও। প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করো।
আকাশ হতাশ হয়ে চুপ করে যায়। হাঁটতে থাকে দুজনে।

(১৪)

অন্যমনস্ক হয়ে দেওয়ালের হেলান দিয়ে চুপ করে দালানে বসে আছে আকাশ। দৃষ্টি সামনের সবুজ গাছপালায় নিবদ্ধ থাকলেও মনটা এখনো পড়ে আছে সুলেখার সাথে বৃষ্টি ভেজা সেদিনের দুপুরের সবুজে ঘেরা জায়গায়।

সাগর চায়ের কাপ হাতে দালানে বেরোয়। সদ্য স্নান করা কোমর ঝাঁপানো খোলা কালো চুল থেকে তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াচ্ছে। সরু সিঁথিতে সদ্য ভরা লাল সিঁদুরের আভা নাকের ওপর এসে পড়েছে। কপালে সিঁদুরের টিপ।

সাগর ঘার ঘুরিয়ে আকাশকে দেখতে পায়। আকাশ তখনও একমনে সামনের দিকে তাকিয়ে। সাগরকে খেয়াল করে না।

সাগর কাছে এগিয়ে আসে। হেসে বলে,— কি ভাবছেন?
আকাশ শুনতে পায় না। সাগর আবার ডাকে,— শুনছেন!
আকাশের সম্বিত ফিরে আসে। ঘাড় ঘুরিয়ে সাগরকে দেখতে পায়। তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে কোন উত্তর না দিয়ে। সাগরকে যেন আরো বেশী সুন্দরী লাগছে এই মুহূর্তে। চায়ের কাপ হাতে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে সাগর। শাখা পলা সিঁদুরের সাজে, সদ্যস্নাত খোলা ভিজে চুলে সাগরকে দেখে আকাশের মনে হয়,— 'পৃথিবীর অন্যতম পবিত্র দৃশ্য। এতো নিখুঁত সুন্দরী বোধহয় এতো কাছ থেকে এই প্রথম দেখছে।'
সাগর আবার জিজ্ঞাসা করে হেসে,— কি ভাবছেন?
আকাশ সাগরের চোখে চোখ রেখে হেসে বলে,— না কিছু নয়। ছোটবেলাটা আমার গ্রামেই কেটেছে, কলেজ জীবনের আগে অবধি। বহুদিন পর আজ মনে হচ্ছিল, সেই পুরানো দিনে ফিরে গেছি।
সাগর আকাশের মুখটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে করতে জিজ্ঞাসা করে,— রাতে ভালো করে ঘুম হয়নি তো?
— আমার ভোরে ওঠা অভ্যাস ছোট বেলা থেকেই। তবে আজ একটু বেশী ভোরেই উঠে পড়েছি। আসলে নতুন জায়গাতো, খুব ভাল লাগছিল এখানে বসে থাকতে। — আকাশ হেসে উত্তর দেয়।
সাগর চায়ের কাপ সমেত হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলে,— ধরুন।
আকাশ হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করে,— আপনি?
সাগর চোখ নাচিয়ে মজা করে বলে,— আমি পরে খাব। আগে আমার বন্ধুর সাথে একটু গল্প করে আসি।

আকাশ বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে। সাগর সেটা বুঝতে পেরে হেসে বলে,— আমার মধুসূদনের সাথে।
আকাশ এবার বুঝতে পারে। তাড়াতাড়ি মজা করে বলে,— ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যান। আপনার মধুসূদন যদি দেখেন যে ওনাকে ফেলে আপনি নতুন বন্ধুর সাথে গল্প করছেন তাহলে হয়তো হিংসায় আপনার ওপর ভীষণ রেগে যাবেন।
সাগর হেসে জবাব দেয়,— মোটেই না, কারণ আমার বন্ধু আমাকে জানে।
একটু থেমে বলে,— আপনি চা খান, আমি আসছি।
সাগর পায়েব তোরায় মনে ঢেউ ওঠানো শব্দ তুলে ঘরে ঢুকে যায়। উঠোনের বেড়ার দরজাব পাশে চিক্ চিক্ করা জলবিন্দুর সাজে ফুটে থাকা লাল গোলাপ গুলোর দিকে তাকিয়ে সাগরের মুখটা মেলানোর চেষ্টা করে আকাশ মনে মনে বলে,— 'মেয়েটা কত খোলামেলা মিশুকে। তাড়াতাড়ি আপন করে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে মেয়েটার মধ্যে।'

চায়ের কাপে চুমুক দেয় আকাশ।

(১৫)

রাধাকৃষ্ণের মুর্তির সামনে সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে সাগর। রাধাকৃষ্ণের মুর্তির গলায় টগর ফুলের মালা পড়ানো ও পায়ের কাছে ফুলের স্তুপ। আসনের ওপর দুটো ধুপ ও প্রদীপ জ্বলছে। দুটো ছোট থালায় বাতাসা ও পাশে রাখা ছোট দুটো জলের গ্লাস।

চাযের কাপপ্লেট হাতে আকাশ ঘরে ঢুকে সাগরকে বসে থাকতে দেখে, এগিয়ে গিযে টেবিলের ওপব কাপ প্লেটটা শব্দ না করে রাখে। ফিরে এসে খাটের ওপর বসে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে। সাগর তখনও তাকিয়ে আছে রাধাকৃষ্ণের মুর্তির দিকে। দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নেমেছে। আকাশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে একবার আড়চোখে অকাশকে দেখার চেষ্টা করে, আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নেয়। তারপর আঁচলটা গলায় জড়িয়ে মাটিতে মাথা ঠেকায়।

আকাশের মাযের কথা মনে পড়ে। — 'রোজ সকালে মা ঠিক এরকম করেই রাধামাধবের পূজো সেরে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করত। আকাশ বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখত।'

সাগর মাটি থেকে মাথা তুলে সোজা হযে বসে হাত জোব করে প্রণাম করে। তারপর চন্দনকাঠ আর ঘষার পাথরটা জলচৌকির তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে ঘুরে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসে। আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ায়।
সাগর হেসে জিজ্ঞাসা করে,— কি দেখছেন?
— আপনার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করা। - হেসে জবাব দেয় আকাশ।
সাগর কিছু না বলে হাসে।
আকাশ আবার জিজ্ঞাসা করে,— পূজো হোল?
হেসে ছোট্ট জবাব দেয় সাগর,— হ্যাঁ।
মজা করে আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— কি বলল আপনার মধুসূদন?
সাগর মুর্তির দিকে তাকিয়ে বলে,— আজকের জন্য আবার নতুন করে প্রেরণা জোগাল।
অবাক হওয়ার মিথ্যা ভান করে আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— সারাদিন সংসার ধর্ম পালন করো, বৃদ্ধ-

অসুস্থ শ্বশুরমশাই - এর সেবা করো?
সাগর হেসে ফেলে, নিজের মনেই মাথা নাড়িয়ে আকাশকে পাল্টা প্রশ্ন করে,— ঘুমোলেতো শরীরের ক্লান্তি দুর হয়, কিন্তু মনের ক্লান্তি দুর হয় কিসে বলতে পারেন?
শান্তভাবে আকাশ উত্তর দেয়,— ঘুম যদি ভালো হয়, তাহলে মনের ক্লান্তিও দুর হয় কিছুটা।
হাসিটা সাগরের চোখে ফুটে ওঠে। আকাশের উত্তরটা যাচাই করার জন্য যেন বলে,— পুরোটাতো নয়! তাছাড়া আমাদের জীবনে প্রতি নিয়ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে বা ঘটে গেছে, যেগুলো আমাদের মনকে আঘাত করে, ব্যাথা দেয়, আহত করে, ক্লান্ত করে — সেগুলো থেকে মনকে সুস্থ রাখবেন কি করে?
আকাশ একটুও না দমে, পাল্টা প্রশ্ন করে,— মধুসূদনকে ডাকলে মনের ক্লান্তি দুর হয় বলছেন?
সাগর বোঝানোর ভঙ্গিতে বলে,— মধুসূদন একটা বিশ্বাসের নাম মাত্র। যে অদৃশ্য শক্তি আমাদের সদা সর্বদা নিয়ন্ত্রন কবছে তাকেই আমরা এক একজন এক এক রূপে কল্পনা করেছি। আসলে সে এক এবং অদ্বিতীয়। মধুসূদন এরকমই একটা বিশ্বাস। এই বিশ্বাস আসে আবার সংস্কার থেকে, অনুভুতি থেকে। তার থেকে আসে ভালোলাগা। আমরা সাধারণ মানুষ, তাই এই ভালোলাগাব গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু যারা সত্যিকারের সাধু সন্ন্যাসী মুক্তির সন্ধানে আকুল হয়ে কাঁদছে, তারা এই ভালোলাগাকে ভালোবাসায় পরিণত করেছে।
আকাশ সতর্ক হয। বুঝতে পারে সাগরকে এত সহজে দমানো যাবে না। এর সাথে ভালোভাবে যুক্তি দিয়ে কথা বলতে হবে।
— এই ভালোলাগাটা এক একজনের কাছে এক এক রকম হতে পারে। — বলে আকাশ।
— হতেই পারে। তবে স্নান করলে যেমন শরীর পরিস্কার হয়, তেমন মনকেও পরিস্কার করার দবকাব আছে।
— কিন্তু যে পরিস্কার মানসিকতার এবং ভালো মনের, তার কি আবার নতুন করে মনকে পরিস্কাব করার দরকার আছে?
— আপনি একটা নতুন জামা পড়লেন, তাতে কোন কাদা বা দাগ কিছুই লাগলো না। তবুওতো আপনি সেটা পরে পরিস্কার করার জন্য কাচতে দেন।
— হ্যাঁ দিই, কাবণ, বাতাসের সাথে ধুলো বালি এসে জামাটাকে নোংরা করে তাই।
হাসতে হাসতে সাগর বলে,— ঠিক বলেছেন। সেরকমই আমাদের চোখ আর কান দিয়ে যে অদৃশ্য ধুলোবালি এসে প্রতি নিয়ত মনকে ময়লা করছে, নোংরা করছে, আমরা বুঝতেও পারি না, তার থেকে মনকে পরিস্কার করতে হবে না?
সাগরকে রাগানোর জন্য একটু খোঁচা মেরে হাসতে হাসতে আকাশ বলে,— তাহলে আপনার মধুসূদন ধোপার কাজ করে বলুন?
সাগর একটুও না রেগে শান্তভাবে বলে,— তা যদি বলেন, তবে তাই। তাকে আপনি যেভাবেই ভাবুন, যে নামেই ডাকুন না কেন, কোন ভাবেই তাকে ছোট করা যাবে না। কেন জানেন? কারণ সে নিরাকার, অহংবোধ বর্জিত। আর ধোপাকে ছোট ভাববেন না। মনে রাখবেন তার আর এক নাম সভাসুন্দর। আমাদের প্রত্যেকের মনের এক কোনায় একটা করে ধোপা লুকিয়ে আছে। কেউ সেটাকে প্রকাশ করতে পারে, কেউ পারে না।
আকাশ তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে। সাগরের কথা শুনে আব কথা বলার ধরন দেখে একটু অবাক হয়। একজন অজ্পাড়াগাঁয়ের সাধারণ মেয়ের মুখে দৃঢ়তার সাথে এত যুক্তি দিয়ে কথা

আর কথা বলার ভঙ্গী যেন আকাশের মনকে একটু নাড়া দিয়ে যায়।
সাগর জিজ্ঞাসা করে,— কি দেখছেন?
আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়েই বলে,— না কিছু না।
হেসে ফেলে সাগর, বলে,— নিন এবার উঠে পড়ুনতো। জল ধরে রেখেছি। স্নানটা সেরে নিন। আজ আপনার জন্য সেই অন্ধকার থাকতে উঠেছি।
উঠে দাঁড়ায় সাগর।
অবাক হয়ে আকাশ বলে,— আমার জন্য কেন?
সাগর হেসে হেসে বলে,— বা-রে, এতটা রাস্তা যাবেন, সেই বিকেলে পৌছবেন। দুটো ভাত না খাইয়ে আপনাকে যেতে যেতে দিতে পারি?
হেসে জিজ্ঞাসা করে আকাশ,— নারায়ণ সেবা?
চোখ পাকিয়ে সাগর বলে,— আবার শুরু করেছেন? চলুন উঠুন।
বাইরে থেকে কে যেন ডাকে,— বৌ,- ওবৌ,- বৌ
সাগর উত্তর দেয় চেঁচিয়ে,— যাই মাসী।
সাগর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে দালানে বেরিয়ে যায়।
আকাশ তাকিয়ে থাকে।

(১৬)

আকাশটা মেঘলা হয়ে রয়েছে। বৃষ্টিটা একদম ধরে গেছে কিন্তু গাছের পাতা থেকে তখনও টুপটুপ করে জল পড়ছে। উঠোনটা ভিজে কাদা হয়ে রয়েছে। সাদা কাপড় পরা বিধবা এক বৃদ্ধা লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধার মাথার সব চুল পেকে গেছে।
সাগর দালানে বেরিয়ে বৃদ্ধাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করে,— কি হয়েছে মাসী?
সাগরকে দেখে বৃদ্ধা উদ্বিগ্ন মুখে বলে,— ও বৌ, পুষ্পতো মরে যাবে এবারে।
উদ্বিগ্ন হয়ে সাগর জিজ্ঞাসা করে,— কেন মাসী? কি হয়েছে?
বৃদ্ধা উত্তরে দেয়,— ভোর রাত থেকে শুধু জল বমি করছে আর পেটের যন্ত্রনায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। তার সাথে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।
চিন্তিত মুখে সাগর বলে,— সেকি গো!
বৃদ্ধা করুন মুখে বলে,— কুড়িটা টাকা দেনা মা। গাঙ্গুলী ডাক্তারকে তাহলে ডাকতে পাঠাই। আগে টাকা না দিলেতো আসবে না। বৌটা বড্ড কষ্ট পাচ্ছে।
আকাশকে বাইরে আসতে দেখে বৃদ্ধা সাগরের দিকে তাকায়। সাগর আকাশকে দেখে বৃদ্ধার দিকে তাকায়।
সাগর বৃদ্ধাকে তাড়াতাড়ি বলে,— তুমি দাঁড়াও মাসী, আমি এখনি আসছি।
সাগর ঘরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— আমি একবার দেখে আসব?
সাগর দাঁড়িয়ে যায়। বৃদ্ধাকে একবার দেখে নিয়ে বলে,— তুমি যাবে? কিন্তু — ওদিকে যদি আবার দেরী হয়ে যায়?
তুমি ডাক শুনে আকাশ প্রথমে একটু অবাক হয়। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চোখ নাচিয়ে ঠোঁটের কোনায় হাসি চেপে চাপাগলায় বলে,— মধুসূদন না হয় ম্যানেজ করে দেবে। আগেতো

নারায়ণ সেবা করে আসি।
সাগর আকাশের ইয়ার্কি করে দেওয়া খোঁচাটা বুঝতে পেরেও বৃদ্ধা সামনে দাঁড়িয়ে আছে বলে, চুপ করে থাকে। সেটা বুঝতে পেরে আকাশ মুচকি হাসে। বৃদ্ধা আকাশের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— হ্যাঁরে বৌ, তোর বরটাতো রাজপুত্তুর রে।
আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসে। বৃদ্ধা এবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— হ্যাঁ বাবা, এতদিনে আসার সময় হল? বুড়ো বাবার কথা না হয় বাদই দিলাম। নতুন যুবতী বৌটাকে এতদিন ধরে কাছছাড়া করে রাখতে হয় বাবা! আ-হা-হা, বাছা আমার এতদিন যে কিভাবে কাটিয়েছে। আজ মুখটা কেমন চক্‌চকে লাগছে দেখো।
সাগরের দিকে তাকায় বৃদ্ধা। লজ্জায় মুখ লাল হয় সাগরের। আকাশ মনে মনে মজা পায়। চোখে মুখে হাসি ফুটে ওঠে। মনে মনে ভাবে,— 'জোর ফেঁসেছে। যেমন তুমি করে বলা। এবার দেখি কি করে।'
আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকে। সাগর আকাশের মনের কথাটা বুঝতে পারে। ঠোঁট কামরে আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলে,— মাসী, তোমাকে গাঙ্গুলী ডাক্তারকে ডাকতে হবে না। তোমাদের ছেলেকে নিয়ে যাও, ওই দেখে আসবে।
সাগরের কাছ থেকে এতটা সপ্রতিভতা আশা করেনি আকাশ। চোখের হাসি মিলিয়ে যায়। একটু এবাক হয়। এবার সাগর ঠোঁট চেপে আকাশের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসে।
অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধা বলে,— ও মা, আমাদের ছেলে ডাক্তার বুঝি?
সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— কিন্তু তুইযে বলেছিলি বিদেশে চাকরী করে, ডাক্তারতো বলিসনি।
— ওইতো, বিদেশে একটা হাসপাতালে ডাক্তারের চাকরী করে। — সাগর উত্তর দেয়।
আকাশের দিকে ফিরে বলে,— হ্যাঁ গো, তুমি আর দেরী কোর না। মাসীর সাথে গিয়ে তাড়াতাড়ি দেখে এসো। ওদিকে আবার ট্রেন ধরতে হবে।
আকাশ একটা ঢোক্ গিলে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখ থেকে কথা বেরোয় না।
সাগর আকাশের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে মনে মনে মজা পায়। বৃদ্ধা একবার আড়চোখে আকাশকে দেখে, সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— ও বৌ, তোর বরতো তখন থেকে তোকেই দেখে যাচ্ছেরে।
আকাশ অস্বস্থিতে পড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নেয়। সাগর আড়চোখে আকাশের মুখের অবস্থাটা দেখে নিয়ে বৃদ্ধাকে হাসতে হাসতে মজা করে বলে,— এতদিন বৌকে ছেড়ে ছিলতো মাসী, তাই এখন বৌকে কাছে পেয়ে নজর ছাড়া করতে ইচ্ছে করছে না।
দুঃখ প্রকাশ করে সাগর আবার বলে,— কিন্তু আজকেই কলকাতায় চলে যেতে হবে আবার। কথাটা বলে, আড়চোখে আর একবার আকাশকে দেখে নেয়। আকাশ একবার সাগরের দিকে, একবার বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে।
— তা-ভালো, তা-ভালো, কিন্তু কলকাতায় কেন? এইতো সবে এলো। — বৃদ্ধা মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলে।
সাগর আপশোষ করে বলে,— কি করবে মাসী, এর নাম চাকরী। হাসপাতালের জন্য কি দরকারী ওষুধ কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে যেতে হবে। ওখানেতো ওইসব ওষুধ পাওয়া যায় না। আমি তোমাদের ছেলেকে বলেছি, অতদূরে চাকরী করতে হবে না। নিজের বরকে ছেড়ে অতদিন

থাকা যায় নাকি মাসী। তুমি বলো? আমিতো বলছি চলে আসতে।
আকাশের দিকে তাকিয়ে আদুরে স্বরে বলে,— কিগো বলেছি না।
আকাশের মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। একটা ঢোক গিলে দুবার মাথা নাড়িয়ে মনে মনে ভাবে,— 'মেয়েটা কি চট্‌পট্‌ মিথ্যে কথা বলতে পারেরে বাবা, যেন প্রতিটা উত্তর জিভের ডগায় তৈরী।'
আকাশের মুখের অবস্থা দেখে সাগরের মনে মনে হাসি পায়। মনে মনে ভাবে,— 'কেমন? তখন খুব হাসা হচ্ছিল।'
আকাশ মনে মনে সাগরের বুদ্ধির প্রশংসা করে।
সাগরের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধা বলে,— সেই ভালো।
এবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— শোন বাছা, সুন্দরী যুবতী বৌ কখনো এভাবে একলা ফেলে রাখবে না। আমার সোয়ামী, আমায় একদিনের জন্যও বাপের বাড়িতে থাকতে দেয়নি।
সাগর কৃত্রিম চিন্তিত মুখ করে জিজ্ঞাসা করে বৃদ্ধাকে,— কিন্তু মাসী, আমি যে শুনেছিলাম শুভদৃষ্টির সময় তোমার বর নাকি তোমায় দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল?
রেগে গিয়ে বৃদ্ধা বলে,— বলিস না লো, বলসি না। যৌবন কালে তোর মতো রূপ ছিল আমার।
আকাশ চুপ করে সাগর আর বদ্ধার কথোপকথন শোনে।
নিরীহ মুখ করে সাগর জিজ্ঞাসা করে,— মেশো তোমাকে কেমন করে আদর করতো মাসী?
বৃদ্ধা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে,— আমাকে? —
কথাটা বলেই বুঝতে পারে সাগরের নিরীহ মুখের আড়ালে দুষ্টুমী লুকিয়ে রয়েছে।
হাতের লাঠিটা তুলে সাগরকে বলে,— আ-মরণ, আমার সাথে ইয়ার্কী হচ্ছে?
সাগর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বাচ্ছা মেয়ের মতো হাসতে থাকে। বৃদ্ধাও হেসে ফেলে। আকাশও হাসে। বৃদ্ধা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— কইগো বাবা, — চলো।
— হ্যাঁ, চলুন। — আকাশ উত্তর দেয়।
বৃদ্ধা এগিয়ে যায়। আকাশ সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে।
সাগর পিছন থেকে আকাশকে ডাকে,— শুনছো?
আকাশ ঘুরে তাকায় সাগরের দিকে।
দুষ্টুমীর হাসি ভরা মুখে সাগর বলে,— খালি হাতেই নারায়ণ সেবা করতে যাবে?
আকাশ বুঝতে পারে না। সাগর তাকিয়ে থাকে দুষ্টুমী ভরা চোখে। আকাশ পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি করে ভেজা পিচ্ছিল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পা হড়কে ধপ্‌ করে সিঁড়িতে বসে পড়ে আবার উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জা পেয়ে যায়। মুখে জোর করে হাসি এনে বলে,— ওহ্, তাইতো!
সাগর কোন রকমে হাসি চেপে তাড়াতাড়ি করে বলে,— তুমি দাঁড়াও। আমি এনে দিচ্ছি।

সাগর এগিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। আকাশ মনে মনে ভাবে,— 'এ মেয়েটা আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়। একটু আলাদা মলেই মনে হয়। আজ অবধি অনেক মেয়েইতো দেখলাম।'

সাগর ঘর থেকে আবার বেরিয়ে আসে, স্টেথোটা হাতে নিয়ে। আকাশ হাত বাড়িয়ে স্টেথোটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। বৃদ্ধা বেরিয়ে গেছে ততক্ষণে। আকাশ সতর্ক ভাবে পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে উঠোনের বেড়ার দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

(১৭)

মাটির ঘর। একটা তক্তাপোষের খাটের ওপর বিছানায় পুষ্প শুয়ে আছে। বছর চল্লিশ বয়স হবে। উল্টোদিকের দেওয়ালে আলনার কিছু কাপড়জামা ঝুলছে। পুষ্পর সামনে সাত আট বছরের কুসুম দাঁড়িয়ে আকাশের খাটে বসে স্টেথো দিয়ে মার বুক পরীক্ষা করা দেখতে থাকে। বৃদ্ধা একটু দূরে দাঁড়িয়ে কুসুমকে ইশারায় ডাকলে কুসুম হাত দেখিয়ে অপেক্ষা করতে বলে আবার তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে। কান থেকে স্টেথো খুলে ফেলে আকাশ পুষ্পকে জিভ দেখাতে বলে। পুষ্প জিভ বার করে দেখায়।

আকাশ উঠে দাঁড়িয়ে পুষ্পর পেট টিপে টিপে দেখে।

ব্যথা অনুভব করে পুষ্প বলে,— লাগছে ডাক্তার বাবু।

পেটের অন্যান্য জায়গায় হাত দিয়ে টিপে জিজ্ঞাসা করে আকাশ,— এখানে?

— না।

আবার আগের জায়গায় হাত দিয়ে টিপে আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— এবার?

— হ্যাঁ লাগছে।

আকাশ হাত সরিয়ে নিয়ে খাট থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করে.— কি খেয়েছিলেন কাল রাত্রে?

পুষ্প উত্তর দেয়,— পান্তা ভাত আর আলুর চপ।

— আর?

— লঙ্কা-পেঁয়াজ দিয়ে একটা ডিম সেদ্ধ।

— কিসের ডিম?

— হাঁসের।

বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে আকাশ বলে,— ঠিক আছে। কাউকে পাঠিয়ে দিন। ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। কথাটা বলে পুষ্পর দিকে তাকিয়ে বলে,— আজ সারাদিন চিঁড়ে মুড়ি ছাড়া আর অন্য কিছু খাবেন না। রাত্রে ভাত চটকে খেতে পারেন, যদি খিদে পায় তবেই। আর জল ফুটিয়ে খাবেন। কুসুমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে আকাশ বৃদ্ধার দিকে ফিরে বলে,— ডিম, আলুর চপ, দুধ - এসব যেন না খায়।

কথাটা বলে আকাশ বেরিয়ে যায়।

পুষ্পর কাছে এগিয়ে এসে বৃদ্ধা চোখ বড় বড় করে বলে,— আমাদের সাগরের বর। মস্ত বড়ো ডাক্তার।

কথাটা বলে কুসুমের দিকে ফিরে আবার বলে,— ও কুসুম, ওষুধটা নিয়ে আয় না মা।

কুসুম মাথা নাড়িয়ে, মায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

(১৮)

কাঁকে কাঁসার কলসী আর এক হাতে দুধ মাপার পোয়া নিয়ে একজন অল্প বয়সি বৌ উঠোনের বেড়ার দরজা ঠেলে ঢুকে দালানের সামনে এসে ডাকে,— কই গো দিদি?

কোন উত্তর না পেয়ে কলসীটা দালানে রেখে আবার ডাকে,— ও সাগর দি, কোথায় গেলে গো?

বাড়ির ভিতর থেকে সাগর উত্তর দেয়,— দাঁড়া আসছি।

মহিলা দাঁড়িয়ে থাকে।

একটু পরে সাগর একটা বাটি হাতে করে বেরিয়ে কাছে এসে বাটিটা বাড়িয়ে দেয়। মহিলা বাটিটা নিয়ে মাটিতে রেখে, পোয়াটা এক হাতে ধরে, কলসী কাত করে পোয়াতে দুধ ঢালতে থাকে। সাগর বলে,— আজ এক পোয়া দুধ বেশী দিস্।
দুধ ঢালতে ঢালতে মহিলা জিজ্ঞাসা করে,— কেন গো, কে খাবে?
— তোর অত দরকার কি? তোকে দিতে বলছি দেনা।
মহিলা বাটিতে দুধ ঢালে পোয়া থেকে।
সাগর জিজ্ঞাসা করে,— হ্যাঁরে কমলা, দুধ আজকে এতো পাতলা লাগছে কেন রে?
কমলা দুধ ঢালা বন্ধ করে সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— পাতলা কেন হবে গো। গেরামের কেউ বলতে পারবে না যে, কমলা দুধে জল মেশায়, হ্যাঁ—। কত জনেরই তো এই গেরামে গরু আছে, এই কমলার থেকেই তাহলে সবাই দুধ নেয় কেন?
সাগর বলে,— আমি কি তোকে বলেছি, তুই দুধে জল মেশাস? তুই জলে দুধ মেশাস। নে এবার তাড়াতাড়ি দে।
কমলা সাগরের কথা বুঝতে না পেরে দুধ ঢালতে ঢালতে বলে,— সেই কথাই বলো। আমি দুধে জল মেশাই না, আর কেনই বা মেশাব, তোমরা কি পয়সা কম দাও? মাঠে ঘাটে কালী আমার চড়ে বেড়ায়। হয়তো এক একদিন বেশী জল খেয়ে ফেলে, তাই দুধও একটু পাতলা হয়।
সাগর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি চাপে।
কমলা দুধ ঢালতে ঢালতে সাগরকে বলে,— হ্যাঁগো দিদি, পুষ্পর মায়ের সাথে এক ভদ্দরলোক তোমার বাড়ি থেকে বেরোল। কে গো?
কমলার দুধ ঢালা হযে যায়। কলসীতে ঢাকা দেয়। সাগর বাটিটা তুলতে তুলতে কমলার দিকে তাকিয়ে অবাক চোখে বলে,— এর মধ্যেই তোর নজরে পড়ে গেছে?
— আ-মোলো-যা, আমার নজরে পড়বে কেন গো, আসার সময় রতনের বৌয়ের সাথে দেখা হল, ওই বলল। আমি কি কোন পুরুষ কোথায় যাচ্ছে তা দেখার জন্য বসে আছি নাকি? আমার কি আর কোন কাজ নেই? — কমলা তাড়াতাড়ি করে বলে।
সাগর হাত বাড়িয়ে দাম দেয় কমলাকে। টাকা নিতে নিতে কমলা আবার জিজ্ঞাসা করে,— কে গো দিদি, ওই লোকটা? কাল রাতে নাকি এসেছে?
মাথা কাত করে সাগর বলে,— সে খবরও পেয়ে গেছ?
— ওমা, আমি কি করে জানব? রতনের বৌ-ই তো বলল! — আমতা আমতা করে বলে কমলা।
— তা, আর কি বলল তোর রতনের বৌ? — ভুরু কুঁচকে সাগর জিজ্ঞাসা করে।
কমলা একটু রাগ দেখিয়ে বলে,— যা বললাম তাইতো বলেছে। তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? নেহাত রতনের বৌ বলল কাল রাতে জামাই বাবু এসেছে। তাই জিগ্গেস করলাম।
কথাটা বলেই চোখে মুখে উৎসাহ প্রকাশ করে কমলা আবার জিজ্ঞাসা করে,— তাই গো?
কমলা আর যাতে বেশী প্রশ্ন না করে, সেটা থামানোর জন্য সাগর বলে। — হ্যাঁ, এবার খুশীতো? এখন তুই যা দেখি।
কমলা মাথা নাড়াতে নাড়াতে হাসি মুখে বলে,— ঠিক ধরেছি! আমরাও তাই বলছিলাম। পরপুরুষ কেন তোমার ঘরে রাত কাটাতে যাবে। এ নিশ্চই জামাইবাবু।
একই ভাবে কমলা আবার বলে,— তাই আজ এক পোয়া দুধ বেশী। রতনের বৌ বলছিল,

. তোমার বরটাকে নাকি খুব সুন্দর দেখতে।
— হ্যাঁ, এবার তুই যা দেখি, আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।
কমলা কৌতুহলী চোখে জিজ্ঞাসা করে,— তা — পুষ্পর মায়ের সাথে কোথায় গেল?
— কোথায় আবার যাবে? পুষ্পকে দেখতে। — সাগরের উত্তরে সামান্য ঝাঁজ মেশানো থাকে।
কমলা সেটা গায়ে না মেখে আবার জিজ্ঞাসা করে,— পুষ্পকে দেখতে কেন?
সাগর একই ভাবে উত্তর দেয়,— পেটে ব্যাথা হচ্ছে, বমি করছে তাই।
— ওমা, সেকি গো। এই বয়সে বিধবা, তা কিছু হয়টয় নিতো? — রহস্য সন্ধানী চোখে কমলা জিজ্ঞাসা করে।
সাগর বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়,— তা আমি কি করে জানবো? তোরই বা জানার কি দরকার, পরের ঘরে কি হচ্ছে? তাছাড়া তোরা সব কিছুতে আগে খারাপটা ধরিস কেন বলতো? ভালোটা ভাবতে পারিস না?
আমতা আমতা করে বলে কমলা,— খারাপ ভাববো কেন? আমরা হলাম গিয়ে পরশী। যদি কোন বিপদ আপদ হয়, তাহলে পাশে গিয়ে দাঁড়াতে তো হবে।
— সে তো হবেই। হাঁড়ির খবর নিতে হবে না! নাহলে যে পেটের ভাত হজম হবে না। — শ্লেষ মিশিয়ে কথা গুলো বলে সাগর।
কমলা বলে,— সে তুমি যাই বলো বাপু। তা হ্যাঁগো দিদি, জামাইবাবু কেন গেল?
সাগর মুখ ভেঙিয়ে বলে,— তোমাদের জামাইবাবু ডাক্তার তাই।
চোখ বড় বড় করে কমলা বলে,— ও-মা, তাই নাকি গো?
তাড়াতাড়ি কলসীটা কাঁকে তুলে নিয়ে আর একহাতে পোয়াটা নিয়ে পিছন ফিরে যেতে যেতে বলে,— যাই সবাইকে খবরটা দি-ই-গে।
কমলা তাড়াতাড়ি করে হেঁটে বেড়ার দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সাগর চেঁচিয়ে বলে,— হ্যাঁ যাও, গ্রাম শুদ্ধু এবার ঢ্যারা পেটো গিয়ে।
কমলা সাগরের কথা কানে না নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেঁটে বেড়ার দরজা দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সাগর ওর যাওয়ার ধরণ দেখে মুখ দিয়ে বিরক্তি প্রকাশের একটা আওয়াজ করে মাথা নাড়িয়ে ঘরে ঢুকে যায়।

(১৯)

কুসুমের মাকে দেখে ফেরার পথে স্টেথোটা অর্ধবৃত্তাকারে গলায় ঝুলিয়ে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে আকাশ। বৃষ্টি ভেজা পিছল মাটির রাস্তায় হাঁটতে অসুবিধা হয় আকাশের। চারিদিকে গাছপালার মাঝখান দিয়ে সরীসৃপের মতো আঁকাবাঁকা অসমান মাটির রাস্তাটা বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। হাত ঘড়িটা খুলে চাবি দিতে দিতে ডানদিকে তাকিয়ে একটা পুকুর চোখে পড়ে আকাশের। পুকুরটাকে গোল করে পাড়ে কচু গাছ আর সন্ধ্যা মালতীর ঝোপ। পুকুরের চারিদিকে ঘন গাছ পালা আর বাঁশ ঝাড়। কয়েকটা বাঁশ ঝুঁকে পড়েছে জলের ওপর, তার ওপর ভর রেখেছে ঝুঁকে পড়া আর একটা হলুদ কল্কে ফুলের গাছ। আকাশ লক্ষ্য করে, পুকুরের চারিদিকে যে নারকেল গাছ গুলো দেখা যাচ্ছে তাদের উচ্চতা বেশী নয়। চারটে হাঁস পরপর আগে পিছনে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকাশ দাঁড়িয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে হাঁসগুলোর দিকে, তারপর আবার চলতে শুরু করে।

দূর থেকে ভেসে আসা নানা রকম ডাক আর আওয়াজের মধ্যে কাছেই কোথাও একটা নাম না জানা পাখী অদ্ভুত 'ক্যাচ্', 'ক্যাচ্' স্বরে, একটু থেমে থেমে ডেকে চলেছে।

পুকুরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়ে একটু নির্জন জঙ্গল মতো জায়গার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায়।

এবার বাঁদিকে বাঁক নিয়ে জঙ্গলটা যেন আরো ঘন বলে মনে হয়। কিছুদূর অন্তর নারকেল গাছ গুলোর সতর্ক দৃষ্টির পাহাড়ায় শাল, মহুয়া, শিমূল, পিয়াল, জংলী আম, দেবদারু, সিরিষ, ছাতিম, সোঁদাল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, ফুরুশ, বট, অশ্বত্থ, তেঁতুল আরো নাম না জানা কত গাছের পাতায় আচ্ছাদিত ও রংবাহারী ফুলের মেলায় সূর্য কিরণের অবাধ প্রবেশ নিষিদ্ধ জেহাদী জঙ্গলটাকে দেখে আকাশের মনে হয়,— 'এদিকে বোধহয় লোকজন কমই আসে।'

চারিদিকে ফুল দাওযাই, ন্যাগেস্টোরিয়া, এ্যালামুণ্ডা, গুলমোহর, হাসনুহানা, সন্ধ্যামালতী ও আরো নানা রঙের জংলী ফুলের ঝোপ! লাল, হলুদ, বেগুনী, সাদা ফুল গুলো সবুজের সাথে মিশে গিয়ে অযত্নে অবহেলায় ফুটে রয়েছে।

দূরে ধান ক্ষেত দেখা যায়। একটা কুব্ পাখীর বিরামহীন ডাকের মাঝে হাঁটতে থাকে আকাশ।

একটু দূরে একটা বড় ঝিল্ দেখে একটু দাঁড়িয়ে গিয়ে, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় ঝিলের দিকে।

ঝিলের কাছে এসে চারিদিকে দেখতে থাকে আকাশ। বেশ বড়ো ঝিলের মধ্যে কালো জল টলমল করছে। চারিদিকে ঘন ঝোপ ঝাড়, আগাছা আর বড় বড় গাছ। এদের চাইতেও আরো অনেক উঁচুতে মাথা তুলে ঝিলটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে নারকেল গাছ গুলো।

পাড় থেকে ঝিলের জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে কয়েকটা বড় গাছ। ঝিলের পাড়ে, পুরো ঝিলটাকেই প্রায় ঘিরে রেখেছে হলুদ আর লাল ফুল ফুটে থাকা কলাবতী গাছ এবং তিনরঙা সন্ধ্যামালতী গাছের ঝোপ।

আকাশের ডান দিকে, একটু দূরে ঝিলের পাড়ে একটা খেজুর গাছ ঝিলের জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে, জল ছুঁয়ে আবার ওপরের দিকে উঠে গেছে। তার ঠিক পাশেই একটা নারকেল গাছ একই ভাবে পাড় থেকে ঝুঁকে পড়ে জল ছুঁই ছুঁই করে আবার অনেকটা ওপরের দিকে উঠে গেছে। দুটো কাঠবিড়ালী বার বার দৌড়ে ওঠা নামা করছে খেলার ছলে।

নানা রকমের পাখীর ডাকের মাঝে এখানেও একটা কুব্ পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে। মেঘলা আকাশ। খুব ভালো লাগে জায়গাটা আকাশের। একটু দূরে ঝিলের বাঁধানো ঘাট দেখে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে একটা বসার জায়গা দেখতে পায়। আকাশ এগিয়ে গিয়ে বসে বাঁধানো বেদীর ওপর।

অনেকটা সিঁড়ি নীচে নেমে ঝিলের জল। আকাশ চারিপাশে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। ঝিলের চারিদিকে লাল হয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া গাছ। মাঝে মাঝে দু-একটা নয়নাভিরাম গাছ চোখে পড়ে। এদের মাঝে হলুদ ফুলে ভরা রাধাচূড়া গাছ গুলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেন আরো বাড়িয়ে তুলেছে। গ্রীষ্মের সকালে বেশ ঘন জঙ্গলের মতো জায়গায় চারিদিকে লাল, হলুদ, বেগুনী, সবুজ ও আরো

নানা রঙের চঞ্চল প্রাণ প্রচুর্য্যতার মাঝে বেশ বড় ঝিলটার শান্ত, সমাহিত নিরুদ্বেগ কালো জলটার দিকে তাকিয়ে থাকতে আকাশের খুব ভালো লাগে।

খুব কাছ থেকে একটা চেনা মিষ্টি গন্ধ অনুভব করে আকাশ ঘাড় ঘুরিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে উৎসটাকে খোঁজার চেষ্টা করে। আকাশের ঠিক পিছনেই একটা মহুয়া গাছ চোখে পড়ে। দীর্ঘাঙ্গী রূপসী অহংকারী মহুয়া গরিমার সাথে তার উপস্থিতি বোঝানোর জন্য শরীরের গন্ধ ছড়াচ্ছে। চারিদিক গন্ধে ম-ম করছে। আকর্ষনকারী মন মাতাল করা গন্ধ। অদ্ভুত গুণ রয়েছে এই মহুয়া ফুলের। সুন্দর মিষ্টি রিমঝিম করা নেশা জাগায় মনে। এক বৃদ্ধের মনেও সাময়িক ভাবে তার পুরোনো যৌবন ফিরিয়ে দিতে পারে। গভীর ঘুম হয় এই ফুলে। গরুকে খাওয়ালে বেশী দুধ দেবে। পায়ের কোথাও মচ্‌কে গেলে এই ফুল গরম করে দিলে রাতারাতি বাজিমাত।

একটা অদ্ভুত নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা ঘিরে রয়েছে জায়গাটাতে। কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করা জায়গা। একমনে ঝিলের জলের দিকে তাকিয়ে থাকে আকাশ। মনে মনে ভাবে,— 'এরকমই এক ঝিলের ধারে সুলেখার সাথে শেষ দেখা হয়েছিল।'
সেদিনের ছবিটা ভেসে ওঠে আকাশের মানসপটে।

(২০)

চারিদিকে গাছপালায় ঘেরা নানা রকমের পাখীর ডাকের মাঝে, একটা বিরাট ঝিলের পাড়ে গাছতলায় হেলান দিয়ে আকাশ আর সুলেখা বসে আছে। বেশ সুন্দর জায়গাটা। শীতের দুপুর কিন্তু সকাল থেকেই কেমন যেন আকাশের মুখ ভার। কত রকমের পাখী এসেছে ঝিলের জলে।

আকাশ আর সুলেখা দুজনেই চুপ করে বসে থাকে। আকাশ ঝিলের জলে পাখীগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশের মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে,— 'ভবিষ্যতে সুলোকে নিজের করে পাবে কিনা?'
কিছুক্ষণ পরে আকাশ ডাকে,— লেখা —
— উঁ। — সাড়া দেয় সুলেখা।
আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— তোমার বাবা-মা যদি রাজী না হয়?
চিন্তিত মুখে উত্তর দেয় সুলেখা,— আমিও কয়েকদিন ধরে সেই কথাই ভাবছি। তোমার তো ভালোভাবে দাঁড়াতে এখনো অনেক দেরী। কলকাতায় তোমাদের কোন বাড়িও তো নেই।
আকাশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর অধীর আগ্রহের সাথে বলে,— আমিও বিদেশ যাওয়ার টাকা প্রায় যোগাড় করেই ফেলেছি। ফিরে এসেই বিয়েটা করে নেব। দেখতে দেখতে কটা দিন ঠিক কেটে যাবে। একটু অপেক্ষা করতে পারবে না? আমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলব?
— না না, তোমায় কিছু করতে হবে না। আমিই দেখছি। — কেমন যেন ভয় পেয়ে সুলেখা, বলে।
মন মানেনা আকাশের, সুলেখাকে হারানোর একটা ভয় ঘিরে ধরে। বলে,— আর না হয়, চলো না রেজিষ্ট্রিটা করে রাখি। আমি বিদেশ যাওয়ার পর যদি কোন প্রবলেম হয় তাহলে আমাদের বাড়ি চলে যেও। মাকে বলে রাখবো আমি।
সুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আকাশ উত্তরের অপেক্ষায়। এর ওপরেই নির্ভর করছে আকাশের মানসিক উত্তেজনা কমিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া।

সুলেখা কেমন যেন একটু বিরক্ত হয়ে বলে,— ওহ্ গড, প্লীজ কিছু মনে কোর না, আমি তোমাদের গ্রামের বাড়িতে একটা দিনের জন্যও থাকতে পারব না। ওই মাটির ঘর, ফ্যান নেই, লাইট নেই, তারওপর কাদা, সাপের ভয়। তাছাড়া শ্বশুর শাশুড়ির সাথে এক সাথে থাকা? ওরে বাবা। সরি আকাশ, ও আমার দ্বারা হবে না।

মনে মনে আহত হয় আকাশ। চুপ করে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশকে চুপ করে থাকতে দেখে সুলেখা জিজ্ঞাসা করে,— কিছু বলছ না যে?

আকাশ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থেকেই বলে,— আমার কিছু বলার নেই লেখা।

— প্লীজ আমায় বোঝার চেষ্টা করো আকাশ। আমি এরকম লাইফ্ লিড্ করতে অভ্যস্ত নই। — আকাশকে বোঝানোর চেষ্টা করে সুলেখা।

আকাশ সুলেখার দিকে তাকিয়ে পাল্টা বোঝানোর চেষ্টা করে বলে,— আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসি লেখা। দুজন দুজনকে সারাজীবনের জন্য কাছে পেতে চাই। কটা দিনের জন্য আমরা দুজন দুজনের জন্য এতটুকু কষ্ট করতে পারব না? তাহলে কি ভালোবাসলাম দুজন দুজনকে। ভবিষ্যতে জীবনে তো এর থেকেও বড় সমস্যা আসতে পারে, তখন?

সুলেখা বুঝতে চায় না। অধৈর্য্য হয়ে আস্তে আস্তে কেটে কেটে বলে,— দেখো আকাশ, তুমিতো আমায় ভালোবাসো, তাহলে তুমি নিশ্চই চাও যে আমি ভালো থাকি।

অবাক চোখে বেশ প্রত্যয়ের সাথে আকাশ বলে,— একশো বার। তোমার প্রতি আমারও একটা অলিখিত দায়বদ্ধতা আছে এবং সেটা অন্তর থেকে। কারণ আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি এবং শুধু তোমারই জন্য।

বিরক্ত হয়ে অবজ্ঞার স্বরে বলে সুলেখা,— কিন্তু তুমিতো আমাকে কোন সিকিউরিটিই দিতে পারছ না। আমি কোন ভরসায় তোমার সঙ্গে রেজিষ্ট্রি করব বলতে পারো?

একটু থেমে কয়েক মুহূর্ত আকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বলে,— আকাশ, আমি একটা মেয়ে, আমি সিকিউরিটি চাই। এটা তোমার বোঝা উচিৎ। তুমি যদি আমাকে সত্যিই ভালো বেসে থাকো, তাহলে আমার জীবন নিয়ে অনিশ্চয়তার সাথে কেন ছিনিমিনি খেলতে চাইছ?

অবাক চোখে আকাশ সুলেখার দিকে তাকিয়ে থাকে। সুলেখা ভ্রুক্ষেপ না করে উত্তেজিত হয়ে একনাগাড়ে বলে যায়,— তাছাড়া যে ভালোবাসায় বিশ্বাস নেই, সেই ভালোবাসা স্থায়ী হয় না আকাশ। তুমিতো আমায় বিশ্বাসই করতে পারছ না। তুমি ভাবছ তুমি বিদেশে যাওয়ার পর যদি আমি অঞ্জনকে বিয়ে করে বসি।

আকাশ সুলেখাকে অশ্বস্ত করে রাগ কমানোর চেষ্টায় বলে,— না, আমি সেরকম কিছু ভাবছি না। কারণ তোমার ওপর সে বিশ্বাস আমার আছে। আমি রেজিষ্ট্রির কথা বলছিলাম কারণ তোমার ওপর যদি কোন রকম চাপ আসে আমার অনুপস্থিতিতে। আমাকে-তো তখন তুমি কাছে পাচ্ছো না। আর লেখা, ভালোবাসায় একটা হারানোর ভয় অবচেতন মনে কাজ করেই। এটা সবার ক্ষেত্রে, শুধু আমার একার নয়। তোমাকে বোঝাতে পারব না আমি। সারাক্ষণ একটা ভয় আমাকে কুয়াশার মতো ঘিরে থাকে, যদি তোমাকে আমায় হারাতে হয়। আমি খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। আমার বাবা গ্রামের একজন স্কুল মাষ্টার। আর্থিক যোগ্যতার মাপকাঠিতে আমার স্থান তোমাদের থেকে যে অনেক নীচে ত আমি জানি। কিন্তু লেখা, ভালোবাসা কি এটা মানতে চায় না শুনতে চায়?

রাগ কমে না সুলেখার। বলে,— না আকাশ, আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস এসে গেছে। এর আগেও কয়েকবার তোমার কথাবার্তায় আমার মনে হয়েছে যে, তুমি অঞ্জনকে নিয়ে আমায় সন্দেহ করছ। এরকম অবিশ্বাস নিয়েতো ভালোবাসা টিকিয়ে রাখা যায় না আকাশ।
আকাশ মাথা নাড়িয়ে কিছু বলতে যায়, কিন্তু সুলেখা আকাশকে বলতে না দিয়ে বলে যায়,— অঞ্জনের কথা যখন উঠলোই, তখন বলি, অঞ্জনের সাথে আমার যথেষ্ট ভালো বন্ধুত্ব, কিন্তু এর বেশী কিছু নয়। ও আমায় বিয়ে করতে চাইছে এটাও ঠিক এবং এখন থেকেই বলতে শুরু করেছে, ফ্ল্যাট কিনে আলাদা থাকবে আমাকে নিয়ে। বিয়ের পরে আমাকে ইউরোপ ট্যুরে নিয়ে যাবে। এইতো কালকেই বলেছে আমাকে ওর সাথে ফ্ল্যাট আর গাড়ী পছন্দ করতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমি না বলে দিয়েছি। ইচ্ছা করলে আমিতো যেতে পারতাম।
কিছুক্ষণ চুপ করে ঝিলের জলের দিকে তাকিয়ে থাকে আকাশ, তারপর ধীরে ধীরে বলে,— দেখো লেখা, আমি আজ পর্যন্ত যা কিছু করেছি তা আমার নিজের পরিশ্রমে। খুব কষ্ট করে আমাকে ছোট থেকে বড় হতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। আজও যা কিছু করছি বা করতে যাচ্ছি তার জন্যও আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কেউ হাতে করে ধরে দেয়নি আমাকে। আর অঞ্জন বাবু বড়লোকের একমাত্র ছেলে। বাবা তার তৈরী ব্যবসায় ছেলেকে বসাবে এটাইতো স্বভাবিক।
ভীষণ রেগে যায় সুলেখা। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— ডোন্ট বি জেলাস্ আকাশ। তুমি ভীষন মিন্ মাইন্ডেড হয়ে গেছ। এসব কথা বলে অঞ্জনকে ছোট করার চেষ্টা কোর না।
অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে আকাশ সুলেখার দিকে। মনে মনে ভাবে,— 'সুলেখা কি সত্যিই ভালোবাসে আমাকে?'
খুব রাগ হয় আকাশের। তবুও শান্ত গলায় বলে,— আমি কাউকে ছোট করছিনা লেখা, আমি শুধু বলতে চাইছি যে, অঞ্জন বাবু সোনার চামচ্ মুখে নিয়েই জন্মেছেন। আর আমি একজন গ্রামের দরিদ্র সন্তান, সবে ডাক্তারী পাশ করেছি। অঞ্জন বাবুর সাথে কোন তুলনাই হয় না আমার। ওনার এখন স্বপ্ন দেখার সময় এবং এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি? সবে ডাক্তারী পাশ করে অতীতের সাদা ক্যানভাসটাকে দাঁড় করিয়েছি। ভবিষ্যতের স্বপ্নকে পাথর চাপা দিয়ে বিদেশ যাচ্ছি রং তুলি যোগাড়ের স্বপ্ন নিয়ে। এই স্বপ্ন যদি সাকার হয় তবেই ফিরে এসে এই সাদা ক্যানভাসে বিদেশী রংতুলি দিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্নের ছবি আঁকব।
ঝাঁজিয়ে ওঠে সুলেখা,— তাহলে কেন আমাকে রেজিষ্ট্রি করতে বলে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে যাচ্ছ?
হতাশ হয়ে আকাশ বুঝতে পাবে সুলেখাকে বুঝিয়ে কোন লাভ নেই। বিরক্ত হয়ে বলে,— চলো ওঠো —
কথা শেষ হওয়ার আগেই সুলেখা উঠে দাঁড়িয়ে বলে,— আমাকে নতুন করে আবার ভাবতে হবে আকাশ।
আকাশ সুলেখাকে একবার দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। হাঁটতে শুরু করে দুজনে। আকাশ কোন উত্তর না দিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাথা নাড়িয়ে নিজেই নিজেকে মনে মনে বলে,— 'নিজের ওজন না বুঝে এগোনটা খুব ভুল হয়ে গেছে।'

দুজনে কোন কথা না বলে হেঁটে এগিয়ে যায়।

একমনে ঝিলের জলের দিকে তাকিয়ে বসে আছে আকাশ।

দূর থেকে আকাশকে বসে থাকতে দেখে সাগর এগিয়ে এসে আকাশের পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে। আকাশ সাগরের উপস্থিতি বুঝতে না পেরে একই ভাবে তাকিয়ে থাকে ঝিলের দিকে। সাগর বুঝতে পারে যে, আকাশ গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন। এদিক ওদিক দেখে আস্তে আস্তে ডাকে,— শুনছেন।

আকাশের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে আবার ডাকে,— শুনছেন।

চিন্তাছিন্ন হয় আকাশের, চম্‌কে উঠে মুখ ফেরায়। সাগরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি করে বলে,— ও আপনি!

একটু থেমে বলে,— হঠাৎ এখানে?

— এত কি ভাবছেন গভীর ভাবে? — হেসে বলে সাগর।

আকাশ হেসে উত্তর দেয়,— কিছু না। খুব ভালো লাগছিল জায়গাটা, তাই একটু বসেছিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে বলে,— চলুন —

সাগর আকাশের সাথে হাঁটতে হাঁটতে বলে,— আপনি আসছেন না দেখে খুব চিন্তা হচ্ছিল। ভাবলাম পথ হারিয়ে ফেলেছেন বুঝি, এতক্ষণতো লাগার কথা নয়। কুসুম এসে দাঁড়িয়ে আছে ওষুধ নেবে বলে। ও বলল আপনি অনেক্ষণ বেরিয়ে গেছেন। বাবা একা আছে, তাই ওকে দাঁড়াতে বলে আমি আবার বেরোলাম। কতক্ষণ ধরে খুঁজছি আপনাকে।

কোন কথা না বলে আকাশ হাঁটতে থাকে মাথা নীচু করে। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে সাগর জিজ্ঞাসা করে আকাশকে,— কথা বলছেন না যে? মাসীর সামনে তখন ওরকম ভাবে কথা বলেছি বলে?

আকাশ কোন উত্তর দেয় না দেখে সাগর আবার বলে,— কি করব বলুন। বুঝতেই তো পারছেন। এরা যদি জানতে পারে আপনি আমার কেউ নন, অথচ আমার বাড়িতে রাত কাটিয়েছেন, তাহলে আর দেখতে হবে না। আপনি চলে যাবেন, কিন্তু আমাকে তো এখানেই থাকতে হবে। ইতি মধ্যেই সারা গ্রামে —সাগরকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আকাশ বলে,— না না আমি কিছু মনে করিনি। আমি বুঝতেই পেরেছি।

— তাহলে কথা বলছেন না যে? — আকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে সাগর।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে আকাশ বলে,— হিসাব করছিলাম।

অবাক হয়ে সাগর জিজ্ঞাসা করে,— কিসের হিসাব?

— জীবনের। — অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দেয় আকাশ।

সাগর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,— হঠাৎ এই সময়ে?

আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— কিছু কিছু ঘটনা হঠাৎ-ই হয় মানুষের জীবনে।

— বাড়িতে কে কে আছে আপনার? — সাগর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

আকাশ মুখে কোন কথা না বলে মাথাটা নীচু করে নাড়ায়।

আকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে সাগর.— মা, বাবা, স্ত্রী, এরা —

কথা শেষ করতে না দিয়ে আকাশ বলে,— নাহ্। একদম একা।

— আপনিও একা? — অন্যদিকে তাকিয়ে বলে সাগর।

আকাশ হাঁটতে হাঁটতে ওপরের দিকে তাকিয়ে বলে,— এমন ভাবে কথাটা বললেন, যেন আপনিও একা।
কথাটা বলে আকাশ সাগরের দিকে তাকায়। সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসে, তারপর অন্যদিকে মুখ ঘোরায়। সামনের পুকুরটাতে হাঁসগুলো তখনও ভেসে বেড়াচ্ছে। দুজনে বাঁদিকে বেঁকে যায়।
আকাশ সাগরকে জিজ্ঞাসা করে,— শ্বশুরমশাইকে সকালে ওষুধটা দিয়েছেন?
— হ্যাঁ, একটু আগে দিয়েছি। — উত্তর দেয় সাগর।
দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গিয়ে ডানদিকের রাস্তাতে ঢুকে যায়।

(২২)

আকাশ আর সাগর বেড়ার দরজা ঠেলে উঠোনে ঢুকে দেখে, কুসুম দুটো পুতুল নিয়ে দালানের সিঁড়িতে বসে খেলছে। আকাশকে দেখে উঠে তাড়াতাড়ি করে উঠে দাঁড়ায় কুসুম। কুসুমকে দাঁড়াতে দেখে সাগর এগিয়ে আসতে আসতে বলে,— তুই দাঁড়ালি কেন, বোস্।
কুসুম সিঁড়ি থেকে নেমে উঠোনে দাঁড়ায়। আকাশ সাগরের আগে আগে এগিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়।
— বোস্ তোকে ওষুধ দিচ্ছে। — সাগর কুসুমের গাল টিপে কথা গুলো বলে আকাশের পিছনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়। কুসুম চুপচাপ তাকিয়ে থাকে ওদের যাওয়ার দিকে। আকাশ আর সাগর দুজনে ঘরে ঢুকে যায়। কুসুম দালানে পা ঝুলিয়ে বসে, পুতুল দুটোকে দালানে রেখে খেলতে শুরু করে।

কিছুক্ষণ পর আকাশ কয়েকটা ওষুধ হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে। কুসুম পুতুলগুলো তুলে নিয়ে দালান থেকে নেমে দাঁড়ায় উঠোনে। আকাশ সিঁড়ি দিয়ে নেমে কুসুমের কাছে এসে দাঁড়ায়। কুসুম তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। আকাশ কুসুমকে বলে,— এর মধ্যে চারটে ওষুধ আছে। এখন একটা দেবে, রাত্রে একটা দেবে। আবার কাল সকালে একটা, রাত্রে একটা, কেমন?
কুসুম মাথা নাড়িয়ে 'হ্যাঁ' জানায়।
আকাশ কুসুমের হাতে ওষুধগুলো দিয়ে কুসুমকে জিজ্ঞাসা করে,— কি বললাম বলোতো?
কুসুম কচি গলার মিষ্টি আওয়াজে উত্তর দেয়,— এখন একটা ওষুধ খেতে বলব, আর একটা রাত্রে খেতে বলব।
বাকী কথাটা আকাশ নিজেই আবার বলে দেয়,— হ্যাঁ, আর একটা কাল সকালে, আর একটা কাল রাত্রে।
কুসুম মাথা নাড়ে। আকাশ কুসুমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করে,— কি নাম তোমার?
— কুসুম।
আকাশ হেসে বলে,— বাঃ, খুব সুন্দর নামতো তোমার।
কুসুম আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসে। আকাশ বলে,— ঠিক আছে তুমি যাও।
কুসুম একহাতে পুতুল আর একহাতে ওষুধ নিয়ে এগিয়ে গিয়ে তুলসী মঞ্চের কাছে আবার পিছন ফিরে ভয়ে ভয়ে আস্তে করে ডাকে,— ডাক্তারবাবু —

ঘরে ঢোকবার মুখে আকাশ দাঁড়িয়ে গিয়ে কুসুমের দিকে ফিরে তাকায়। কুসুম করুন মুখে জিজ্ঞাসা করে,— আমার মা সেরে যাবে তো?
কয়েক মুহূর্ত কুসুমের দিকে তাকিয়ে থেকে আকাশ হেসে বলে,— হ্যাঁ সেরে যাবে। তুমি গিয়ে ওষুধটা এখনই তোমার মাকে খাইয়ে দাও।
কুসুম আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়ে বেড়ার দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। আকাশ সেদিকে একটু তাকিয়ে হেসে ঘরে ঢুকে যায়।

(২৩)

আকাশ ঘরে ঢুকে দেখে সাগর বিছানা ঠিক করছে। সাগব বিছানার চাদরটা টান টান করে বিছানার নীচে গুঁজতে গুঁজতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে.— এবেলা আর ট্রেন পাবেন না। দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তিত মনে আকাশ বলে,— আমিও তাই ভাবছি। যাই হোক ষ্টেশনেতো যাই। চাদর গোঁজা হয়ে যায় সাগরের। আকাশের কথা শুনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে অবাক হওয়ার মতো করে বলে,— এখন গিয়ে কি করবেন? ট্রেনতো সেই রাত্রে আবার, এতক্ষণ বসে থাকবেন?
— খুব অসুবিধায় ফেলে দিলাম আপনাকে। — হেসে বলে আকাশ।
সাগর বালিশ ঠিক করতে করতে উত্তর দেয়,— ওমা, আমি বরং ভাবছি, আপনি যা উপকার করছেন তার তুলনায় আমি কিছুই যত্ন করতে পারিনি আপনাকে।
ব্যস্ত হয়ে আকাশ বলে,— না না আমি আবার কি উপকার করলাম?
বালিশটা বিছানাব ওপর রাখতে রাখতে সাগর বলে,— গতকাল রাত্রে বাবাব যা অবস্থা হয়েছিল। আপনি না থাকলে কি হতো বলুনতো আমার। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি।
— কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না ওনার? — পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে আকাশ। নীচু হয়ে খাটের তলা থেকে ঝাঁটা বার করতে করতে উত্তর দেয়,— সকাল থেকে কেমন যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে নিজেব মনে কথা বলছে কিসব।
দালানেব দিকে তাকিয়ে চিন্তিত মুখে আকাশ বলে,— হার্টের যা অবস্থা তাতে —
কথা শেষ কবতে না দিয়ে সাগর বলে,— আমি জানি। যা কষ্ট পাচ্ছে শারীরিক ও মানসিক ভাবে, তাতে চলে যাওয়াই ভালো একদিকে।
বিছানার নীচ থেকে ঝাঁটাটা বার করে আঁচলটা কোমরে গুঁজে, নীচু হয়ে ঘর ঝাঁট দেয় সাগর। আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ তারপর জিজ্ঞাসা করে,— একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?
নীচু হয়ে খাটের তলাটা ঝাঁট দিতে দিতে সাগর বলে,— বলুন, আপনি খাটে উঠে বসুন।
আকাশ পা তুলে খাটে উঠে বসে বলে,— গতকাল আপনি যে চিঠিটা পড়ছিলেন —
কথা শেষ করতে না দিয়ে খাটের তলাব ময়লা গুলো ঝাঁটা দিয়ে বাইরে বের করে আনতে আনতে সাগব বলে,— সাদা কাগজ, তাই তো?
আকাশ চুপ করে তাকিয়ে থাকে। সাগর নিজেই আবার বলে,— কি করব বলুন? অসুস্থ অন্ধ মানুষ, ছেলেকে দেখার জন্য পাগল হয়ে পড়েছেন। হয়তো আজ বাদে কাল চলে যাবেন। সান্ত্বনা দিয়ে চুপ তো করাতে হবে।
একটু চুপ করে থেকে আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— আপনার স্বামী কি করেন?

ময়লা গুলোকে ঝাঁটা দিয়ে চৌকাঠের বাইরে দালানে ফেলতে ফেলতে সাগর মাথা নীচু করে জিজ্ঞাসা করে,— কেন বলুন তো?

— না এমনিই। আসলে আপনার শ্বশুরমশাই ছেলেকে দেখতে চাইছেন তো। — একটু হেসে কথা গুলো বলে আকাশ।

সাগর কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে।

আকাশ একটু জোরেই বলে,— এবেলা যখন যাওয়া হোলই না তখন বরং একটু ঘুরেই আসি। খুব সুন্দর গ্রামটা আপনাদের।

সাগর ঘরের বাইরে গিয়ে দালান ঝাঁট দিতে দিতে আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বলে,— গ্রামের মানুষগুলো কিন্তু আরো সুন্দর।

— সে তো আপনাকে দেখেই বোঝা যায়। — সাগরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে আকাশ।

সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসে, তারপব ঝাঁট দিতে দিতে দালানের ওপাশে চলে যায়।

(২৪)

আকাশ খাট থেকে নেমে দালানে এসে দেখে সাগর দালান থেকে ঝাঁট দিয়ে ময়লা গুলো উঠোনের মধ্যে ফেলছে। সাগরের দালান ঝাঁট দেওয়া হয়ে যায়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে আকাশকে দেখে বুকের কাপড়টা টেনে ঠিক করে নিয়ে বলে,— একটু বসুন।

ঝাঁটাটা দালানে ফেলে রেখে এগিয়ে এসে ঘরে ঢুকে যায়।

আকাশ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আব দেশলাই বের করে একটা সিগারেট ঠোঁটে দিয়ে দেশলাই কাঠি জ্বেলে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা পকেটে ঢুকিয়ে এদিক ওদিক দেখতে থাকে আর মনে মনে ভাবে,— 'মেয়েটা বেশ পরিশ্রমী বলে মনে হয়। অবশ্য গ্রামের মেয়েরা এরকমই হয়। সারাদিন করবেই বা কি। কাজের মধ্যে থাকলে সময়টা তো অন্তত কাটবে।'

একটা বাটিতে করে মুড়ি আর নারকেলের কিছু টুকরো নিয়ে বেরিয়ে আসে সাগর। আকাশের দিকে বাটিটা বাড়িয়ে ধবে বলে, এটা খেয়ে নিন।

আকাশ হাত বাড়িয়ে বাটিটা নেয়। সাগর শাড়ীর আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বলে,— দেশের ঘরে মুড়িটাই বেশী চলে। আজকের দিনটা একটু কষ্ট করুন।

আকাশ হেসে বলে,— আপনার সংকোচ করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ, আমিও গ্রামেরই ছেলে। কিন্তু এসব কি করেছেন বলুন তো? আমার খুব খারাপ লাগছে।

সাগর চোখ বড় বড করে ঠোঁট কামড়ে হেসে বলে,— নারায়ণকে উপোসী রাখতে নেই।

— মুড়ি নারকেল আমারও খুব প্রিয়। — মুড়ির বাটির দিকে তাকিয়ে বলে আকাশ।

অন্যদিকে তাকিয়ে আবার বলে আকাশ,— মায়ের কথা মনে পড়ছে। মা রান্না করত আর আমি পাশে বসে বসে মুড়ি নারকেল খেতাম। বিদেশ যাওয়ার আগের দিনও —

কথা শেষ না করে অন্য দিকে তাকিয়ে মায়ের কথা চিন্তা করে আকাশ।

সাগর আকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ সাগরের লক্ষ্য পড়ে আকাশের দু-আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটটার ওপর। চট্ করে আকাশের হাতটা ধরে অবশিষ্ট সিগারেটের টুকরোটা আকাশের আঙুলের ফাঁক থেকে নিয়ে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে,— ডাক্তার হয়েও এগুলো

খান কেন? অন্যকে তো খুব উপদেশ দেন।
আকাশ চম্‌কে উঠে ঘুরে তাকায় সাগরের দিকে, তারপর হেসে বলে,— টাকা নিই যে।
সাগর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে,— খুব হয়েছে। এবার খেয়ে নিন দেখি।
সাগর ঘরে ঢুকে যায়। আকাশ মুখে একটু মুড়ি দিয়ে একটা নারকেলের টুকরোয় কামড় দেয়।

(২৫)

মেঘলা আকাশ। খুব হাওয়া বইছে। আকাশ দুপাশে হাওয়ায় দুলতে থাকা সবুজ ধান ক্ষেতের মাঝে আলের ওপর দিয়ে অলস ভাবে হাঁটতে হাঁটতে চারিদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। নানা রকমের সবুজ। ঘন সবুজ, হাল্কা সবুজ, হলদেটে সবুজ, লালচে সবুজ। মাথার ওপর ধূসর আকাশটা দূরে সবুজ বনবীথির ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

দূর থেকে হাল্কা করে বিভিন্ন রকম পাখীদের ডাক ও আওয়াজ ভেসে আসা সত্ত্বেও চারিদিকে কেমন যেন একটা নিস্তব্ধতা বিরাজমান। আকাশের মনে হয়,— 'এটাই বোধ হয় গ্রামের নিস্তব্ধতা, সবুজের নিরবতা, প্রকৃতির মৌনতা।

দূরে একটা লোককে বাঁকে করে কিছু বয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে আসতে দেখা যায়। লোকটির শরীরের দোলায় বাঁকটাও তাল মিলিয়ে দুলছে। হাওয়ায় অবিন্যস্ত চুল গুলোকে হাত দিয়ে ঠিক করার ব্যার্থ চেষ্টা করতে করতে এগিয়ে যায় আকাশ। কাদা হয়ে যাওয়া রাস্তায় আকাশের পা দুটো ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে বারবার হড়কে যেতে থাকে। সাবধানে পা ফেলে হাঁটতে থাকে আকাশ।

নিজের গ্রামের কথা মনে পড়ে। গ্রীষ্মকালে কতদিন সন্ধ্যাবেলা নিজেদের জমির আলের ওপর সুজয়ের সাথে বসে গল্প করত। দূর থেকে ভেসে আসা হাসনুহানা ফুলের গন্ধে মাতাল হওয়া ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে মেখে আপন মনে বাঁশীতে সুর তুলতো আকাশ। সুজয় চুপ করে বসে শুনতো। সময়ের হিসেব থাকতো না। অনেক্ষণ পর একসময় আকাশ নিজেই বাঁশী বাজানো থামিয়ে সুজয়কে বলতো,— কি রে, বাড়ি যাবি না?
— পরে যাবো এখন উঠতে ইচ্ছা করছে না। তুই বাঁশী বাজা।
আকাশ বলতো,— আবার কাল বাজাবো। আজ চল্, অনেক রাত হোল।
রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুজয় বলে,— জানিস আকাশ, তোর বাঁশীর সুর শুনলে না, বুকের মধ্যে কেমন যেন কষ্ট হয়।
আকাশ হেসে জিজ্ঞাসা করে,— কেন রে?
একটু চিন্তা করে সুজয় বলে,— ঠিক বলতে পারবো না।
— ঠিক আছে কাল থেকে তোর সামনে আর বাঁশী বাজাবো না। — হেসে বলে আকাশ।
সুজয় তাড়াতাডি করে বলে ওঠে,— নারে, ওই কষ্টর মধ্যেই তো আনন্দ লুকিয়ে আছে, এযে আনন্দের কষ্ট।
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুজয় আবার বলে,— জানিস্, তুই যখন বাঁশী বাজাস না, তখন আমার মনটা সেই রূপ কথার দেশে, যেখানে রাখাল বালকেরা বাঁশী বাজিয়ে গরু চরায়, সেখানে পৌঁছে যায়। সেখানে যেন কত অনন্দ, কত সুখ। আর যেই তুই বাঁশী বাজানো বন্ধ করিস, মনটা আবার এই ময়নামতী গাঁয়ে ফিরে আসে। কেমন যেন একটা না পাওয়ার যন্ত্রনা ঘিরে

ধরে আমাকে। তখন বুকের মধ্যে বড় কষ্ট হয়।
আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— কিসের না পাওয়ার যন্ত্রনা?
সুজয় মাথা নাড়িয়ে বলে,— তা জানি না।
আকাশ হেসে ফেলে। মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে সুজয় জিজ্ঞাসা করে,— আচ্ছা আকাশ, তুই তো ডাক্তারী পড়া শুরু করেছিস। একদিন বড় ডাক্তারও হবি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন খুব বড় ডাক্তার হোস তুই।
একটু থেমে আপসোসের সুরে বলে আবার,— আমার তো আর পড়াশোনা হল না। তোর শহরে কত বড়লোক বন্ধু হবে। সেদিন তুই গ্রামের এই বন্ধুটাকে ভুলে যাবি না তো?
আকাশ হেসে বলে,— দুর বোকা, বন্ধু আবার কখনো বন্ধুকে ভুলে যায়!
সুজয় করুন মুখ করে বলে,— কি জানি? অভাব তো আমার কাছ থেকে সবাইকে কেড়ে নিয়েছে। তুই-ই আমার একমাত্র বন্ধু। তাই তুই যদি কোনদিন আমাকে ভুলে যাস তবে খুব কষ্ট হবে রে।
দুজনে চুপ করে হাঁটতে থাকে। আকাশের বাড়ি ছাড়িয়ে আরো কিছুটা দূরে সুজয়ের বাড়ি। বাড়িতে থাকার মধ্যে একমাত্র বিধবা মা। সুজয় খুব ছোট বয়সেই বাবাকে হারিয়েছে। আকাশের বাড়ির কাছে এসে সুজয় আকাশকে বলে,— একটা জিনিস চাইব দিবি?
আকাশ পকেটে হাত দিয়ে স্নেহ মেশানো গলায় জিজ্ঞাসা করে,— তোর টাকা লাগবে?
সুজয় বলে,— না-রে, টাকা লাগবে না।
একটু থেমে বলে,— তোর-তো অনেক গুলো বাঁশী আছে, কলকাতায় যাওয়ার সময় আমায় একটা দিয়ে যাবি?
— কেনরে, তুই বাঁশী বাজাবি? — আকাশ হেসে জিজ্ঞাসা করে।
সুজয় আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— দূর, আমি বাঁশী বাজাতে পারি নাকি? তুই যখন এখানে থাকবি না তখন তোর বাঁশীটা আমার কাছে থাকবে। আমি মনে করব তুই আমার কাছে আছিস।
আকাশ বাঁশীটা সুজয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে,— পরে যদি ভুলে যাই, তুই এখনই নিয়ে যা।
আকাশের মনটা আবার ফিরে আসে আলের ওপর।

সামনে বাঁক নিয়ে আসা লোকটাকে দেখতে পায় না। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে লোকটা বেশ কিছুটা দূরে চলে গেছে। নিজের মনেই বলে,— 'লোকটা কখন চলে গেল খেয়ালই করলাম না।'
সুজয়ের মুখটা আবার ভেসে ওঠে আকাশের সামনে।

সন্ধ্যে বেলা বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আকাশকে জিজ্ঞাসা করে সুজয়,— আচ্ছা আকাশ, মানুষ মরে গেলে কোথায় যায় বলতো?
আকাশ হেসে বলে,— কোথায় আবার যাবে, হয় পুড়ে ছাই হয়ে যায়, নাহলে কবরের তলায় যায়।
নারে,— সুজয় মাথা নাড়িয়ে বলে।
অবাক হয়ে আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— 'নারে' মানে?
সুজয় আস্তে আস্তে বলে,— সবাই পুড়ে ছাই হয় না বা কবরের নীচে যায় না।
— তাহলে? —
— আমাদের মতো কিছু মানুষ আছে, যারা বেঁচে যায়।

দূরের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুজয়ের মৃত্যুটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে আকাশের।

আকাশ তখন কলকাতায় জমিয়ে প্র্যাকটিস্ করছে। একদিন রাতে কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে ফেরার পথে চালতাখালি বাঁধের ওপর অনাথের কাছ থেকে খবরটা পেয়ে দৌড়তে দৌড়তে গিয়েছিল আলের কাছে, যেখানে দুজনে বসে থাকত সারা সন্ধ্যে।

চারিদিকে লণ্ঠন হাতে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর ভীড় সরিয়ে মুখ বাড়াতেই, মাটির ওপর পড়ে থাকা সুজয়ের লাশটা চোখে পড়ে আকাশের।

একহাতে ধরা আকাশের দেওয়া বাঁশীটা আর ফলিডল বিষের যন্ত্রনাময় মৃত্যু সত্ত্বেও সুজয়ের ঠোঁটের কোনে এক চিলতে হাসি যেন আকাশকে সেদিন একথাই বলতে চেয়েছিল, "আমি অনেক বড় যন্ত্রনা থেকে আজ মুক্তি পেলাম-রে"।

সেদিন কাঁদেনি আকাশ। সুজয়ের পাশে বসে, বুকে অব্যক্ত এক যন্ত্রনা নিয়ে সুজয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সজোড়ে একটা চড় মেরেছিল সুজয়ের গালে। আর মনে মনে বলেছিল,— 'যে বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে পারে না, বন্ধুকে একলা ফেলে রেখে পালিয়ে যায়, তার সাথে আবার বন্ধুত্ব কিসের রে? তুই বন্ধু হওয়ার যোগ্যই নস।'

বাঁশীটা সুজয়ের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে শক্ত করে ধরে থাকা বাঁশীটা টেনে বার করতে কষ্ট হয় আকাশের। আকাশ সুজয়ের মুখের দিকে তাকায়। সুজয়ের ঠোঁটের কোনে লেগে থাকা হাসিটা যেন আকাশকে বলছে,— 'রাগ করছিস কেন ভাই, একটু ভালোভাবে বাঁচব বলে, তোরই দেওয়া বাঁশীটাকে সম্বল করেইতো রূপ কথার দেশে পাড়ি দিয়েছি। সবইতো গেছে, এটা কেড়ে নিস্ না ভাই।'

হাত সরিয়ে নেয় আকাশ। সুজয়কে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঠেকিয়ে সুজয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মনে মনে সুজয়কে বলে,— 'একি করলি তুই? আমি যে তোকে কলকাতা নিয়ে যাবো বলে এসেছিলাম।'

সেই মুহূর্তে হাসনুহানার গন্ধ মেশানো দমকা বাতাস যেন আকাশের কানে কানে বিদ্রূপ করে বলে যায়,— 'অনেক দেরী করে ফেলেছ তুমি, নাম-যশের রঙিন মোড়কের আবরনে সজ্জিত হয়ে খ্যাতির চূড়ায় বসে তুমি যখন প্রতি মুহূর্তের আর্থিক হিসাব করতে ব্যস্ত, তখন ক'টা মুহূর্তের জন্য মনে করেছিলে এই বন্ধুর কথা? — যে একটু ভালো ভাবে বাঁচার স্বপ্ন আর নিদারুন অভাবের মোচড় দেওয়া বুক ভরা যন্ত্রনা নিয়ে সারাটা দিন লড়াই চালিয়ে, রাতে রণক্লান্ত সৈনিকের মতো তোমার দেওয়া এই বাঁশীটা বুকে চেপে ধরে জোনাকীর আলোয় রাত কাটিয়েছে পরদিন নতুন লড়াইয়ের জন্য? তুমি না কথা দিয়েছিলে, তুমি সুজয়কে ভুলবে না।

আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওপরের দিকে তাকিয়ে আকাশ মনে মনে বলে,— আমি তোকে ভুলিনি সুজয়। কোনদিনই ভুলব না। তুই যেখানেই থাক্, ভালো থাকিস। জানিস সুজয়, আজ আমিও বড় একা-রে, কেউ নেই আমার।

সুজয়ের বৃদ্ধা মায়ের কথা মনে পড়ে আকাশের। ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে এক ফোঁটাও চোখের জল না ফেলে পাথরের মতো স্থির হয়ে গেছিলেন। কিছুতেই বিশ্বাস করানো যায়নি যে সুজয়

আর নেই।

কি গ্রীষ্মের বকুল ঝরা সন্ধ্যায় বা বর্ষন সিক্ত দোপাটি ফুলের পাপড়ি খসে যাওয়া সন্ধ্যায়, কিম্বা শরতের শিউলি ঝরা সন্ধ্যায়, না হয় শীতের হিমেল হাওয়ায় স্বর্ণগাঁদার দোল খাওয়া সন্ধ্যায় অথবা বসন্তের সোনাঝরা সন্ধ্যায় আজও সুজয়ের বৃদ্ধা মা প্রতিদিন সারাদিনের কাজ সেরে এসে দাওয়ায় লণ্ঠন নিয়ে বসে থাকে অনেক রাত অবধি এই বিশ্বাস নিয়ে যে, তার একমাত্র সন্তান, চোখের মণি সুজয় একদিন না একদিন ফিরে আসবেই।

হাঁটতে হাঁটতে আকাশ ভাবে,— 'না জানি ময়নামতী গাঁয়ের মতো আরো কত জায়গা আছে যেখানে অসংখ্য সুজয়রা রোজ ঘন অন্ধকার আর অনিশ্চয়তার মাঝে দুবেলা একটু পেট ভরে খাওয়ার জন্য, সমস্ত আশা আকাঙ্খা, স্বপ্নের জলাঞ্জলি দিয়ে, অভাবের সাথে লড়াই করতে করতে শেষে পরাজয় স্বীকার করে। অসহ্য মানসিক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে রূপ কথার দেশে পাড়ি দেয়। আর তাদের বৃদ্ধা মায়েরা ঝিঁঝির ডাকের মধ্যে দাওয়ায় বসে তারাদের সাথে রাত জাগে রাস্তার দিকে তাকিয়ে মনে অসীম প্রত্যাশা নিয়ে, কখন তার হারানো নিধি ঘরে ফিরবে।'

'মুখে সর্বদা মহান আদর্শের বুলি আওড়ানো কতজন লোক তার হিসাব রাখে?'

গ্রামটা ঘুরে দেখবে বলে বেরিয়েছিল আকাশ, কিন্তু মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে আসার জন্য পা বাড়ায়।

(২৬)

দুহাতে আঁজলা করে বকুল ফুল নিয়ে কুসুম বেড়ার দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখতে পায় সাগর উঠোনে ঝাঁট দিচ্ছে। সাগর ঝাঁট দিতে দিতে কুসুমকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে,— কি রে কুসুম?

কুসুম সাগরের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে,— তোমার বরটা কোথায় গো?

আকাশ বেড়ার দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে কুসুমের কথাটা শুনতে পেয়ে আস্তে আস্তে কুসুমের পিছনে এসে দাঁড়ায়। কুসুম টের পায় না। কুসুম আবার জিজ্ঞাসা করে,— বলোনা গো কোথায়?

সাগর হেসে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে,— আমার বরের সাথে তোর কি দরকার রে?

কুসুম উত্তর দেয়,— বা-রে, আমার মাকে দেখে এলো, ওষুধ দিলো, একটা পয়সাও নিল না।

আকাশ কুসুমের পিছনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসে।

সাগর হাত নাড়িয়ে বলে,— তো?

— তাই তোমার বরের জন্য বকুল ফুল এনেছি। খুব সুন্দর গন্ধ। এই দ্যাখো,— চোখ বড় বড় করে বলে কুসুম।

কুসুম ফুল সমেত হাতটা বাড়িয়ে দেয় সাগরের দিকে। সাগর মাথা নীচু করে ফুলের গন্ধ নিয়ে বলে,— বাঃ খুব সুন্দর গন্ধ তো।

খুশী খুশী মুখ করে কুসুম সাগরকে বলে,— তোমার বরটা কি সুন্দর দেখতে গো।

সাগর কুসুমের গালটা টিপে দিয়ে বলে,— তোমাকে আর পাকামো করতে হবে না, পাকা বুড়ী

কোথাকার।
কুসুম এবার অনুরোধের সুরে সাগরকে বলে,— তোমার বরটাকে ডাকো নাগো।
সাগর আকাশের দিকে তাকালে, আকাশ মুখে আঙুল ঠেকিয়ে ইশারায় চুপ করতে বলে।
সাগর কুসুমকে মুখ ভেঙিয়ে বলে,— কেন গো? ফুল গুলো আমায় দাও নাগো?
সাগর ফুল নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালে, কুসুম রেগে গিয়ে হাত সরিয়ে নেয়। বলে,— তোমায় কেন দেব? তুমি কি আমার মাকে ওষুধ দিয়েছ? আমি তোমার বরকেই ফুল গুলো দেব।
সাগর চোখ বড় বড় করে কুসুমের নাকটা দু আঙুলে ধরে বলে,— ওরে মেয়ে! তা আমার বরটাকে তুই পেলি কোথা থেকে শুনি?
— সে যেখান থেকেই পাই। — ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর দেয় কুসুম।
আকাশ এবার কুসুমের সামনে এসে দুহাত বাড়িয়ে কুসুমকে বলে,— আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকেই দাও।
লজ্জা পেয়ে কুসুম বলে,— এ-মা!
কথাটা বলে সাগরের দিকে রাগ করা চোখ নিয়ে তাকিয়ে বলে,— মিথ্যুক কোথাকার।
সাগব হাসতে হাসতে আবার ঝাঁট দিতে শুরু করে।
কুসুম ফুল গুলো আকাশের হাতে ঢেলে দেয়।
আকাশ হাত উঁচু করে ফুলের গন্ধ নিয়ে বলে,— ভারী সুন্দর গন্ধতো।
কুসুম খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা করে,— তোমার ভালো লেগেছে?
— খুউব।
কুসুম ঘাড় কাত করে বলে,— আমি তোমাকে রোজ এসে ফুল দিয়ে যাব কেমন?
— কিন্তু আমিতো আজকে চলে যাব, — কথাটা বলে আকাশ তাকিয়ে থাকে কুসুমের দিকে।
মুখটা হতাশায় ভরে যায় কুসুমের, নীচু গলায় আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে,— তুমি চলে যাবে?
আকাশ মাথা নাড়িয়ে বলে,— হ্যাঁ।
একটু চিন্তা করে কুসুম জিজ্ঞাসা করে,— কিন্তু, এইতো সবে এলে?
— কি করব বলো, যাদের কাছে কাজ করি তারা আমাকে একদিনের জন্য ছুটি দিয়েছে। — আপসোসের সুরে বলে আকাশ।
বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে কুসুম বলে,— ও........

সাগরের ঝাঁট দেওয়া হয়ে যায়। ঝাঁটাটা দালানে রেখে কুসুমের সামনে এসে দাঁড়ায়।

একটু চিন্তা করে কুসুম আকাশকে বলে,— জানোতো, আমাদের গ্রামে না একটাও ডাক্তার নেই। পাশের গ্রামে গাঙ্গুলী ডাক্তার আছে। ওকে আগে পয়সা না দিলে আসে না।
আকাশ কুসুমের দিকে তাকিয়ে কুসুমের কথা শোনে। একটু হেসে কুসুম আবার বলে,— সেবার যখন বাতের বেলায় আমার বাবার শরীর খারাপ করলো, গাঙ্গুলী ডাক্তার বললো আগে পয়সা না দিলে যাবো না। মা পয়সা দিতে পারলো না, ডাক্তারও এলো না, আমার বাবাটা সারারাত কষ্ট পেয়ে পেয়ে মরে গেল।
কুসুমের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। সাগর কুসুমকে কাছে টেনে নিয়ে শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। কুসুম আকাশের হাতটা ধরে বলে,— তুমি যেও না গো। আমার মায়ের অসুখ করলে কে ওষুধ দেবে বলো? আমি তোমাকে রোজ আরও ফুল এনে দেব। গন্ধরাজ ফুল, বেল ফুল, জুঁই ফুল — অনেক ফুল এনে দেব। সত্যি

বলছি, শিব ঠাকুরের দিব্যি।
আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে কুসুমের কপালের চুল গুলো ঠিক করে দেয়।
কুসুম আবার জিজ্ঞাসা করে আকাশকে,— বলো না গো যাবে নাতো?
— আচ্ছা যাবে না। তুই এখন যা। — সাগর কুসুমকে বলে।
আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কুসুমের মুখ।
— 'আচ্ছা', বলে তাড়াতাড়ি করে চলে যায় কুসুম।

(২৭)

সাগর ভিতরের ঘরে ঢুকে দেখতে পায় শ্বশুরমশাই খাটে চুপচাপ শুয়ে আছে। মেঘ সরে গিয়ে সূর্যদেব উঁকি মারার দরুন জানালা দিয়ে দুপুরের কড়া রোদ্দুর এসে পড়েছে বৃদ্ধের বিছানায়। সাগর তাড়াতাড়ি গিয়ে জানালার একটা পাল্লা বন্ধ করে দিয়ে শ্বশুরমশাইয়ের পাশে বসে।

অন্ধ বৃদ্ধ তার অনুভূতির সাহায্যে কারুর উপস্থিতি অনুভব করে জিজ্ঞাসা করে,— কে?
স্নেহ মাখানো গলায় সাগর উত্তর দেয়,— আমি বাবা।
একমাত্র সন্তানেব চিন্তায় উদ্বিগ্ন বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে,— খোকা কেন আসছে না মা? তবে কি সেই কথাই সত্যি হোল?
— না না বাবা, গতকাল তোমাকে যে তোমার ছেলের চিঠি পড়ে শোনালাম। — আশ্বাস দেওয়ার সুরে বৃদ্ধকে বলে সাগর।
বৃদ্ধের গতকাল রাতের কথা মনে নেই। তাই আবার জিজ্ঞাসা করে,— চিঠি এসেছে? কি লিখেছে মা?
মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সাগব বলে,— লিখেছে ছুটি পেয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যেই আসছে।
সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে,— অতদূর থেকে আসবে, সময়তো লাগবে বাবা।
সাগরের আশ্বাসে, শান্তনায় বৃদ্ধের মন মানে না। সন্দেহ প্রকাশ করে বলে,— এ কেমন চাকরী মা? এতদিন হয়ে গেল —
কথা শেষ না করে চুপ করে যায় বৃদ্ধ বাবা, তারপর আবার বলে,— খোকা আমার আসবে তো? নাকি তুমি আমায় বলছ না?
— না না বাবা তুমি কিছু চিন্তা কোর না। দু-একদিনের মধ্যেই এসে যাবে। লিখেছে এবার আর যাবে না। কলকাতাতেই নাকি কোন এক কোম্পানীর সাথে কথা হয়েছে। ওখানেই চাকরী করবে। সপ্তাহে একবার করে বাড়ি আসতে পারবে তাহলে। — জোর দিয়ে কথাগুলো বলে শ্বশুরে মশাইয়ের বিশ্বাস বাড়ানোর চেষ্টা করে সাগর।
বৃদ্ধ এবার যেন আশ্বাস পায় সাগরের কথায়। খুশী হয়ে বলে,— সেই ভালো। আমিও শরীরটা ভালো বুঝছি না। যেন ওপরের ডাক শুনতে পাচ্ছি বলে মনে হয়।
আপসোসের সুরে বলে,— যাওয়ার আগে অন্তত যদি একবার খোকাকে —
কথা শেষ করতে না দিয়ে সাগর তাড়াতাড়ি করে বলে,— তুমি ওসব ভেবো না তো। তোমার কিছু হয়নি কাল ডাক্তারবাবু তোমাকে দেখে গেছেন। বলেছেন তুমি দু-একদিনের মধ্যেই সেরে যাবে। আজ আবার দেখতে আসবেন।
শ্বশুরের চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কথাগুলো বলে সাগর।
বৃদ্ধ অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়ে বলে,— না মা, আমি আর সারব না। আমি বেশ বুঝতে

পারাছ আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। শুধু তোমার জন্য চিন্তা হয় মা।
চিন্তিত মুখে সাগর শ্বশুরমশাইকে বাধা দিয়ে বলে,— তুমি এতো কথা কেন বলছ বাবা, তোমার আবার শরীর খারাপ করবে।

আকাশ স্টেথো হাতে ভিতরের ঘরে ঢুকতে গিয়ে সাগর আর বৃদ্ধের কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবে,— 'ঘরের ভিতরে ঢোকাটা উচিৎ হবে কিনা।'

সাগরের কথা শোনে না বৃদ্ধ। সামান্য উত্তেজিত হয়ে বলে,— আমায় বলতে দাও মা, একটু হাল্কা হই। আজ ক'দিন ধরেই তোমার কথাই ভাবছি শুধু। এই অপরিচিত অন্ধ মানুষটার জন্য তুমি যা করলে, সে কথা বলে তোমাকে ছোট করব না। আজ শুধু এইটুকুই বলব যে তোমার তুলনা শুধু তুমি নিজেই।

আকাশ চিন্তান্বিত মুখে দরজায় একবার হাত দিয়ে আবার সরিয়ে নেয়।

একজন অতি দায়িত্বশীল মেয়ের মতো মমতা মেশানো গলায় সাগর বলে,— তুমি কেন এসব ভাবছো বলোতো বাবা। মেয়ে তার বাবার জন্য করবে না? আমি তো তোমায় বাবা ডেকেছি, তুমিই তো আমার বাবা।
দুচোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে বৃদ্ধের। ধরা গলায় বলে,— হ্যাঁ মা, আমি অনেক জন্মের পুণ্যের ফলে তোমার মতো মেয়ে পেয়েছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সামনের জন্মে সত্যি সত্যি যেন তুমি আমার মেয়ে হও।
সাগর শাড়ীর আঁচল দিয়ে শ্বশুরের মশাইয়ের চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে মাতৃসুলভ গলায় বলে,— আচ্ছা ঠিক আছে, এবার একটু চুপ করে শোও তো। আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, তুমি ঘুমোনোর চেষ্টা করো। না হলে এবার তোমাকে বকব আমি।

আকাশ আস্তে করে দরজার একটা পাল্লা খুলে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে সাগরের পিছনে এসে দাঁড়ায়। সাগর বুঝতে পারে না।

বৃদ্ধ কিছু একটা বলতে না পারার জন্য অস্বস্তি বোধ করে। নিজের মনেই মাথা নাড়ায়। সাগর সেটা লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করে,— কোথায় কষ্ট হচ্ছে তোমার বাবা?
— মনে, মা মনে। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। ঘুম আমার আসবে না। একটা যন্ত্রনা আজ ক'দিন ধরে আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি ওপারে গিয়েও শান্তি পাবো না। -- বলতে বলতে কাশতে থাকে বৃদ্ধ।
সাগর শ্বশুর মশাইয়ের বুকে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করে,— কিসের যন্ত্রনা বাবা? আমায় বলো তুমি।

বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে সাগরের হাতটা ধরে বলে,— আমি শুধু তোমার থেকে নিয়েই গেলাম। কিছুই করে যেতে পারলাম না তোমার জন্য। আমার খোকাও তো চেনেনা তোমাকে। যাওয়ার আগে ওকেও যদি বলে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার সময়তো বড়ো কম। তোমার কি হবে মা?

কথাগুলো শুনে আকাশ মনে মনে চম্‌কে উঠে পিছনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে। মনে মনে ভাবে,— এই মেয়েটি তাহলে কে?
খুব অস্বস্তি হয় আকাশের মনে। একবার ভাবে নিঃশব্দে চলে যাবে এঘর থেকে, আবার ভাবে

সাগর যদি টের পেয়ে যায়। হয়তো ভাববে ইচ্ছা করেই আকাশ নিজের উপস্থিতির কথা জানায় নি। কি করা উচিত বুঝে পায় না আকাশ। মনে মনে ভাবে,— 'এখন এঘরে না এলেই মনে হয় ভালো হত।'

সাগর শ্বশুর মশাইয়ের হাতটা সরিয়ে দুহাত দিয়ে শ্বশুর মশাইকে ধরে বোঝানোর ভঙ্গীমায় বলে,— তুমি কেন এসব চিন্তা করে কষ্ট পাচ্ছ বলতো? আমি বলছি তুমি ভালো হয়ে যাবে আর আমারও মধুসূদন আছে পাশে। সেই আমাকে দেখবে ভবিষ্যতে।
— হ্যাঁ মা, সত্যিই তোমার মধুসূদন তোমার পাশে আছে। সেই জন্যই তুমি অনন্যা।
কথাটা বলে বৃদ্ধ আবার সাগরের হাতটা ধরে বলে,— আমায় তুমি ক্ষমা কোরো মা। তুমি তোমার মধুসূদনকে বোল যেন আমায় ক্ষমা করে।
— তুমি যদি একরম করো তাহলে আমি তোমার সাথে কথা বলব না বলে দিচ্ছি। — আদর মেশানো হাল্কা ধমকানোর সুরে বলে সাগর।
বৃদ্ধ কথা না বলে চুপ করে শুয়ে থাকে। সাগর আস্তে আস্তে বুকে হাত বুলিয়ে দেয়।

আকাশ নিজের উপস্থিতি বোঝানোর জন্য গলা দিয়ে আওয়াজ করাতে সাগর চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে আকাশকে দেখতে পায় পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে। আকাশের সাথে চোখাচোখি হতে সাগর বলে,— আসুন।
কথাটা বলে সাগর শ্বশুর মশাইয়ের পায়ের কাছে সরে বসে বলে,— বাবা, ডাক্তারবাবু এসেছেন।
কোন সাড়া পাওয়া যায় না বৃদ্ধের।
আকাশ এগিয়ে এসে খাটে বসে বৃদ্ধের হাতটা টেনে নিয়ে পালস্ দেখতে থাকে।
কোন সাড়া না পেয়ে সাগর আবার ডাকে,— বাবা ডাক্তারবাবু এসেছেন।
পালস্ দেখা হয়ে গেলে হাত ছেড়ে দিয়ে স্টেথো দিয়ে বুক দেখতে দেখতে আকাশের মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে ওঠে।

কান থেকে স্টেথোটা খুলে নিয়ে আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে এসে বৃদ্ধর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সাগর খাট থেকে নেমে এসে আকাশের পাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় আকাশকে বলে,— কখনো হুঁশ থাকছে আবার কখনো একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছে।
— বাইরে আসুন। — সাগরের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে আকাশ পাশের ঘরে চলে যায়।

সাগর শ্বশুর মশাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে আকাশের পিছনে পিছনে পাশের ঘরে চলে যায়।

(২৮)

আকাশ এঘরে এসে স্টেথোটা বিছানার ওপর রেখে চিন্তিত মুখে বিছানায় বসে।

সাগর দরজাটা শব্দ না করে আস্তে করে বন্ধ করে আকাশের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করে,— কেমন দেখলেন?
চিন্তিত মুখে কোন কথা না বলে মাথা নাড়িয়ে ইঙ্গিতে 'না' জানায় আকাশ।

সাগর কিছুক্ষণ চুপ করে বাইরের দালানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে,— আপনি বিশ্রাম করুন।

কাল রাতে ঘুমোতে পারেননি ভালো করে। আজকে রাত্রেও ভালো ঘুম হবে না ট্রেনে।
— দুপুরে শোয়ার অভ্যাস নেই আমার। আমি বরং ঝিলের ধার থেকে ঘুরে আসি। — হেসে বলে আকাশ।
— এই ভর দুপুরে? এইতো সকালে একবার ঘুরে এলেন ঝিলের ধার থেকে। — অবাক হয়ে সাগর বলে।
— ঝিলটা খুব সুন্দর। মনটা যেন কোথায় হারিয়ে যায়। তাছাড়া গ্রামের বাড়িতে আমি দুপুরবেলা প্রায়দিনই ঘুমোতাম না। হয় পুকুর ধার, না হয় ঝিলের ধার অথবা নদীর ধার করে বেড়াতাম। মা আমায় কম বকতো এর জন্য! জানেন, দুপুরবেলা এইসব জায়গা গুলো কেমন যেন একটা হাতছানি দিতো আমায়। — আকাশ উত্তর দেয়।
হেসে চোখ বড় বড় করে সাগর বলে,— দুপুরবেলা দেশের ঘরে এসব জায়গায় কিন্তু ভূতের আড্ডা, সেটা যেন মনে থাকে।
আকাশ হেসে বলে,— ভালোই তো। ওরা একটা শহুরে সঙ্গী পাবে।
— কিন্তু যদি ওদের পছন্দ না হয় আপনাকে, বরং উল্টে রেগে যায়? — কৌতুক করে বলে সাগর।
আকাশ সাগরকে রাগানোর জন্য মজা করে উত্তর দেয়,— মধুসূদন বাঁচাবে তাহলে।
চোখ পাকিয়ে সাগর বলে,— আবার শুরু করেছেন?
আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে। তারপর হাসি থামিয়ে সাগরকে বলে,— তার চেয়ে বরং আপনিও আমার সাথে চলুন না। আমিও নির্জনে, নিভৃতে একটা সুন্দরী সঙ্গিনী পাবো আর ভূতেরা তো আপনাকে চেনে, ওরাও বুঝতে পারবে যে ওদের আপনার জনই এসেছে।
কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে সাগর বলে,— কি, আমি ভূত?
— বালাই ষাট। আপনি হলেন গিয়ে মধুসূদন বাবুর বান্ধবী, আপনি কখনো ভূত হতে পারেন? — হেসে বলে আকাশ।
একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করে আকাশ,— চলুন যাবেন?
— আপনি যান। আমি দেখি বাবা ঘুমিয়েছে কিনা, তারপর কয়েকটা কাজ সেরে আসছি। — সাগর উত্তর দেয়।
আকাশ সাগরের কাছে এসে এদিক ওদিক দেখে একটু নীচু গলায় বলে,— দেখবেন, ভর দুপুরে একা একজন সুন্দরী মহিলাকে পেয়ে ভূত গুলো আবার আপনাকেই না ধরে। ভূত গুলো খুব রসিক হয় কিনা।
হেসে হেসে সাগর বলে,— মধুসূদন বাঁচাবে।
— মধুসূদন পালাবে। — নাটকীয় ভাবে বলে আকাশ।
উদ্ধত ভঙ্গিমায় ঘাড় বেঁকিয়ে সাগর বলে,— দেখাই যাক্।
— আচ্ছা দেখুন। — যেতে যেতে কথা গুলো বলে বেড়িয়ে যায় আকাশ।
সাগর আকাশের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে ভিতরের ঘরে চলে যায়।

(২৯)

আকাশ এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হাঁটতে থাকে।

কিছুদূর গিয়ে বাঁদিকে তাকিয়ে ঝিলটা চোখে পড়ে আকাশের।

এগিয়ে গিয়ে সকালের জায়গাটাতে বসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। গাছের পাতায় সূর্য্যের আলো পড়ে চক্চক্ করছে সবুজ পাতা গুলো। আকাশ তাকিয়ে থাকে সেদিকে। কতো সজীব লাগছে ওদের। একটা কুব্ পাখী কুব্ কুব্ শব্দে বিরামহীন ডেকে চলেছে। একটা দাঁড় কাক কর্কশ স্বরে মাঝে মাঝে ডেকে উঠে ছন্দ পতন ঘটাচ্ছে। আকাশ এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকটাকে খোঁজার চেষ্টা করে। হঠাৎই একটু বড় আকারের পুরো কালো একটা কাক একইভাবে কর্কশ স্বরে 'কা-কা' করতে করতে ঝিলের ওপারে উড়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কুব্ পাখীটা আবার ডাকতে শুরু করে। জনমানবহীন দুপুরে ঝিলের ধারে কুব্ পাখীর ডাকটা খুব ভালো লাগছে আকাশের। অসময়ে দূর থেকে ভেসে আসে একটা মোরগের ডাক। আকাশ ঝিলের দিকে তাকায়। দুটো পানকৌড়ি জলে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ জলের তলায় ডুব দিয়ে আদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত বাদেই আবার জলের ওপর ভেসে উঠে এগিয়ে চলেছে জলের মধ্যে দিয়ে।

দূর থেকে দুটো চিলের ডাক ভেসে আসে। নিস্তব্ধ দুপুরে, সবুজ নির্জনতার মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে ভেসে আসা চিলের ডাকটা আকাশের খুব ভালো লাগে। আকাশ মুখ তুলে আশে পাশের নারকেল গাছ গুলোর দিকে তাকায়। চিল দুটো সমানে ডেকে চলেছে। আরো ওপরে, নীল-নীল-নীল আকাশের নীচে ভেসে যাওয়া সাদা তুলোর মতো মেঘেদের সাথে লুকোচুরি খেলতে থাকা হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেওয়া চিল গুলোকে চোখে পড়ে। আকাশ একমনে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ আকাশের কিছুক্ষণ আগে বৃদ্ধের বলা কথা গুলো মনে পড়ে। কানের কাছে কথা গুলোর যেন প্রতিধ্বনি হয়,— 'এই অপরিচিত অন্ধ মানুষটার জন্য তুমি যা করলে, সে কথা বলে তোমাকে ছোট করব না আজ। শুধু এইটুকুই বলব, যে, তোমার তুলনা তুমি নিজেই।'
আকাশ নিজের মনে মনেই উচ্চারণ করে,— 'অপরিচিত?'
পরক্ষণেই বৃদ্ধের আরো একটা কথা মনে পড়ে আকাশের। চোখের সামনে বৃদ্ধর মুখটা ভেসে ওঠে। যেন বলছে,— 'আমার খোকাওতো তোমাকে চেনে না। যাওয়ার আগে ওকেও যদি বলে যেতে পারতাম। কিন্তু সময়যে বড় কম। তোমার কি হবে মা?'
আকাশ মনে মনে ভাবতে থাকে তাহলে বৃদ্ধর সাথে মহিলার আসল সম্পর্কটা কি? এতো ত্রুটিহীন আন্তরিক সেবাতো একমাত্র কোন মানুষ তার প্রিয়জনকেই করে। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে আকাশ,— 'তাহলে?'
আকাশের মনে একটা দ্বন্দের সৃষ্টি হয়।

হঠাৎ আকাশের মধ্যেই কে যেন আকাশকে বলে,—'তুমিতো সম্পূর্ণ অপরিচিত এই মহিলার কাছে। তোমাকে না চিনে, না জেনে গতকাল রাত্রে সম্পূর্ণ নিস্বার্থে আশ্রয় দিয়েছিল এই মেয়েটি। তারপর থেকে এখনো অবধি তোমার যত্নের কোন ত্রুটি হয়েছে কি?'
চিন্তা গুলো কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায় আকাশের। বিরক্ত হয়ে আকাশ নিজের মনে বলে,— 'ধুর, আমার কি দরকার জানার। বিকেলে তো চলেই যাচ্ছি এখান থেকে, আর দেখাও হবে না কোনদিন।'
সাগরের মুখটা আকাশের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আকাশের দিকে তাকিয়ে হসেছে।
মনে মনে বলে আকাশ,— 'মেয়েটার অদ্ভুত একটা টান আছে কিন্তু, নিজের মতো করে নেওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। এটা সবার মধ্যে থাকে না, খুবই বিরল গুণ একটা। এই কয়েক

ঘণ্টার মধ্যে কেমন যেন বন্ধুর মতো মিশে গেছে। আমাকেও আপন করে কাছে টেনে নিয়েছে। যেন কতদিনের পরিচয়।'
এক মনে চিন্তা করে যায় আকাশ।

অনেক্ষণ কেটে যায়। আকাশ অন্যমনস্ক ভাবেই পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরায়। পরপর তিনবার 'কেঁয়া-কেঁয়া-কেঁয়া' একটা ডাক শুনে আকাশ এদিক ওদিক তাকিয়ে পাখীটাকে খোঁজার চেষ্টা করে।

হঠাৎ জলের মধ্যে ঝুপ করে একটা আওয়াজ হয়। আকাশ তাকিয়ে দেখে ঝিলের জলের একটা জায়গায় গোলাকার একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। আকাশ পায়ের কাছ থেকে একটা ঢিল্ তুলে ঝিলের জলে ছোঁড়ে। জলে আবার একটা গোলাকার তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার একটা ঢিল তুলে ছুঁড়তে যেতেই পাশ থেকে সাগরের গলা পাওয়া যায়,— ছেলে মানুষী এখনো গেল না!
ঘাড় ঘুরিয়ে আকাশ একটু দূরে সাগরকে এগিয়ে আসতে দেখে। দুজনের মধ্যে চোখাচোখি হওয়াতে দুজনেই হাসে।

সাগর এগিয়ে এসে আকাশের পাশে বসে। আকাশ হাতে ধরা ঢিল্টা ঝিলের জলে ছুঁড়ে ফেলে সাগরকে বলে,— জানেন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা শিশু ঘুমিয়ে আছে। সুযোগ পেলেই মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। আমরা কেউ কেউ দাবিয়ে রাখি, কেউ কেউ কখনো প্রকাশ করে ফেলি।
— সে তো দেখতেই পাচ্ছি। — হেসে বলে সাগর।
ঝিলের দিকে তাকিয়ে আকাশ বলে,— এই জায়গাটা কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করা। তবে আমার খুব ভালো লেগেছে। মনে হয় সারাদিন এখানে বসে থাকি।
— জানেন, এই ঝিলটার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। — ঝিলের দিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলে সাগর।
আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,— তাই নাকি! কিরকম?
কয়েক মুহূর্ত ঝিলের দিকে তাকিয়ে থেকে সাগর বলতে শুরু করে,— শোনা যায়, বহু দিন আগে এই গ্রামেরই জমিদার সূর্য্যকান্ত রায় একজন উশৃঙ্খল, অহংকারী, চরিত্রহীন মানুষ ছিলেন। জলসাঘরে বাইজীদের সাথেই তার সারাটা দিন কেটে যেত। নিজের স্ত্রীর কোন খবরই রাখতেন না তিনি। জমিদার বাবুর স্ত্রী বিমলা সুন্দরী, সবরকম চেষ্টা করেও স্বামীকে নিজের করে কাছে টেনে রাখতে পারেন নি। স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন তিনি। স্বামীকে নিজের কাছে আটকে রাখার জন্য মদ খাওয়াও ধরে ছিলেন। কিন্তু কোন লাভ হোল না। একদিন গভীর রাতে তিনি এই ঝিলের জলেই তার সমস্ত বুক ভরা যন্ত্রণার বিসর্জন দেন।
আকাশ তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে। সাগর বলে চলে,— জমিদার বাবু তার কর্মের অনুশোচনায় ও স্ত্রীর শোকে উন্মাদ হয়ে যান। প্রায় সময় দেখা যেত ওনাকে এই ঝিলের ধারে কি যেন খুঁজে বেড়াতে। আর শোনা যেত গভীর রাতে স্ত্রীর নাম ধরে চীৎকার করে ডেকে কাঁদতে। কিছুদিন পর একদিন সকালে এই ঝিলের জলেই জমিদার বাবুর লাশ ভাসতে দেখা গেল। সেই থেকে এই ঝিলের নাম হোল বৌ ঠাকুরাণীর ঝিল। তারপর থেকে আরও কয়েকজন তাদের সমস্ত যন্ত্রণার বিসর্জন এই ঝিলের জলেই দিয়েছেন। জমিদার বাবু ছাড়া সবাই

মেয়ে।

সাগর চুপ করে ঝিলের দিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশ নিজের মনেই আস্তে আস্তে বলে,— 'বৌঠাকুরাণীর ঝিল। খুব সুন্দর নামতো। কেমন যেন একটা মায়া জড়িয়ে রয়েছে নামটার মধ্যে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঝিলের দিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক ভাবে কেটে কেটে কথা গুলো সাগর আকাশকে বলে,— এই ঝিলের জল এতো কালো কেন জানেন?

— কেন?

অন্যমনস্ক ভাবে অদ্ভুত একটা করুন স্বরে সাগর বলে,— বলা হয়, কাজল ধোয়া বেদনার অশ্রু মিশে রয়েছে এই ঝিলের জলে।

আকাশ তাকিয়ে থাকে ঝিলের জলের দিকে।

আবার চুপ করে যায় সাগর। তারপর আবার বলে,— কি জানি, একদিন হয়তো আমাকেও — কথা শেষ না করে সাগর তাকিয়ে থাকে ঝিলের জলের দিকে। আকাশ সাগরের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

সাগরের হঠাৎ খেয়াল হয়। আকাশের দিকে তাকালে চোখাচোখি হয় আকাশের সাথে। একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সাগর। তাড়াতাড়ি করে আকাশকে বলে,— চলুন উঠবেন তো? বাবাকে একা রেখে এসেছি।

আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— আপনি এগোন, আমি একটু পরে আসছি। ঝিলটাকে তো দেখলাম, ইতিহাসটাও কানে শুনলাম, এবার হৃদয় দিয়ে অনুভব করি ভালো করে। উঠতে উঠতে আকাশের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে সাগর,— অল্প করে করবেন কিন্তু।

আকাশ তাকিয়ে হাসে। সাগর চলে যায়। আকাশ সাগরের যাওয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার ঝিলের দিকে তাকিয়ে হেলান দিয়ে বসে। আকাশ চুপ করে বসে থাকে। মনে মনে ভাবে, — 'মানুষ মানুষের ভালোবাসার প্রতি এত অবিচার করে কেন? এতো নিষ্ঠুর কেন হয় মানুষ?'

কখন যে আকাশের মনটা কলকাতার হোস্টেলে পৌঁছে গেছে, আকাশ বুঝতে পারে না। হোস্টেলের যে ঘরে আকাশ থাকতো সেই ঘরটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

(৩০)

একটা ঘরে দুদিকে দুটো খাট পাতা আছে। এদিকে দরজার পাশে একটা বড় টেবিলে বেশ কিছু বই আর কাগজ পত্র রাখা রয়েছে। মাথার ওপর সিলিং ফ্যানটা ক্যাচ্ ক্যাচ্ শব্দে ঘুরছে।

খাটের ওপর আধশোয়া হয়ে এ্যানাটমির বইটা বুকের ওপর উল্টো করে রেখে চোখ বুজে মানুষের শরীরে কিড্‌নির গঠন কাঠামোটা মনে মনে চিন্তা করছে অনিমেষ।

আকাশ ক্লান্ত ভাবে সুটকেশ হাতে ঘরে ঢুকে অনিমেশকে একবার দেখে নিয়ে, সুটকেশটা টেবিলের পাশে রেখে খাটে গিয়ে বসে। অনিমেষ চোখ খুলে আকাশকে দেখতে পেয়ে বুকে রাখা বইটা বন্ধ করে পাশে রেখে আকাশকে জিজ্ঞাসা করে,— এতো রাত হোল?

জামার ওপরের বোতামটা খলতে খুলতে ক্লান্ত ভাবে আকাশ উত্তর দেয়,— ট্রেন লেট্, রাস্তায়

জ্যাম।
একটু থেমে অনিমেষকে আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— তুই ঘুমোসনি?
— না তোর জন্য জেগে আছি। কাল সকালে তোর সাথে তো ভালো করে কথা হবে না। — আকাশের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয় অনিমেষ।
আকাশ বিছানায় বসে জামা খুলতে থাকে। অনিমেষ আকাশকে বলে,— তোর একটা চিঠি এসেছে, টেবিলে রাখা রয়েছে।
— আমার চিঠি? — অবাক হয়ে আকাশ জিজ্ঞাসা করে।
জামাটা হাতে নিয়ে উঠতে উঠতে আবার জিজ্ঞাসা করে,— কখন এসেছে?
— আজ দুপুরে। — অনিমেষ উত্তর দেয়।
আকাশ এগিয়ে গিয়ে জামাটা টেবিলের পাশে দেওয়ালের হুকে ঝুলিয়ে টেবিল থেকে চিঠিটা তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে।
অনিমেষ জিজ্ঞাসা করে,— কাল তোর ফ্লাইট কটায়?
খামের একটা পাশ ছিঁড়তে ছিঁড়তে আকাশ জবাব দেয়,— দশটা কুড়িতে।
আকাশ খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে নীচের নামটা দেখে বুঝতে পারে সুলেখা লিখেছে। চিঠির ওপর আলতো করে একটা চুমু দিয়ে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে,— মনে হচ্ছে যেন কতদিন দেখা হয়নি সুলেখার সাথে।
— সেই তিন তারিখ বাড়ি গিয়েছিলি, আর আজ তেরো তারিখ, দশ দিন তো হয়েই গেল। — অনিমেষ কথাটা বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।
আকাশ কথার জবাব না দিয়ে চিঠিটা পড়তে থাকে।

প্রিয় আকাশ,

আগামী সাতাশে আগষ্ট অঞ্জনের সাথে আমার বিয়ে। বাবা মায়ের অমতে যেতে পারলাম না। তাছাড়া অঞ্জন আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। আমাকে না পেলে হয়তো কিছু একটা করে বসবে। তাই ওর ভালোবাসা প্রত্যাখ্যাণ করতে পারলাম না। যদিও তখন তুমি বিদেশে থাকবে, তবুও তোমাকে জানানোটা কর্তব্য বলে মনে করি।

আশা করি আমাকে বোঝার চেষ্টা করবে এবং আমায় ক্ষমা করবে।

আমাকে ভুলে যেও।

— ইতি

সুলেখা

চিঠি পড়া হয়ে যায় আকাশের। চিঠির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চিঠিটা হাতে নিয়ে নিজের খাটে গিয়ে উপুর হয়ে ওপাশে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ে। অনিমেষের উদ্দেশ্যে বলে,— তোর হয়ে গিয়ে থাকলে আলোটা নিভিয়ে দে।
কিছু একটা দুঃসংবাদ আঁচ করে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করে,— তুই খাবি না?
আকাশ ওপাশ ফিরেই উত্তর দেয়,— খিদে নেই।
অনিমেষ একটু নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করে,— কোন খারাপ খবর?

— এমাসের সাতাশ তারিখে সুলেখার বিয়ে। — আকাশের নিষ্প্রাণ উত্তর।
অনিমেষ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর খাট থেকে নেমে ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আকাশের খাটে বসে আকাশের পিঠে আলতো করে হাতটা রাখে। আকাশ অন্ধকারে ওপাশ ফিরেই অনিমেষকে ধরা গলায় প্রশ্ন করে,— ভালোবাসা কথাটার মানেটা একবার বুঝিয়ে বলতে পারিস আমাকে?
অনিমেষ কোন উত্তর না দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।
মাথার ওপর সিলিং ফ্যানের বিশ্রী বিরক্তিকর শব্দটা আরো অসহ্য ও দুঃসহ হয়ে আকাশকে পরিহাস করে ঘুরতে থাকে।

(৩১)

কুব্ পাখীটা একনাগাড়ে ডেকেই চলেছে। একমনে ঝিলের জলের দিকে তাকিয়ে আকাশ মনে মনে ভাবে,— 'সুলেখাদের পাশাপাশি সাগরেরাও তো আছে এসমাজে, অথচ কত তফাৎ এদের মধ্যে। একজন আত্ম প্রতিষ্ঠা কামিনী সুখ সাগরে ভেসে যাওয়ার নেশায় মনগড়া অলীক স্বপ্নের জগতের খোঁজে বোকার মতো ছুটে চলেছে, আর একজন কত সহজ, সরল, শিশুকে অথচ বুদ্ধিমতী সবাইকে আপন করে নিয়ে এখানেই স্বপ্নের পৃথিবী তৈরী করার চেষ্টা করছে।'

আকাশের হঠাৎ খেয়াল হয় সন্ধ্যের আগে বেরিয়ে যেতে হবে। আকাশ তাড়াতাড়ি করে হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে উঠে পড়ে হাঁটতে থাকে ফেরার জন্য। মনে মনে বলে,— 'অনেক সময় আছে তাড়াহুড়োর কিছু নেই।'

কিছুদূর অন্তর অন্তর লাল আবরনে সজ্জিত হয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছ গুলো মাথা তুলে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আছে অন্যান্য গাছ গুলোর মাঝে। তুলনায় ছোট হলুদ হয়ে থাকা সোঁদাল গাছ গুলো যেন নতুন বৌ লজ্জায় মাথা নীচু করে মিটি মিটি হাসছে। যতদূর চোখ যায় মাঝে মধ্যেই চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা থোকা থোকা বেগুনী রঙের জারুল ফুলের ঝাড়গুলো নানা রঙের মাঝে নয়নাভিরাম পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। সত্যিই নয়নাভিরাম।

— 'কিন্তু জায়গাটা কেমন যেন ঘন জঙ্গলের মতো। চোর ডাকাতের লুকিয়ে থাকার আদর্শ জায়গা। শত চীৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না। এদিকটায় বোধহয় কেউ সচরাচর আসে না।' — কথা গুলো নিজের মনে মনে বলতে বলতে হাঁটতে থাকে আকাশ।

হঠাৎ দূর থেকে একটা কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসে আকাশের কানে। মনে মনে ভাবে আকাশ,— 'এই সময় এই ভুতুরে জায়গায় কারা কথা বলছে?'
আকাশ দাঁড়িয়ে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করে আওয়াজটা কোন দিক থেকে আসছে।

আকাশের মনে হয় আওয়াজটা ডান দিক থেকে আসছে। আকাশ নিজের মনেই বলে,— 'ওদিকটাতো আরো বেশী জঙ্গল কিন্তু তাড়াতাড়ি পৌছনো যায়।'
হঠাৎ আকাশের মনে হয়,— 'শ্বশুর মশাইকে একা রেখে এসেছে বলে তাড়াতাড়ি পৌছনোর জন্য সাগর এই রাস্তা দিয়ে যায় নিত্যো!'
আকাশ তাড়াতাড়ি ছোট ছোট ঝোপ ঝাড়, গাছের পাতা সরিয়ে আওয়াজ লক্ষ্য করে এগোতে থাকে। কিছু দেখতে না পেয়ে আকাশ আরো কিছুটা এগিয়ে যায়। গ্রামে বড় হওয়া আকাশের

অভিজ্ঞতা বলে এসব জায়গা জাত সাপের আড্ডা। আকাশ ভালো করে দেখতে দেখতে সন্তর্পনে এগোতে থাকে ছোট ছোট গাছ গুলোর পাতা সরিয়ে।

হঠাৎ আকাশ দেখতে পায় দূরে সাগর দাঁড়িয়ে। সামনে একটা লোক। লোকটা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। কথাবার্তা কিছু শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে অল্প আওয়াজ আসছে। তবে সাগর কিছু একটা বলতে বলতে আস্তে আস্তে পিছোচ্ছে আর লোকটা একটু একটু করে এগোচ্ছে সাগরের দিকে।

আকাশের কেমন যেন মনে হয় সাগর বিপদে পড়েছে। আকাশ তাড়াতাড়ি এগোনোর চেষ্টা করে, কিন্তু ছোট ছোট ঝোপঝার গুলো আকাশের এগোনোয় বাধার সৃষ্টি করে।

(৩২)

সাগর ভীত সন্ত্রস্থ মুখে পিছোতে পিছোতে বলে,— খবরদার মুকুন্দ, তুমি আর এক পাও এগোবে না বলছি।

মুকুন্দ হায়নার চোখের লোভী চাউনি আর মুখে ক্রুর হাসি হেসে বলে,— তোমাকে যে বললাম একটু আগে, অনেক কষ্টে তোমার খোঁজ পেয়েছি।

এগোতে এগোতে বলে,— পদ্মতো আর নেই, তোমাকে পদ্মর জায়গায় বসাবো গো।

একটু হেসে আবার বলে,— সেবার খুব ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিলে। আজ আর পার পাবে না। পিছোতে পিছোতে গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঠেকে যায় সাগরের। চমকে উঠে সাগর বলে,— ভালো হবে না বলছি। তুমি চলে যাও।

মুকুন্দ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে,— আর কতো পিছোবে। বিরাট জঙ্গল এটা। আজ আর পালাতে পারবে না।

একটু থেমে বলে,— পরশু রাতে পুলিশের তাড়া খেয়ে নদী পেরিয়ে এসে এই জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলাম। কাল সকালে দূর থেকে নদীর ঘাটে তোমাকে দেখে আমি তো অবাক। এ যে মেঘ না চাইতেই জল গো। তোমার পিছন পিছন গিয়ে তোমার বাড়ি দেখে এসেছি। কাল রাতেই তোমার বাড়ি যাবো ভেবেছিলাম কিন্তু ফিরে যেতে হোল আবার। টাকার ভাগটা তো নিতে হবে। কিন্তু তোমায় ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিলো না, এই তোমার রূপের দিব্যি দিয়ে বলছি। একটু আগে তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম। তুমি নেই দেখে ফিরে আসছিলাম হঠাৎ তোমায় পেয়ে গেলাম। আমি সব খবর পেয়ে গেছি। খুড়োটাতো ভুগছে, এবার মরবে বোধহয়। তা তোমায় কে দেখবে? স্বামীটাতো আর এলো না। দেখো গিয়ে কাকে নিয়ে ঘর করছে তোমায় ছেড়ে। রূপ যৌবন নষ্ট করবে কেন? আমার তোমার জন্য বড়ো কষ্ট হয়।

একটানা কথা গুলো বলে মুকুন্দ আবার এগোতে থাকে সাগরের দিকে।

— আমার স্বামী এখানেই আছে। আমি চেঁচিয়ে ডাকব কিন্তু। — বেশ জোরেই কথা গুলো বলে সাগর।

বিশ্রী ভাবে অঙ্গভঙ্গি করে হাসতে হাসতে মুকুন্দ বলে,— স্বামী! সে তো কবে থেকেই ছেনালী পনা দেখছি। স্বামীতো আর আসে না। একবার ডেকেই দেখো না এবার যদি আসে।

এতো বড়ো বিপদের মাঝেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে বুদ্ধিমত্তার সাথে সাগর চীৎকার করে ডাকে,— শুনছ — কি বলছি —

গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে সাগর।

মুকুন্দ সাগরের কাছে এসে বলে,— যদি আমার থেকে বাঁচতে চাও, তবে এখন আমায় একবার সন্তুষ্ট করো। কেউ নেই এখানে, কেউ জানতে পারবে না। আমি চলে যাবো, আর আসব না। বিশ্রী ভাবে হাসতে হাসতে বলে,— এই তোমার সতীপনার দিব্যি দিয়ে বলছি।

কথাটা বলতে বলতে মুকুন্দ সাগরের গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করে। সাগর সজোড়ে মুকুন্দকে একটা চড় মারে। চড় খেয়ে দ্বিগুণ আক্রোশে সাগরকে জড়িয়ে ধরে বলে,— আজ তোর কি হাল করি দেখ হারামজাদী।

ভয়ে কেঁদে ফেলে সাগর নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে আবার আরোও জোরে চীৎকার করে ডাকে,— শুনছ্ — বাঁচাও আমাকে —

মুকুন্দর পিছনের একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে আকাশ বলে,— আমি এখানেই আছি।

আকাশের গলা পেয়ে চম্‌কে উঠে মুকুন্দ সাগরকে ছেড়ে দিয়ে পিছনে ঘুরে আকাশকে দেখতে পেয়ে তাকিয়ে থাকে।

আকাশ এগিয়ে গিয়ে মুকুন্দর সামনে দাঁড়ায়। মুকুন্দ আকাশকে পা থেকে মাথা অবধি দেখতে দেখতে সাগরকে জিজ্ঞাসা করে,— নতুন মনে হচ্ছে? এ কে রে?

— আমার স্বামী। — সাগর বেশ জোরের সাথেই উত্তর দেয়।

মুকুন্দ সাগরের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করে,— বিয়ে করা, নাকি রাতের স্বামী? তাহলে আমি আর কি দোষ করলাম?

আকাশ সজোড়ে একটা ঘুঁষি মারে মুকুন্দকে। ঘুঁষির আঘাতে মাটিতে পড়ে গিয়ে পাশে পড়ে থাকা একটা ইঁট তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আকাশকে ছুঁড়ে মারার জন্য হাত তোলে। সাগর সাথে সাথে আকাশের সামনে এসে আকাশকে শরীর দিয়ে আড়াল করে মুকুন্দর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে,— চলে যাও বলছি না হলে চেঁচিয়ে লোক ডাকব।

আকাশের মাথায় জেদ চেপে যায়। সাগরকে দুহাতে ধরে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যায় মুকুন্দর দিকে।

— উঁ — কতো সোহাগ — কথাটা বলে মুকুন্দ আচ্‌মকা ইঁটটা ছুঁড়ে মারে আকাশকে লক্ষ্য করে।

আকাশ দ্রুত মাথাটা সরিয়ে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে মুকুন্দর গলাটা চেপে ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে একটা গাছে চেপে ধরে হাঁটু দিয়ে জোরে একটা ধাক্কা মারে। মুকুন্দর চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসার মতো হয়ে গিয়ে জিভ বেরিয়ে আসে। নিজেকে বাঁচানোর জন্য ছট্‌ফট্ করতে থাকে মুকুন্দ। রাগের বশে সেদিকে হুঁশ থাকে না আকাশের, বাঁহাত দিয়ে মারতে থাকে মুকুন্দকে।

সাগর মুকুন্দর পরিণতি বুঝতে পেরে দৌড়ে গিয়ে আকাশকে জাপটে ধরে সরানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আকাশ ওই ভাবেই ধরে থাকে মুকুন্দকে। মুখ থেকে গোঙানীর আওয়াজ বেরোতে থাকলে সাগর আকাশের হাত দুটো টেনে সরানোর চেষ্টা করতে থাকে। আকাশের হাত টেনে সরাতে না পেরে সাগর আকাশকে ধরে নাড়াতে নাড়াতে বলতে থাকে,— ওকে ছেড়ে দাও, আমার কথা শোন, ওকে ছেড়ে দাও নাহলে মরে যাবে ও।

সাগরের কথায় আকাশের সম্বিত ফিরে আসে। মুকুন্দকে ছেড়ে দিয়ে বলে,— আজ বেঁচে গেলে তুমি।

মুকুন্দ দুহাতে গলা চেপে ধরে গাছে হেলান দিয়ে আস্তে আস্তে বসে পড়ে। আকাশ মুকুন্দর সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে মুকুন্দর দিকে। সাগর আর কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে আকাশের হাত ধরে টানতে টানতে বলে,— আর মেরো না, চলো এবার।

আকাশ ঘুরে দাঁড়িয়ে সাগরের সাথে কিছুটা এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে মুকুন্দ বলে,— আমি আবার আসব সুন্দরী। তোমায় আমি ছাড়ছি না।

আকাশ দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে মুকুন্দকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগোনোর চেষ্টা করতেই সাগর তাড়াতাড়ি করে আকাশের একটা হাত ধরে নিয়ে বলে,— যেও না, ছেড়ে দাও।

আকাশ হাত ছাড়িয়ে এগোনোর চেষ্টা করতেই মুকুন্দ দৌড়ে পালিয়ে যায়।

আকাশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার পিছন ফিরে ফেরার রাস্তা ধরে সাগরের সাথে।

হাঁটতে হাঁটতে আকাশ জিজ্ঞাসা করে সাগরকে,— কে লোকটা?

— একটা শয়তান। — হাঁটতে হাঁটতে মাথা নীচু করে বলে সাগর।

দুজনে কথা না বলে কিছুক্ষণ হাঁটতে থাকে।

কিছুদূর এসে আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে,— একলা সুন্দরী মহিলা পেয়ে সত্যি সত্যি ভূতে ধরলো তো?

— আমার মধুসূদন বাঁচালো। — হেসে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে সাগর।

ভুরু কুঁচকে আকাশ বলে,— বাঁচালাম আমি, আর নাম কিনল মধুসূদন?

— আচ্ছা বাবা, আপনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। এবার খুশী তো? — হেসে বলে সাগর।

আকাশ হাসে।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায়।

(৩৩)

বিকেল বেলা উঠোনে দাঁড়িয়ে লাল হয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে আকাশ। উঠোনের এই জায়গাটা ফুল পড়ে লাল হয়ে রয়েছে। আকাশ পিছন ফিরে একবার হলুদ হয়ে থাকা সোঁদাল গাছটা দেখে। গাছের নীচে জমিটা হলুদ হয়ে রয়েছে। এই গ্রামটাতে কৃষ্ণচূড়া আর সোঁদাল গাছের সংখ্যা একটু বেশীই বলে মনে হয় আকাশের। উঠোনের একটা কোনায় লাল আর একটা কোনায় হলুদ রঙ। বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে আকাশ। এই দুটো গাছই আকাশের ছোট বেলা থেকেই খুব প্রিয়।

আকাশের মনে পড়ে,— 'নিজের গ্রামের বাড়ির সামনে একদিকে কৃষ্ণচূড়া অন্যদিকে সোঁদাল গাছটা মেলা থেকে কিনে এনে নিজে হাতে পুঁতেছিল। দুবছরের মাথায়ই ফুল ফুটতে শুরু করে গাছ দুটোতে। খুব ফুল হতো। প্রতি গ্রীষ্মকালে বাড়ির সামনের একদিকটা টক্‌টকে লাল আর একদিকটা হলুদ হয়ে থাকতো। দুপুর বেলা দালানে বসে লাল হলুদ ফুলের সমারোহ দেখতে খুব ভালো লাগতো আকাশের। অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে তাকিয়ে থাকতো গাছটার দিকে।'

(৩৪)

আকাশ দালানের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে উদাস নয়নে তাকিয়ে আছে গাছ দুটোর দিকে। পিছন থেকে আকাশের মা এসে আকাশের মাথায় হাত রাখে। আকাশ ঘাড় ঘুরিয়ে মুখ তুলে মাকে দেখে হাসে। মা আকাশের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করে,— ঘুমোসনি খোকা?

— না-মা ঘুম আসছে না। কাল চলে যাবতো। তাছাড়া ওই লাল আর হলুদ ফুল গুলো দেখতে ভীষণ ভালো লাগছে। কতদিন দেখতে পাবো না বলোতো?

আকাশের মা পাশে এসে বসে বলে,— তুই অতো ভাবছিস কেন? দেখবি, দেখতে দেখতে সময় ঠিক কেটে যাবে।

আকাশ মায়ের দিকে ঘুরে বসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে,— তোমার জন্য মন কেমন করছে মা।

— দূর বোকা ছেলে। -- পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে মা বলে।

আকাশের মা হঠাৎ একটু উৎসাহী হয়ে বলে,— শোন খোকা, তুই যখন ফিরবি, তখন উড়োজাহাজে করে কেমন গেলি, এলি, ভিতরটা কেমন, বিলেত জায়গাটা কেমন, সেখানকার লোক গুলো কেমন সব আমাকে গল্প বলবি কেমন?

— আচ্ছা বলব। — হেসে বলে আকাশ।

— শোন খোকা, তুই ওখানে গিয়ে প্রতি সপ্তাহে আমাকে চিঠি পাঠাবি।

একটু চিন্তা করে আবার আকাশকে বলে,— না না ওতে অনেক খরচ বাড়বে। তার চেয়ে বরং মাসে একটা করে পাঠাস, কেমন?

— আচ্ছা মা।

আকাশের মা আবার ডাকে আকাশকে,-- আচ্ছা খোকা?

আকাশ মাকে ছেড়ে জিজ্ঞাসা করে,— কি মা?

— ধর, তুই যখন ডাক্তার হয়ে ফিরবি, তখন যদি আমি আর না থাকি?

চোখ ছল্‌ছল্‌ করা মায়ের মুখটা আকাশ দুহাতে তুলে ধরে বলে,— আমার মা কোনদিন মরবে না।

আকাশ মায়ের কোলে মাথা দিয়ে দালানে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে মাকে বলে,— একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দাও না মা।

মা ছেলের মাথায় সস্নেহে হাত বোলাতে থাকে।

(৩৫)

— শুনছেন?

পিছন থেকে সাগরের ডাকে ময়নামতী গাঁয়ে মায়ের কোল থেকে আকাশের মনটা মুহূর্তের মধ্যে ফিরে আসে।

আকাশ ঘুরে দাঁড়িয়ে সাগরকে দেখে তাকিয়ে থাকে। সাগর আকাশের চোখ মুখ লক্ষ করে কিছু একটা বুঝে জিজ্ঞাসা করে,-- কি হয়েছে?

আকাশ কোন কথা না বলে, শুধু মাথা নাড়ায়, তারপর নীচু গলায় বলে,— বলুন।

— বাবাকে দেখে আমার ভালো লাগছে না। — আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু উদ্বিগ্ন মুখে বলে সাগর।

— চলুন আমি দেখছি।
আকাশ তাড়াতাড়ি করে সাগরের পিছনে পিছনে দালানে উঠে ঘরে ঢুকে যায়।

(৩৬)

তাড়াতাড়ি করে সাগরের পিছনে পিছনে আকাশ ঘরে ঢুকে দেখে বৃদ্ধ খুব আস্তে আস্তে নিজের মনে কথা বলছে,— সাগর খাটের ওপর উঠে, শ্বশুর মশাইয়ের পাশে বসে বুকের ওপর হাত রাখে। আকাশ খাটের কাছে এসে বৃদ্ধ কি বলছে শোনার চেষ্টা করে।

— খোকা — খোকা? এসেছিস? — আয় বোস। এত দেরী করলি কেন? আমার যে আর সময় নেই বাবা।
সাগর আকাশের দিকে তাকায় অসহায় চোখে।
বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে এবার জোরে বলে,— চলে যাচ্ছিস কেন খোকা? আমার কাছে আয়, এখানে বোস। খোকা যাস না — যাস না বাবা।
কাশতে শুরু করে বৃদ্ধ।
সাগর উদ্বিগ্ন মুখে শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করে,— কি হয়েছে বাবা?
— খোকা চলে যাচ্ছে মা, ওকে ধরো, ওকে ধরো। আমার যে যাওয়ার সময় হোল, ওকে সব বলে যাই। — উত্তেজিত ভাবে কাশতে কাশতে বলে বৃদ্ধ।
বৃদ্ধ উঠে বসার চেষ্টা করলে, সাগর ভীত মুখে দুহাত দিয়ে ধরে বাধা দিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে বলে,— তোমার ছেলে এখানেই আছে বাবা, কোথাও যায়নি।
— এখানেই আছে? কোথায়! আমার কাছে আসছে না কেন? — একহাত দিয়ে সাগরের একটা হাত ধরে একই রকম উত্তেজিত হয়ে বলে বৃদ্ধ।
— এই তো এখানে বাবা। — সাগর কথা গুলো বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— আপনি কেমন মানুষ? বাবা এত করে ডাকছে, কথা বলতে পারছেন না?
— কথাটা বলে সাগর হাত জোর করে ইশারায় আকাশের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে আকাশের হাতটা শ্বশুরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে,— এইতো বাবা তোমার ছেলে।
ঘটনার আকস্মিকতায় আকাশ একটু হক্‌চকিয়ে যায়। তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে। সাগর আকাশের হাতটা ধরে আর একবার ইশারায় ক্ষমা চায়। বৃদ্ধ নিজের ছেলে মনে করে আকাশের হাতে হাত বোলাতে বোলাতে বলে,— এসেছিস খোকা? আয় বাবা বোস। কেমন আছিস তুই? বুড়ো বাপটাকে মনে পড়লো এতদিনে?
কথাগুলো বলতে বলতে বৃদ্ধর গলা ধরে যায়, দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সাগর শ্বশুরের দিকে তাকিয়েই আকাশকে বলে,— কি হোল কথা বলুন বাবার সাথে?
ইতস্তত করে আকাশ বলে,— হ্যাঁ, মানে, ছুটি পাইনি।
— এবার আমার শান্তি হোল। — অদ্ভুত ভাবে শান্ত হয়ে বলে বৃদ্ধ।
একটু থেমে আবার বলে,— আমাকে ছেড়ে যাসনা বাবা। আমি চলে যাই তারপর। বল, যাবিনা তো?
— না। — ছোট করে উত্তর দেয় আকাশ।
বৃদ্ধ এবার সাগরকে ডাকে,— মা — মাগো —

শ্বশুর মশাইয়ের গায়ে হাত দিয়ে সাগর সাড়া দেয়,— এইতো বাবা।
ছেলের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ ধরা গলায় বলে,— খোকা, ওর নাম সাগর' অনেক করেছে আমার জন্য। ওর কেউ রইলনা, ওকে তুই দেখিস। বল দেখবি তো?
আকাশ কি বলবে বুঝে উঠতে না পেরে চুপ করে থাকে।
বৃদ্ধ আবার উত্তেজিত হয়ে বলে,— কি হোল চুপ করে আছিস কেন?
-- হ্যাঁ দেখব। — ইতস্তত করে উত্তর দেয় আকাশ।
— আমায় কথা দে। — বৃদ্ধ আকাশের হাতটা নাড়াতে নাড়াতে বলে।
আকাশ বলে,— হ্যাঁ দিলাম।
— আ-হ্ — মুখ দিয়ে আওয়াজ করে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ। সাগর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খাট থেকে তাড়াতাড়ি করে নেমে নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। আকাশের হাতটা ধরে রেখে কেমন যেন চুপ করে যায় বৃদ্ধ।

কিছুক্ষণ পর আকাশের হাতটা ছেড়ে দিলে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধর দিকে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে ধীর পায়ে পিছোতে পিছোতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আকাশ।

(৩৭)

পাখীদের বাসায় ফেরার তাড়ায় কলরব মুখরিত ধূসর প্রকৃতির বুকে ধীরে ধীরে অন্ধকার নামতে থাকার অস্পষ্ট আলোয় খুঁটিতে হেলান দিয়ে দালানে দাঁড়িয়ে জলভরা চোখে উদাসী দৃষ্টিতে শূন্যে তাকিয়ে থাকে সাগর।

দূরে বাঁশ বাগানের মাথায় আবছা গোল চাঁদ ধূসর আকাশে সিঁড়ি বেয়ে একটু একটু করে দৃশ্যমান হচ্ছে।

আকাশ ঘর থেকে দালানে বেরিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সাগরকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর ধীর পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে পিছনে দাঁড়িয়ে সাগরের নাক টানার আওয়াজে বুঝতে পারে সাগর কাঁদছে। আকাশের উপস্থিতি বুঝতে না পেরে সাগর একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে শূন্যে দৃষ্টি মেলে। কাজল ধোয়া চোখের জলগড়িয়ে এসে চিবুককে সিক্ত করে ঝরে পড়ে বুকে।

আকাশের গলা দিয়ে শব্দ করার আওয়াজে তাড়াতাড়ি করে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে, ঘুরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে মুখে জোর করে হাসি এনে বলে,— ওহ্ আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে না?
আকাশ ইতস্তত করে বলে,— না না আমি বলছিলাম —
কথা শেষ না করে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে। সাগর আকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,— হ্যাঁ বলুন, থামলেন কেন?
— না মানে, আমি বলছিলাম, যদি আপনার আপত্তি, মানে অসুবিধা না থাকে তো — ইতস্তত করে কথাটা শেষ না করে চুপ করে যায় আকাশ।
সাগর তাকিয়ে থাকে। আকাশ আবার বলে,— আজকের রাতটা থেকে যাব আমি? মানে আমি বলছিলাম ওনার যা অবস্থা, তাতে —, যদিও আমার থাকা না থাকা দুই-ই সমান, তবুও — কথা শেষ না করে চুপ করে যায় আকাশ।
সাগর হাল্কা করে হেসে বলে,— আপনি এতো কিন্তু করছেন কেন? আজকের রাতটা কেন?

কয়েকটা দিন এখানে থেকেই যান না। আপনিতো কাজল ডাঙায় বেড়াতেই এসেছিলেন।
একটু থেমে সাগর আবার বলে,— আপনি থাকলে আমি একটু ভরসাও পাবো।
মাথা নীচু করে থাকে আকাশ। অন্ধকার হয়ে এসেছে চারিদিক। দূর থেকে শাঁখ বাজার শব্দ ভেসে আসে। আদিত্যকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্যই বোধহয় তার রূপসী প্রিয়ার রূপের ছটা এসে পড়েছে উঠোনে।

— অন্ধকার হয়ে গেল। আপনি বসুন আমি সন্ধ্যেটা দিয়ে আসি। — কথা গুলো বলে সাগর পাশ কাটিয়ে চলে যায়।
আকাশ ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে খুঁটিতে হেলান দিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগাকেট ধরিয়ে আবছা হয়ে যাওয়া গাছপালার জোনাকী জলা অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে। বৃদ্ধের কথা গুলো আকাশের মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।
— 'খোকা, ওর নাম সাগর, অনেক করেছে আমার জন্য। ওর কেউ রইল না। ওকে তুই দেখিস। বল দেখবি তো? আমায় কথা দে? আ-হ্'
মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি হয় আকাশের। কিন্তু অস্বস্তিটা কিসের বুঝতে পারে না। আজ সকাল থেকেই একটা প্রশ্ন আকাশের চারপাশে ঘুর পাক খাচ্ছে। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে,— 'অপরিচিত এই বৃদ্ধের সাথে সাগরের কিসের সম্পর্ক? সাগর বলছে বৃদ্ধ ওর শ্বশুর। অথচ ছেলে চেনেই না। আবার বৃদ্ধ বলছে অপরিচিত?

চাঁদের আলোয় ঘন সবুজের মধ্যে বিন্দু বিন্দু সাদা বকুল ফুল গুলোর দিকে তাকিয়ে আকাশ সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে মনে মনে বলে,— 'লুকোচুরিটা কিসের?'

হাসনুহানা ফুলের মিষ্টি গন্ধে আকাশ মুখ ঘুরিয়ে দালানের পাশে বেড়ার গায়ে হাসনুহানার ঝোপের দিকে তাকিয়ে দেখে হাল্কা চাঁদের আলোয় গাছ গুলো সাদা হয়ে রয়েছে। বাতাসের সাথে গন্ধরাজ ফুলের সুন্দর গন্ধ ভেসে আসে। আকাশ গন্ধরাজ ফুলের গাছটার দিকে তাকায়। অস্পষ্ট আলোয ফুল গুলো আরো উজ্জ্বল লাগে। আকাশের মনে পড়ে— 'মা বলতো, পূর্ণিমার রাতে এই দুটো ফুলেরই গন্ধের তীব্রতা বাড়ে।'
নিজের মনেই বলে আকাশ,— 'একজনের গন্ধ যদি নেশা জাগায়, তাহলে আর একজনের গন্ধ মাতাল করে।'

মায়ের কথা মনে পড়ে আকাশের। বিদেশ যাওয়ার আগের দিন ভোর বেলা গ্রামের বাড়ি থেকে কলকাতা ফেরার ছবিটা আকাশের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

(৩৮)

আকাশ দালানে নীচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে মাকে প্রণাম করে। আকাশের মাথায় হাত দিয়ে মা বলে,— জয় হোক। ভগবান তোর মঙ্গল করুক।
আকাশ মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মায়ের জলে ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে বলে,— তুমি কাঁদছ মা?
— সাবধানে থাকবি বাবা, কেমন! চিঠি দিবি। — কথা গুলো বলতে বলতে মায়েব চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে।

হাত দিয়ে মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে উঠোনের দরজার সামনে অপেক্ষারত বাবার দিকে একবার দেখে নিয়ে মাকে নীচু গলায় বলে,— বিদেশে গিয়ে কাজ নেই মা। তোমাকে ছেড়ে এতদিন থাকতে খুব কষ্ট হবে আমার। আমি বরং এই গ্রামেই প্র্যাকটিস্ শুরু করি।
শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে আকাশের মা বলে,— তা বললে হয় বাবা, তোর বাবা তোর জন্য কত কষ্ট করে টাকার যোগাড় করেছে বলতো। তুই বড় হলে আমরাও তো পাঁচজনকে বলতে পারব। আর বাবা, একটা কথা সবসময় মনে রাখবি, যারা অনাথ, অসহায়, গরীব-দুঃখী তাদের যতটুকু পাববি সেবা করবি। কোনদিন অবহেলা করবি না এদের। তাহলে দেখবি হরি মধুসূদন তোর সাথে থাকবে। অনেক বড় হবি তুই।
আকাশের বাবা উঠোনের সামনে থেকে ডাকে,— কই চলো এবার, দেরী হয়ে যাচ্ছে।
— আয় খোকা -- মা করুন মুখে বলে।
আকাশ বাবাকে উঠোনের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে দালানের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলে,— একটু দাঁড়াও বাবা।
কথাটা বলে আকাশ এগিয়ে যায় বাবার দিকে। আকাশের বাবা দাঁড়িয়ে যায়।

আকাশ বাবার কাছে গিয়ে নীচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। আকাশের বাবা ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলে,— ঈশ্বরের আর্শীবাদে অনেক বড়ো হও জীবনে।
আকাশ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালে বাবা বলে,— আর একটা কথা বলি। মানুষের সংজ্ঞাটা হয়তো ছোট, কিন্তু মানেটা অনেক বড়ো। জীবনে শুধু মাত্র দায়িত্বশীল সন্তান, স্বামী, পিতা বা অন্য কোন সম্পর্ক না হয়ে, মানুষ হযো। আগে মানুষ তারপর ওগুলো। যদি মনুষত্ব বিবেক সম্পন্ন মানুষ হতে না পারো তাহলে কখনোই অন্য কিছু হতে পারবে না, সে তুমি যত বড় ডাক্তারই হওনা কেন, যত নাম যশই হোক না কেন তোমার।
আকাশ কথা না বলে মাথাটা একদিকে হেলিয়ে বাবার কথার সম্মতি জানায়।
— এসো। — আকাশের বাবা, মাটিতে রাখা সুটকেশটা তুলে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। আকাশ আবার দৌড়ে এসে দালানে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে। মা-ও ছেলেকে জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলে,— আয় বাবা, দেরী হয়ে যাবে। তোর বাবা এগিয়ে গেছে।

আকাশ মাকে ছেড়ে দিয়ে মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোনের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আর একবার পিছন ফিরে মাকে দেখে। তারপর বেরিয়ে যায় উঠোনের দরজা দিয়ে।
আকাশের মা ছেলের মঙ্গল কামনায় জলভরা চোখে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বলে,— দুর্গা — দুর্গা, হরি মধুসূদন।

(৩৯)

বাবা ছেলে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছে বাগদী পাড়ার পুকুরের পাশ দিয়ে।
— বাবা সুটকেশটা এবার আমাকে দাও। — হাঁটতে হাঁটতে কথাটা বলে আকাশ বাবার হাতে ধরা সুটকেশটা ধরে।
— না ঠিক আছে। শোনো, কাল তাড়াতাড়ি পৌছে যাবে এয়ারপোর্টে। আগে থাকতে গিয়ে বসে থাকবে। — কথাটা বলতে বলতে আকাশের বাবা সুটকেশটা একহাত থেকে আরেক হাতে

নেয়।

— হ্যাঁ বাবা। — সম্মতি জানিয়ে বলে আকাশ।

স্নেহসুলভ গলায় বাবা ছেলেকে বলে,— মন দিয়ে পড়াশোনা কোর, ক্লাসে ফাঁকি দিও না।
ঘাড় নেড়ে বাবার কথার সম্মতি জানায় আকাশ।

পৃথিবীর সব বাবা-মাই বোধহয় একই রকম একটা মানসিক রোগে ভোগে। সন্তান যত বড়ই হোক না কেন তারা ভাবে তাদের সন্তান তখনো কতো ছোট ও অপরিণত। যদি তারা কোন ভুল করে ফেলে। সর্বদা সন্তানের মঙ্গল কামনায় চিন্তিত স্নেহশীল বাবা মায়েরা কোন উপদেশ দিয়ে মনে মনে ভাবে ঠিক মতো বলা হোল না বা বোঝানো গেল না। বার বার নতুন করে বলার ও বোঝানোর কথা খুঁজে পায়।

যোগী বটতলার পাশ দিয়ে যেতে যেতে আকাশের বাবা বলে,— টাকা পয়সা সাবধানে রাখবে। অচেনা জায়গা। লোকের সাথে বুঝে শুনে মিশবে। চট্ করে কাউকে বিশ্বাস কোর না।
আকাশ কোন কথা না বলে বাবার সাথে হাঁটতে থাকে।

— একটা কথা মাথায় রেখো, অনেক আশা স্বপ্ন নিয়ে তোমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকবো আমরা। — কথাটা বলে হাঁটতে হাঁটতে আকাশের বাবা আকাশের মুখের দিকে তাকায়।
আকাশ কোন উত্তর না দিয়ে একবার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে, তারপর আবার মাথা নীচু করে হাঁটতে থাকে।

চাঁপা ডাঙা গ্রাম ছাড়িয়ে চওড়া মাটির রাস্তা ছেড়ে ধান ক্ষেতের মাঝে সরু আলের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যায় বাবা আর ছেলে।

(৪০)

অন্ধকার নামার সাথে সাথে রূপসী চাঁদের রূপালী আলোয় প্লাবিত জোৎস্না রাতের রহস্যময় অন্ধকারের দিকে দালানের খুঁটিতে হেলান দিয়ে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে আকাশ। মন ছুটে চলেছে তখনো বাবার সাথে হাঁটতে থাকা ধান ক্ষেতের মাঝে আলের রাস্তার ওপর দিয়ে।

পর পর তিনবার শাঁখবাজার শব্দে মুহূর্তের মধ্যে মন ফিরে আসে নিজের কাছে।

ব্যাঙেদের সম্মিলিত চিৎকারকে ঝিঁঝিদের সমর্থন করা শুরু হয়ে গেছে ইতি মধ্যে। কিন্তু তবুও কেমন যেন একটা নিস্তব্ধতা, নিরবতা।

আকাশ তাকিয়ে দেখে, বাইরে আলো আঁধারির মায়াবী পরিবেশের মধ্যে উঠোন ময় খেলতে থাকা চাঁদের আলো। গন্ধরাজ আর হাসনুহানা ফুলের গন্ধে ভারী হয়ে যাওয়া, মনে অবেশ ছড়ানো বাতাসে আঘ্রান নিয়ে ফুলে ভরে যাওয়া গাছ গুলোর দিকে তাকিয়ে আকাশ মনে মনে ভাবে,— 'প্রকৃতির কি অন্যতম অদ্ভুত সৃষ্টি এই ফুলের গন্ধ! সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এমন আর এক অপূর্ব সৃষ্টি, যাকে ধরা যায় না, অনুভব করা যায়। দেখা যায় না কিন্তু বোঝা যায়।'

রক্তিমের কথা মনে পড়ে আকাশের। রক্তিম বলতো,— 'ফুলের গন্ধ কি? কিভাবে তৈরী হয় বা কোথায় শুরু তার কোন সঠিক ব্যাখ্যা তোদের বিজ্ঞানে নেই। অতএব তোরা একে বুজরুকি

বলে ছেড়ে দে! কিন্তু তোরা কোনদিনই তা পারবি না, কারণ তোরা এটা অনুভব করিস। অর্থাৎ তোরা যেটা অনুভব করবি, বুঝবি বা ব্যাখ্যা দিতে পারবি সেটাই বিজ্ঞান, আর তার বাইরে সব মিথ্যে, বুজরুকি।'
একটু হেসে বলতো,— 'পৃথিবীতে এইরকমই এমন অনেক জিনিস আছে, যা যুক্তিতে বা ব্যাখ্যায় বোঝা, দেখা অথবা ধরা যায় না। শুধু অনুভব করা যায়!'

আকাশ নিজের মনে হাসতে হাসতে ভাবে,— 'রক্তিমটা যতক্ষণ থাকতো এরকম পাগলামী করতো। ওর চিন্তাধারা ভাবনাচিন্তাটা কেমন যেন অন্যরকম ছিলো। সাধারণ মানুষের সাথে চট্ করে মিলতো না।

পায়ের তোড়ার রিন্‌ঝিন্ আওয়াজে আকাশ ঘাড় ঘুরিয়ে সাগরকে দেখে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে এক দৃষ্টে।

একপ্যাঁচ করে ঘরোয়া ভাবে পরা কাজ করা লাল পাড় সবুজ তাঁতের শাড়ী, কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর প্রদীপের আলোর সাথে মানান সই ভাবে জ্বল জ্বল করছে। হাতে একটা জলন্ত প্রদীপ, ধূপ, আর ছোট একটা ঘটি নিয়ে আসতে আসতে দালানে আকাশকে বসে থাকতে দেখে মন চঞ্চল করা খুব মিষ্টি একটা লাজুক হাসি হেসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোনে তুলসী মঞ্চের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

আকাশের মাথার ভিতর সবকিছু যেন কেমন একটা তালগোল পাকিয়ে যায়। মনে মনে ভেবে পায়না রক্তে উন্মাদনা জাগানো এত অপরূপ সুন্দরী এর আগে কোনদিন দেখেছে কিনা। আকাশের মনে হয়,— 'স্বর্গের কোন অপ্সরা বুঝি জোৎস্না রাতে প্রদীপ হাতে নেমে এসেছে এই তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যে দেওয়ার জন্য।'
আকাশ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে।

সাগর ঘটি আর প্রদীপটা তুলসী মঞ্চের ওপর রেখে প্রথমে তুলসীকে ধূপ দেখিয়ে, প্রণাম করে। তারপর ধূপকাটিটা তুলসী গাছের নীচে মাটিতে পুঁতে দেয়। ঘটির থেকে হাতে জল নিয়ে হাত উঁচু করে উঠোনের চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। আকাশের মুখের ওপর পড়ে জলের ছিটে। এবার প্রদীপ হাতে তুলসী মঞ্চকে প্রদক্ষিণ করার সময় আকাশ লক্ষ করে জোৎস্নার আলোয় সাগরের সিঁথির ওপর জ্বল জ্বল করছে কয়েকটা জলের বিন্দু। আকাশ সম্মোহিতের মতো পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে!

প্রদীপ হাতে তিনবার তুলসী মঞ্চকে প্রদক্ষিণ করে, প্রদীপটা তুলসী তলায় রেখে দেয়। তারপর খোলা চুলের ওপর দিয়ে আঁচলটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে, সামনে ডানদিকে ঝুলিয়ে বসে পড়ে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে সাগর।
আকাশ হঠাৎ সাগরের জায়গায় নিজের মাকে দেখে। মনে হয় মা বুঝি প্রণাম করছে তুলসী তলায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে।
আকাশ উঠে দাঁড়াতে গিয়েও মনের ভুল বুঝতে পেরে আবার বসে পড়ে। মনে মনে হেসে বলে,— 'ইলিউশন'।

মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। মা ঠিক এভাবেই প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তুলসী তলায় সন্ধ্যে দিত।

আকাশ যখন কলকাতা থেকে বাড়ি আসতো, মার পিছনে দাঁড়িয়ে মায়েব সন্ধ্যে দেওয়া দেখতো আর ভাবতো,— 'পূজো না পবিত্রতা, পবিত্রতা না নিষ্ঠা — কোনটা বড়ো?'

(৪১)

সন্ধ্যে দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর আকাশের মা ঘুরে দাঁড়িয়ে আকাশকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করে,— কি দেখছিস খোকা?
— তোমাকে। — হেসে উত্তর দেয় আকাশ।
মা কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে,— কেন রে, মাকে কি প্রথম দেখছিস?
আকাশ আদুরে গলায় বলে,—, তুমি যখন পূজো করো না মা তোমাকে ভীষণ সুন্দর লাগে।
— তুই এখনও সেই ছোট্টটাই রয়ে গেছিস। — মমতা মাখানো গলায় মা আকাশকে বলে।
আকাশ মাকে জড়িয়ে ধরে বলে,— আমিতো তোমার কাছে ছোট হয়েই থাকতে চাই। বড়ো হোলে যে তুমি বুড়ি হয়ে যাবে।
আলতো করে পিঠে চড় মেরে মা বলে,— পাগোল ছেলে কোথাকার।

(৪২)

সাগরের প্রণাম কবা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ তুলসীর দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। তারপর উঠে পড়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আকাশকে ওই ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে হেসে জিজ্ঞাসা করে,— কি দেখছেন?
মুহূর্তের মধ্যে আকাশ নিজেব মধ্যে ফিরে আসে। চাঁদের আলোয় সাগবকে পূজারিণীর বেশে একবার সামনা সামনি আরো ভালো করে, আরো স্পষ্ট ভাবে দেখে আকাশ। রূপালী আলোয় সাগরের সিঁথির ওপর ঝিক্‌মিক্ করা জলের ফোঁটা গুলো আরো জ্বলজলে দেখায়। সাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে আকাশেব ছোটবেলায় পড়া রূপকথার গল্পের পরীদের কথা মনে পড়ে। যাবা আকাশের তাবা দিয়ে সিঁথি সাজিয়ে ঘুরে বেড়াতো।
আকাশকে ওইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে সাগরের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়।
মনে সাড়া জাগানো লাজুক হাসি হেসে সাগর আবার জিজ্ঞাসা করে,— কি দেখছেন?
মুহূর্তের মধ্যে রক্তিমের লেখা একটা কবিতার লাইন গুলো মনে পড়ে যায় আকাশের।
নিজের অজান্তেই আকাশের মুখ দিয়ে বেবিযে যায়,— তোমাকে, না মানে আপনাকে।
নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি কবে আবার বলে,— আসলে আমার এক বন্ধুর লেখা একটা কবিতা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল। ওটাই মনে মনে বলছিলাম।
সাগব মজা করে হেসে জিজ্ঞাসা করে,— সেটা কি আমায় দেখে, নাকি ওই সুন্দরীকে দেখে?
কথাটা বলতে বলতে সাগর চাঁদের দিকে তাকিয়ে আবার আকাশের দিকে তাকায়।
আকাশ একবার চাঁদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তারপর সাগরের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করে বলে,— দুজনকে দেখেই।
— তাহলে তো শুনতে হয়। শোনাবেন? — চোখ বড় বড় করে অনুরোধের সুরে বলে সাগর।
কয়েক মুহূর্ত সাগরের মুখ আব সিঁথির ওপর জ্বলতে থাকা জলবিন্দুব দিকে তাকিয়ে থেকে আকাশ কবিতাটা আবৃত্তি করার ঢঙে বলতে শুরু করে,—

ঈর্শায় মরে অরুনের প্রিয়া তোমার অধরে চেয়ে,
আঁধার এসে সিঁথি ভরায় আকাশ প্রদীপ দিয়ে।
পূব আকাশের শুকতারা ওই তোমার কপোলে জ্বলে,
ভ্রমর এসে চুপি চুপি যেন প্রেমের কথা বলে।
দক্ষিণা বাতাস রাগিনী গায় আগাম খবর পেয়ে।।

ফুলের কলিরা জেগে ওঠে ওই পরাগ ঝরানো বনে,
রক্ত কমল পাপড়ি মেলে অলির গুঞ্জরণে।
বনবিথীতে বেজে ওঠে তান্ কোন অজানার সুরে,
লজ্জায় মরে যৌবনা নদী লুকায় গিয়ে বহুদূরে।
তোমার আমার মিলন হোল রাঙা গোধুলির ক্ষণে।।

লজ্জায় লাল হয়ে যায় সাগরের মুখ। মনে হয় মুহূর্তের মধ্যে কে যেন একমুঠো লাল আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে সাগর বলে,— খুব সুন্দর কবিতাটা লিখেছেন কিন্তু আপনার বন্ধু। দেখা হোলে আমার হয়ে একটা ধন্যবাদ দিয়ে বলবেন খুব ভালো লেগেছে কবিতাটা আমার।

আকাশ বলে,— দেখা হলে নিশ্চই বলে দেব, তবে দেখা বোধ হয় আর কোন দিনই হবে না।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সাগর জিজ্ঞাসা করে,— কেন?

— হারিয়ে গেছে। — সাগরের চোখে চোখ রেখে ছোট্ট করে উত্তর দেয় আকাশ।

অবাক হয়ে সাগর জিজ্ঞাসা করে,— হারিয়ে গেছে মানে?

অন্যদিকে তাকিয়ে উদাস ভাবে আকাশ উত্তর দেয়,— হারিয়ে গেছে মানে হারিয়েই গেছে। আসলে ওর মধ্যে অনেক প্রতিভা ছিল! সেগুলো ও প্রকাশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু কেউ বুঝতে পারলো না ওকে। বহু চেষ্টা করা সত্বেও কোন সুযোগ পেল না। হতাশ হয়ে ব্যর্থতার লজ্জা ঢাকতে বুকভরা অভিমান নিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আকাশ বলে,— আপনাকে দেখে আমার মায়ের কথা মনে পড়েছিলো।

— কেন? — সাগর জিজ্ঞাসা করে।

— আমার মা আপনারই মতো খুব পুজোআর্চা করতো। ঠিক্ এইভাবেই রোজ সন্ধ্যেবেলা তুলসী তলায় সন্ধ্যে দিতো।

সাগর জিজ্ঞাসা করে,— মা নেই?

— না। — আকাশ উত্তর দেয়।

মমতা মেশানো গলায় সাগর জিজ্ঞাসা করে,— খুব মন খারাপ লাগছে?

— মন খারাপ করলে কষ্টটাই আরো বাড়বে। মা-তো আর ফিরে আসবে না। — নিরুত্তাপ গলায় অন্যদিকে তাকিয়ে আকাশ বলে।

সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে সাগর বলে,— মা-কি কারোও চিরকাল থাকে? আমারও মা-বাবা কেউ নেই।

আকাশ মুখ ফিরিয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সাগর তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চোখ ফেরায়।

— অন্ধকার হয়ে গেছে ঘরে চলুন। — কথাটা বলে সাগর এগিয়ে যায়।

আকাশ বসে বসেই বলে,— আপনি যান আমি আসছি একটু পরে।
সাগর দাঁড়িয়ে গিয়ে পিছনে ঘুরে বলে,— না এখনই চলুন, অন্ধকারে ভূতের মতো বসে থাকতে হবে না একা।

কোন কথা না বলে আকাশ উঠে পড়ে। সাগর সিঁড়ি দিয়ে দালানে উঠে যায়, আকাশ অলস্ পায়ে এগিয়ে গিয়ে সাগরের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকে যায়।

(৪৩)

দালানার খোলা দরজা দিয়ে গন্ধরাজ ফুলের সুবাস মেখে বাতাস ঘরে ঢুকে আমোদিত করে তুলেছে অন্ধকার পরিবেশকে।

আকাশ অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরেব আবছা আলোয় মায়াবী পরিবেশের দিকে তাকিয়ে সাগরের কথা চিন্তা করতে থাকে। আকাশের চোখের সামনে বার বার ভেসে ওঠে সাগরের তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যে দেওয়ার দৃশ্যটা। ধূপ দেখানো, জলের ছড়া দেওয়া, প্রদীপ হাতে প্রদক্ষিণ ও গলায় আঁচল জড়িয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার মধ্যে আকাশ মায়ের ছায়া দেখতে পায়। নিজের মনে বলে,— 'একদম মায়ের মতো। একই রকম স্নেহ প্রবণ, সেবা পরায়ণ আর অদ্ভুত একটা কমনীয়তা। শাড়ী পরার ধরনটাও একই রকম, মায়ের মতো করে ঘরোয়া ভাবে একপ্যাঁচ করে পড়া।'
এখনো অবধি সাগরকে কুঁচি দিয়ে শাড়ী পড়তে দেখেনি আকাশ।
নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে আকাশ,— 'দুজন অচেনা মানুষের মধ্যে এতো মিল থাকে?'
আকাশ মনে মনে ভাবে,— 'সাগরের কথাবার্তা, ঈর্ষনীয় রূপ দেখলে কেউ বলবে না গ্রামের মেয়ে।'
আকাশ আবার ভাবে,— 'বৃদ্ধ যে সাগরের শ্বশুর নয় এবং কিছুদিন আগেও দুজন দুজনের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল তা বৃদ্ধের কথাতে স্পষ্ট বোঝা যায়। যাকে সাগর স্বামী বলছে তার সাথে সাগরের বিয়েও হয়নি—'
আকাশের মনে আবার প্রশ্ন জাগে,— 'মিথ্যে কথা বলছে সাগর, রহস্যটা কি?'
নিজেকেই নিজে বোঝায়,— 'হয়তো কোন একটা চাপা কষ্ট লুকিয়ে আছে ওর বুকের মধ্যে। আকাশ একজন অপরিচিত দুদিনের অতিথি তাই মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছে আকাশের সামনে। এই গ্রামের লোকেরাও সাগরের সম্বন্ধে কিছুই জানেনা বলে মনে হয়।'
আকাশের চোখের সামনে মুকুন্দর মুখটা ভেসে ওঠে হঠাৎ। মুকুন্দর বলা কথা গুলো আকাশের কানের কাছে যেন বেজে ওঠে,— 'অনেক কষ্টে তোমার খোঁজ পেয়েছি। খুব ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিলে। আজ আর পার পাবে না। স্বামী সেতো কবে থেকেই ছেনালীপনা দেখছি। স্বামীতো আর আসে না। একবার ডেকেই দেখো না এবার যদি আসে।'
আকাশ মনে মনে বলে,— 'সাগররা এখানে কিছুদিন হোল এসেছে। কিন্তু সাগরের স্বামী এবং বৃদ্ধের ছেলে দুজনেই বহুদিন আসছে না।'
আকাশ নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে,— 'কেন? এই মুকুন্দ লোকটাই বা কে? বৃদ্ধের ছেলে আর সাগরের স্বামীর মধ্যে যোগ সূত্রটাই বা কি?'
এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আকাশ এটা পরিস্কার বুঝতে পেরেছে যে, সদা হাসি খুশী সাগর অত্যন্ত

বুদ্ধিমতী ও খুব ভালো একটি মেয়ে। একটা মেয়ের মধ্যে যা যা গুণ থাকে প্রায় সব গুলোই আছে বলে মনে হয়। কর্তব্য নিষ্ঠ, সেবা পরায়ণ, মাতৃসুলভ মমতাময়ী ও ধর্মপরায়ণা।

সাগর ঘরে ঢুকে অন্ধকারে আকাশকে চুপ করে শুয়ে থাকতে দেখে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে,— এভাবে অন্ধকারে দরজা বন্ধ না করে শুয়ে আছেন?

সাগরের কথায় চিন্তাছিন্ন হয় আকাশের। তাড়াতাড়ি উঠে বসে অন্ধকারে সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— খুব সুন্দর ফুলের গন্ধ আসছিলো, তাই দরজাটা বন্ধ করিনি। কখন চোখটা লেগে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি।

— শরীর ঠিক আছে তো? কালকে যা কাকভেজা হয়েছিলেন। — কথাটা বলে সাগর আকাশের কপালে হাত দিয়ে বলে,— একি, গা তো বেশ গরম।

আচমকা সাগরের হাতের ছোট স্পর্শে মুহূর্তের মধ্যে শিহরণ খেলে যায় আকাশের শরীরে। তাড়াতাড়ি করে বলে,— না না ওকিছু নয়।

— ওকিছু নয় মানে? — আকাশের দিকে তাকিয়ে কথা গুলো বলে এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে সাগর বলে,— ঠাণ্ডা হাওয়ায় জ্বর বাড়বে। বললে তো শুনবেন না। ভরদুপুরে বিশ্রাম না নিয়ে কাঠফাটা রোদে চলে গেলেন ঝিলের ধারে।

অবাক হয়ে আকাশ মনে মনে ভাবে,— 'কয়েক ঘণ্টার অপরিচিত এক অতিথির জন্য এত মমতা, এত ভাবনা? আকাশ যেন সাগরের কত আপনার, কত প্রিয়। কথা শুনে মনে হয় যেন কতদিনের চেনা। সাগরের স্পর্শে যেন কোন যাদু লুকিয়ে আছে।'

মায়ের কথা মনে পড়ে আকাশের, মা ঠিক এইভাবেই বলতো,— 'বললে তো শুনবি না। সারা দুপুর নদীর ধার আর পুকুর পাড় করে বেড়ালি।'

আকাশ নিজেকেই বলে মনে মনে,— 'মা ছাড়া আর তো কেউ কোনদিন এভাবে স্নেহ মমতা মিশিয়ে বলেনি!'

বহুদিন পর মায়ের মতো এরকম কথা শুনে আকাশের ভিতরের ছোট্ট শিশুটা যেন যন্ত্রনায় কেঁদে ওঠে। কথার উত্তর না দিয়ে আকাশ তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে।

দরজা বন্ধ করে, এগিয়ে এসে মাথার দিকে মেঝেতে কমিয়ে রাখা হ্যারিকেনটার আলোটা বাড়িয়ে, টেবিলে রেখে আকাশের কাছে এসে আকাশকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করে,— কি ভাবছেন? কোথায় হারিয়ে গেছেন?

একটু থেমে আবার বলে,— আজ সন্ধ্যে থেকেই লক্ষ করছি, কি যেন ভাবছেন আর অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন। কি হয়েছে বলুন তো?

— কই কিছু হয়নি তো। — চমকে উঠে তাড়াতাড়ি করে বলে আকাশ।

আকাশ এড়িয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে সাগর আগের কথার জের টেনে বলে,— আপনার কিন্তু আজ দুপুরে ওরকম রোদের মধ্যে বেরোনটা উচিত হয়নি।

আকাশ মজা করে বলে,— বা-রে, আপনিই তো বললেন, আমার ঝিলের ধারে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু ভূতের ভয়ে যেতে পারছি না। তুমি আমার সাথে যাবে গো।

সাগর চোখ বড় করে তাড়াতাড়ি বলে,— কি মিথ্যাবাদী লোকরে বাবা। ডাক্তার গুলো এরকম মিথ্যেবাদী হয় জানাছিল নাতো। হে মধুসূদন।

হেসে হেসে আকাশ বলে,— কি করব বলুন? ডাক্তারী ব্যাপারটা সবসময়ই পরীক্ষা মূলক। কিছু হোক আর না হোক, রোগীকে আশ্বাস দিতেই হয় যে, তার ভয়ের কিছু নেই, যা হয়েছে তা

সেরে যাবে। রোগ যদি না সারার হয় তাহলেও এই মিথ্যাটা বলতে হয় রোগীর মুখ চেয়ে। তাই অভ্যাস হয়ে গেছে একটু আধটু মিথ্যা কথা বলার। এর জন্য অবশ্য আপনার রোগীরাই দায়ী। কারণ, মিথ্যা কথাটাতো আপনাদের জন্যই বলা।
একটু থেমে আকাশ আবার বলে,— আচ্ছা, আপনি সব ব্যাপারে আপনার ওই মধুসূদন ভদ্রলোককে ডেকে এনে বিরক্ত করেন কেন বলুন তো?
সাগর হেসে হেসে বলে,— আমার মধুসূদন কখনো বিরক্ত হয় না।
আকাশ আচমকা সাগরকে জিজ্ঞাসা করে,— আপনি তো আপনার মধুসূদনকে এতো ডাকেন, এতো পূজো করেন। কোনদিন কিছু চেয়েছেন?
— হয়তো চেয়েছি। — একমুহূর্ত চুপ করে থেকে সাগর উত্তর দেয়।
— পেয়েছেন?
-- হয়তো পেয়েছি। — অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দেয় সাগর।
— হয়তো কেন বলছেন?
সাগর আকাশের দিকে ফিরে উত্তর দেয়,— কারণ, কি চেয়েছি সেটাই ভুলে গিয়েছি।
— এটাতো এড়িয়ে যাওয়ার উত্তর হল।
— হয়তো তাই। যাইহোক্ আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন, দালানে জল রাখা আছে। আমি খাবার আনছি। — কথাটা বলে সাগর তাড়াতাড়ি করে পিছনে ঘোরে।
আকাশ হাতের ঘড়িটা দেখে বলে,— এত তাড়াতাড়ি কেন?
প্রয়োজনে মাতৃসুলভ, শাসন করার মতো আচরণ আপনা থেকে বেরিয়ে আসাটা মেয়েদের বোধহয় জন্মগত। সাগর আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই সুরেই বলে,— এরপর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভালো লাগবে না খেতে। তাছাড়া জ্বর গায়ে বসে থাকতে হবে না আর। ব্যাগে নিশ্চই জ্বরের ওষুধ আছে না থাকলে আমার কাছে আছে। শোয়ার আগে খেয়ে নেবেন মনে করে। রাত্রে যদি জ্বর বাড়ে বা অসুবিধা হয়, আমায় ডাকবেন।
কথা গুলো বলে সাগর ভিতরের ঘরে দিকে এগিয়ে যায়। আকাশ হেসে জিজ্ঞাসা করে,-- আপনি এসে কি করবেন?
সাগর দাঁড়িয়ে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আকাশকে হেসে বলে,— নারায়ণ সেবা।
কথাটা বলে সাগর ভিতরের ঘরে ঢুকে যায়।
আকাশ সাগরের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে হাসে।

(৪৪)

বৃদ্ধ খাটে শুয়ে কাশতে কাশতে বলে,-- খোকা, একবার আয় বাবা আমি চলে যাচ্ছি যে।
সাগর শ্বশুর মশাইয়ের বুকে হাত বোলানো বন্ধ করে, খাট থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে তাকের ওপর রাখা গ্লাসটা নিয়ে কলসী থেকে জল গলায়। শ্বশুর মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে, কলসীতে চাপা দিয়ে, খাটে এসে বসে বলে,— একটু জল খাওতো বাবা।

আরো কাছে এসে শ্বশুর মশাইয়ের মাথাটা একটু তুলে ধরে অল্প অল্প করে জল খাইয়ে দেয়। বৃদ্ধের কাশিটা একটু কম হয়। জল খেয়ে বালিশে মাথা রেখে বৃদ্ধ আবার বলে,— আমার আর খোকার সাথে দেখা হোল না। অনেক কিছু বলার ছিল।
সাগর শ্বশুর মশাইকে বলে,-- তোমার ছেলে এসেছে বাবা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে।

উত্তেজিত হয়ে বালিশ থেকে মাথা তুলে বৃদ্ধ বলে,— খোকা এসেছে? এসেছে আমার খোকা? ওকে একবার ডাকো মা, একটিবার ওকে একটু ধরি।
সাগর কি করবে বুঝে পায় না। আকাশ শুয়ে পড়েছে কি না দেখার জন্য খাট থেকে নেমে, বলে,— আচ্ছা আমি ডাকছি।
সাগর দরজা ফাঁক করে পর্দা সরিয়ে পা বাড়াতেই আকাশের সাথে জোরে ধাক্কা লাগে সামনা সামনি।

আকাশ বৃদ্ধের কথা গুলো শুনে ভিতরের ঘরে যেতে গিয়ে সাগরের সাথে ধাক্কা লেগে চৌকাঠে পা আটকে পড়ে যেতে যেতে সাগর ধরে নেয় আকাশকে। আকাশ নিজের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তাড়াতাড়ি করে জাপটে ধরে সাগরকে। তাড়াতাড়ি করে সাগরকে ছেড়ে দিয়ে আকাশ বলে,— আমি শুনেছি, চলুন।
সাগর শ্বশুর মশাইয়ের খাটের কাছে এসে বলে,— তোমার ছেলে এসেছে বাবা।
বৃদ্ধ হাত উঁচু করে ছেলেকে খোঁজার চেষ্টা করতে করতে বলে,— এসেছিস খোকা?
আকাশ হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধের হাতটা ধরে বলে,— এইতো।
বৃদ্ধ আকাশের হাতটা ধরে জিজ্ঞাসা করে,— এতো দেরী করলি কেন বাবা?
— ছুটি পাইনি বাবা। — আকাশ উত্তর দেয়।
সাগরের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ বলে,— সাগর, খোকাকে বসতে দাও।
খাটের ওপর বৃদ্ধের পাশে বসে আকাশ উত্তর দেয়,— এইতো আমি তোমার পাশেই বসেছি।
বৃদ্ধ শান্তির নিশ্বাস ফেলে বলে,— এবার আমি শান্তি মনে যেতে পারব।
— কিছু হয়নি তোমার, আমিতো এসে গেছি। — বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আকাশ কথা গুলো বলে।
আকাশের কথা না শোনার মতো করে বলে,— তোমাকে কতগুলো কথা বলব বলে প্রাণটুকু জিইয়ে রেখেছি।
আকাশ সাগরের দিকে তাকালে, সাগর শ্বশুর মশাইকে বলে,— পরে বোলো বাবা। তোমার ছেলেতো এখন থাকবে।
বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে ছেলের উদ্দেশ্যে বলে,— না না সময় নেই, শুনে নাও। ওকে যে দেখছ, ওর নাম সাগর। এই অপরিচিত, অসহায়, অন্ধ মানুষটাকে দিনের পর দিন বুকে করে কোন ত্রুটি না রেখে সেবা যত্ন করেছে। বাবা বলে ডেকেছে। ও আমার সাক্ষাত অন্নপূর্ণা। ওকে কোনদিন অবহেলা কোর না। ওকে যথাযথ সম্মান দিও, নাহলে আমি মরেও শান্তি পাবো না।
একনাগারে কথা গুলো বলে বৃদ্ধ কাশতে থাকে।
সাগর অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে চোখের জল ফেলে।
আকাশের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে উত্তেজিত ভাবেই বৃদ্ধ বলে,— কি হোল কথা বলছনা কেন? আমায় কথা দাও।
জলভরা চোখে মুখ ফিরিয়ে সাগর ধরা গলায় বলে,— বাবা, তুমি এত কথা বোল না।
বৃদ্ধ সাগরের কথা না শুনে ছেলেকে ডাকে,— খোকা — খোকা।
হ্যাঁ বাবা। — আকাশ উত্তর দেয়।
আকাশের হাতটা শক্ত করে চেপে দরে বলে,— আমায় কথা দাও।
— হ্যাঁ বাবা।

বৃদ্ধ উত্তেজিত ভাবে বলে,— আমায় ছুঁয়ে কথা দিলে কিন্তু।
— হ্যাঁ বাবা। — আবার ছোট্ট করে উত্তর দেয় আকাশ।
শান্তির নিশ্বাস ফেলে একদম নিস্তেজ হয়ে গিয়ে ওপাশে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে থাকে বৃদ্ধ।
সাগর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে শ্বশুরের বুকে চাদর চাপা দিতে থাকে।
আকাশ কয়েক মুহূর্ত বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

(৪৫)

চাঁদের আলোয় গাছগুলো কেমন যেন কালো কালো দৈত্যের মতো হাওয়ায় দুলছে। ঝিঁঝির ডাক গুলো মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে। দু-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কিছু একটা যেন অনুভব করার চেষ্টা করছে। তারপর আবার শুরু করছে ডাকা। আশে পাশেই কোথাও কয়েকটা ব্যাঙ একসাথে কিছুক্ষণ ডেকে আবার থেমে যাচ্ছে। বেশ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, আবার কিছুক্ষণের জন্য ডেকে উঠছে। তারপর আবার কিছুক্ষণের জন্য চুপ।

চারিপাশে কেমন যেন একটা আলো আঁধারির রহস্য ময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। আকাশের মনে হয়,— 'ছায়ার ঘোমটা টানা অন্ধকারের মধ্যে থেকে অলক্ষ্যে কারা যেন লক্ষ্য রাখছে।'

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ন কর্কশ ডাক আকাশের কানে আসে। কেক্কা-ক্কা-ক্কা-ক্কা-ক্কা........ তারপরই কোন পাখীর ডানা ঝাপটানির আওয়াজ। কয়েকটা কাক এবার যেন ভীত স্বরে ডেকে ওঠে। সাথে সাথে আনেক গুলো পাখীর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ। তারপরেই আবার সব চুপচাপ। আকাশ চম্‌কে উঠে গাছপালার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটু আগে বৃদ্ধের বলা কথা গুলো আকাশের মনের ভিতর ঘোরাফেরা করতে থাকে,— 'আমায় কথা দাও, আমায় ছুঁয়ে কথা দিলে কিন্তু।'
আকাশের নিজের বলা কথাটা মনে পড়ে,— 'হ্যাঁ বাবা।'
মনের ভিতর কেমন যেন একটা অস্বস্তি হয় আকাশের। মনের ভিতর থেকে কে যেন আকাশকে বলে,— 'মৃত্যু শয্যায় শায়িত বৃদ্ধকে তুমি ছুঁয়ে কথা দিয়েছ, যে সাগরকে তুমি দেখবে। বৃদ্ধ বাবা তোমাকে তার ছেলে ভেবে অনেক ভরসা করে তোমায় কথা গুলো বলেছে। তোমার কাছ থেকে কথা পেয়ে, তোমাকে বিশ্বাস করে পরম নিশ্চিন্তে মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে ওপারের ডাকের জন্য অপেক্ষা করছে। কারণ, বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত যে তুমি সাগরকে দেখবে।'
আকাশ মাথা নাড়িয়ে মন থেকে কথা গুলো সরানোর চেষ্টা করে, কিন্তু আরো যেন চেপে বসে আকাশের মনের ভিতর।

দুলতে থাকা গাছ গুলোর দিকে তাকিয়ে আকাশের মনে হয় কারা যেন বিদ্রুপ করার দৃষ্টি নিয়ে অন্ধকার থেকে দেখছে। গাছের অন্ধকারে জোনাকীর আলো দেখে একটা অস্বস্তি হয় আকাশের। নিজের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে মনের ভিতরের বক্তাকে বলে,— 'সাগর বিবাহিতা। একদিন না একদিন ওর স্বামী ফিরে আসবে। তাছাড়া মৃত্যু শয্যায় দিন গোনা বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মিথ্যা আশ্বাস না দিয়ে আমার উপায় ছিলো না। আমি একজন ডাক্তার, আমিও মানুষ।'
একটু থেমে আবার মনে মনে বলে,— 'হ্যাঁ। আমি অবশ্য আর্থিক সাহায্য করতে পারি সাগরকে। কিন্তু সাগর আমার থেকে কোন রকম সাহায্য গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না।'

ভিতরের মানুষটা আকাশকে আবার বলে,— 'সাগর বিবাহিত বলে তুমি দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছ কারণ সাগরের থেকে তোমার কিছুই পাওয়ার নেই। কিন্তু সম্পর্কটাই সব? তার বাইরে মানুষ মানুষের জন্য কিছু করতে পারে না, মানুষকে সাহায্য করতে পারে না? কিন্তু সাগর যদি বিবাহিতা না হোত তাহলে? তখনও কি একই কথা বলতে? তুমি জোর দিয়ে বলতে পারো যে, সাগর কে তোমার ভালো লাগেনি?
আকাশ নিজের মনে মনেই বলে,— 'কিন্তু আমি কি কবতে পারি, আর সাগর আমার সাহায্য নেবেই বা কেন?'
ভিতরের মানুষটা আকাশকে আবার প্রশ্ন করে,— 'যে মেয়েটা নিজের আশা স্বপ্নের বলি দিয়ে হাসি মুখে অপরের সেবা করে গেল নিস্বার্থে, তার স্বামী যদি কোন দিন আর ফিরে না আসে? কি হবে এই নিস্পাপ মেয়েটার? মুকুন্দর মতো শয়তান গুলো ছিঁড়ে খাবে একে। একটু একটু করে শেষ হয়ে যাবে সাগর। তখনো কি তুমি নিশ্চিন্ত মনে সাগরকে উপেক্ষা করে থাকতে পারবে? একবারও কি মনে হবে না যে, তুমি অনেক কিছুই করতে পারতে অথচ করোনি।'
আকাশের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কথাটা,— না না,- তা কখনোই হতে পারে না।
আকাশ মনে মনে ভাবে,— 'অদ্ভুত টান আছে মেয়েটার মধ্যে। কেমন যেন মনের ভিতর ঢুকে আসে, দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। সাগরের মতো মেয়েদের ভালো না বেসে থাকা যায় না, অথচ এরকম একটা মেয়েকে তার স্বামী দূরে সরিয়ে রাখে কি করে?'

মনটা খারাপ হয়ে যায় আকাশের। বৃদ্ধকে দেওয়া কথা গুলো মাথার মধ্যে ঘোরা ফেরা করতে থাকে। একটা কেমন যেন অপরাধ বোধ কাজ করে মনের মধ্যে। চাঁদের দিকে তাকায় আকাশ।

দূর আকাশে রূপালী চাঁদের সামনে দিয়ে হাল্কা তুলোর মতো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ গুলো ভেসে যাচ্ছে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে আকাশের রক্তিমের কথা মনে পড়ে।
রক্তিম বলেছিলো,— 'যখন খুব মন খারাপ লাগবে, হতাশ লাগবে বা নিজেকে অসহায় মনে হবে তখন বেশী করে গান শুনবি। যে গান তোর ভালো লাগে। দেখবি ভালো লাগবে। না হয় রাত্রে বেলা একা, ভেসে যাওয়া মেঘের মধ্যে দিয়ে চাঁদের দিকে অথবা তারা ভর্তি ঘন নীল আকাশের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকবি। দেখবি মন ভালো হয়ে গেছে। জীবন দর্শনের অনেক জটিল প্রশ্নের চুলচেরা উত্তর পেয়ে যাবি।'
একটু থেমে আবার বলেছিলো,— 'আমার অবশ্য শুধুমত্রে চাঁদের দিকে তাকাতেই ভালো লাগে। তারা ভর্তি আকাশের দিকে তাকিয়ে একসময় আমার খুব ভালো লাগতো, মনে হোত কুমারী রাতের গলায় হীরের হার। কিন্তু আজ সেই তারায় ভরা আকাশ দেখতে কেমন যেন ভয় ভয় করে। মনে হয় যেন এক সর্বগ্রাসী দৈত্য তার হাজারটা চোখ মেলে আমায় গিলতে আসছে।'

কখন যে সাগর এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে আকাশ বুঝতে পারে নি। সাগর আকাশকে আকাশের দিকে একমনে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করে,— ঘুমোবেন না?
আকাশ ঘাড় ঘুরিয়ে সাগরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে,— হ্যাঁ যাবো। আসলে অনেকদিন পরে এভাবে চাঁদ দেখছি। ছোট বেলার কথা মনে পড়ছে।
সাগর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে,— একটা কথা বলব?
— হ্যাঁ বলুন।
— আপনাকে খুব বিপদে ফেলে দিলাম তাই না? — সাগর ইতস্তত করে বলে।

অবাক হয়ে আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— কেন বলুন তো?
মনে পড়ে গেছে এরকম ভাবে আবার বলে,— ওহ্ আপনার শ্বশুরমশাইয়ের কথা বলছেন?
সাগর ক্ষমা চাওয়ার মতো করে বলে,— আপনি কিছু মনে করবেন না। আসলে বাবা হয়তো বুঝতে পারছে যে চলে যাবে। তাই আমার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

আকাশ মনে মনে বুঝতে পারে সাগর সেইসব মানুষের দলে যারা শতকষ্টের মধ্যেও কারুর কাছ থেকে সাহায্যের প্রত্যাশী নয়। অপরের সাহায্য বা দয়া নেওয়াতো দূরের কথা, কাউকে নিজেদের কষ্ট মুখ ফুটে বলতেও কুণ্ঠা ও বিব্রত বোধ করে।

ভালো লাগাটা বেড়ে যায় আকাশের সাগরের প্রতি। সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে আকাশ বলে,— আপনি শুধু শুধু ভাবছেন। আমি কিছুই মনে করিনি।
একটু থেমে আকাশ আবার বলে,— একটা কথা জানার বড়ো কৌতুহল হচ্ছে।
সাগর অন্যদিকে তাকিয়ে বলে,— আমি কে?
আকাশ কথা না বলে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকে।
— আমি জানি। আজ দুপুর থেকেই আপনার মাথায় এই প্রশ্নটা ঘুরছে। — সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে।
বুদ্ধিমতী সাগরের কাছে ধরা পড়ে গেছে বুঝে আকাশ চুপ করে থাকে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে সাগর। তারপর বলে,— আপনাকে আমার ভালো লেগেছে তাই বলছি, আমার সাথে কোনদিনই ওনার ছেলের বিয়ে হয়নি। উনিও আমার শ্বশুরমশাই নন।
আকাশ উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে,— সে আমি বুঝতেই পেরেছি। কিন্তু এখানকার লোকেরা সেটা জানে না?
— না, ওনার ছেলেকে কোনদিন দেখেনি এখানকার লোকেরা। — সাগর খুঁটিতে হেলান দিতে দিতে উত্তর দেয়।
— এখানকার সবাই জানে আমি আপনার স্বামী। আমি তো আজ বাদে কাল চলে যাব। ওনার ছেলেও একসময় ফিরে আসবে। তখন?
— উনি আর কোনদিনই ফিরবেন না। — নির্বিকার মুখে বলে সাগর।
আকাশ মনে মনে চমকে উঠে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সাগর নিজের থেকে আবার বলে,— উনি অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, এখানে আসার আগেই। বাবা সেটা জানে না। ইচ্ছা করেই বাবাকে বলিনি। মনে হয়েছিল সন্তানের মৃত্যুর খবর পেয়ে যদি কিছু হয়ে যায়। ক'দিনই বা বাঁচবে, অন্তত একটু শান্তিতে বেঁচে থাকুক এই ভেবে, যে, তার ছেলে একদিন ফিরবে। তাছাড়া সেদিন এই অন্ধ সন্তান হারা অসহায় বাবাকে দেখে খুব মায়া হয়েছিল। তাই মুখের ওপর বলতে পারিনি যে তার একমাত্র সন্তান এই পৃথিবীতে আর নেই। সেদিন থেকে এই বৃদ্ধ বাবাকে বুকে করে যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি সন্তানের কষ্ট দুর করতে। আর মাঝে মাঝেই মনগড়া মিথ্যে চিঠি পড়ে আশ্বাস দিয়েছি, আশা বাড়িয়েছি যে, তার ছেলে বেঁচে আছে এবং খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। একটু থেমে আবার বলে,— আমার মধুসূদন আপনাকে এখানে পাঠিয়ে খুব উপকার করেছে আমার। আজ কালের মধ্যেই হয়তো চলে যাবে বাবা। একটু শান্তিতে মরতে পারবে এই ভেবে, যে, তার ছেলে ফিরে এসেছে। মৃত্যুর সময় তার ছেলে তার পাশে আছে। এই কারণেই

বোধহয় মধুসূদন আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন।
কথা গুলো বলে সাগর শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।
— কিন্তু এটাতো বৃদ্ধ মানুষটার প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করা হোল। তার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকানো হোল না কি? এটাতো অন্যায়। — সাগরকে বোঝানোর মতো করে কথা গুলো বলে আকাশ।
— নিশ্চয় অন্যায়। আমি মানছি, যে মানুষটা আমাকে বিশ্বাস করেছে মেয়ে বলে, তাকে আমি ঠকিয়েছি। কিন্তু কার স্বর্থে? তারই মঙ্গলের জন্য। এতে আমার তো কোন স্বার্থ নেই। পাপ হলে তো আমার হবে, কিন্তু তাতে কারুর ক্ষতি তো হোল না, বরং ভালোই হোল। আমার কোন অন্যায় কাজের জন্য কাকর ক্ষতি না হয়ে বরং যদি কোন মানুষের মঙ্গল হয়, তাহলে সেই অন্যায় আমি বার বার করতে রাজী। কারণ আমি জানি আমি যেটা করেছি তা মানুষ বা জীবের মঙ্গলের জন্যই। -- দৃঢ় গলায় বলে সাগর।
আকাশ সাগরকে জিজ্ঞাসা করে,-- কিন্তু এটা নীতি বিরুদ্ধ কাজ নয় কি?
সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে,— নীতির সংগাটা আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারেন?
আকাশ তাকিয়ে থাকে সাগরের মুখের দিকে। সাগর আবার প্রশ্ন করে,- নীতি কি?
কয়েক মুহূর্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজেই আবার উত্তর দেয়,— মানুষের মঙ্গলের জন্যই নীতি, নীতির জন্য মানুষ নয়। যে নীতি মানুষের স্বার্থের পরিপন্থি, যে নীতি মানুষকে ব্যথা দেয়, আঘাত দেয়, মানুষের ক্ষতি করে সেটা কোন নীতিই নয়। ছোট বেলায় আমরা সবাই পড়েছি, শুনেছি যে, সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলিও না, মানুষের উপকার করিবে, মানুষকে কষ্ট দিওনা, এরকম আরো কতকিছু। কিন্তু আপনি বলুন তো, শুধুমাত্র পুঁথিগত নীতির শিক্ষা বা গুরুজনদের কাছ থেকে শোনা নীতির শিক্ষা নিয়ে অথবা কোন নির্দিষ্ট একটা বা কিছু নীতিকে সামনে খাড়া করে এবং সেটাকে কোন দিন কোন অবস্থাতেই ভাঙব না এইরকম অনমনীয় মনোভাব রেখে কি জীবনের পথে চলা যায়? জীবনে চলার পথে মানুষের নীতি আপনা আপনি তৈরী হয় নিজের বিবেকের কাছ থেকে, কারণ আমাদের বিবেক কখনো মিথ্যা বলে না। জীবনের কোন প্রয়োজনের মুহূর্তে বা সংকটের মুহূর্তে কেউ যদি তার বিবেককে প্রশ্ন করে, কি করা উচিৎ, সেখান থেকে যে উত্তর পাওয়া যায় সেই অনুযায়ী কাজ করলে একটা নীতির জন্ম হয়। নিজের বিবেকের কাছ থেকে জেনে নেওয়াটাই আসল নীতি। আবার কেউ যদি কোন প্রচলিত নীতি বা তার মনগড়া নীতি আঁকড়ে থেকে পথ চলে, তবে তা অনেক ক্ষেত্রেই জীবনের মঙ্গলের কাজে আসে না, সে নীতির কোন মূল্য নেই। যারা বোঝে না তারা এই নীতি সর্বস্য মানুষ গুলোকে নিয়ে হৈচৈ করে। আসলে কিন্তু এই নীতি সর্বস্য মানুষ গুলো অন্তঃসার শূন্য এবং মনের দরজা জানালা বন্ধ। কেন জানেন? কারণ প্রয়োজন অনুযায়ী নীতি আবার বদলায়ও। পুরানো নীতির জায়গায় নতুন নীতি গ্রহণ করতে হয় জীবের মঙ্গলের জন্যই। আপনি নিশ্চই ছোট বেলায় সেই সাধুটার গল্প পড়েছেন, যার নীতি ছিল সত্য প্রতিষ্ঠার এবং সে প্রতিজ্ঞা করেছিল জীবনে কোন দিন মিথ্যার আশ্রয় নেবে না। একদিন একটা লোক কিছু ডাকাতের ভয়ে সাধুর ঘরে এসে আশ্রয় চায় এবং সে সাধুকে বলে ডাকাতরা তাকে প্রাণে মেরে ফেলবে। সাধু লোকটিকে পাশের ঘরে লুকিয়ে থাকতে বলে। কিন্তু ডাকাতরা এসে যখন সাধুকে লোকটার কথা জানতে চায় তখন সাধু মনে মনে ভাবে, সে যদি ডাকাতদের কাছে লোকটির কথা না জানায়

তাহলে তার মিথ্যাচার করা হবে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়ে যাবে। এই ভেবে সেই সাধু ডাকাতদের বলে দেয় যে লোকটি পাশের ঘরে আছে। ডাকাতরা লোকটিকে ধরে নিয়ে যায় ও প্রাণে মেরে ফেলে। সেদিন সাধুর সারা জীবনের অর্জিত পূণ্য পাপে পরিণত হয়েছিল দেবতাদের শাপে। কারণ মানুষের চাইতে নীতি বা কোনকিছুই বড়ো হতে পারে না।
আকাশ তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে।
একটু থেমে সাগর বলে,— এবার বলুনতো, আমি কোন অন্যায় করেছি কি?
আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— না, আপনি কোন অন্যায় করেন নি, বরং খুব ভালো লাগলো আপনার মুখ থেকে এই কথা গুলো শুনে। আমার বাবাও একই কথা বলতেন। আপনার প্রতি আমার কৌতুহল আরো বেড়ে যাচ্ছে।
একটু থেমে আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— আচ্ছা আপনার স্বামী কোথায়?
একটু চুপ করে থেকে হাতের শাঁখা পলা গুলো দেখতে দেখতে বলে,— আমার সাথে কোন দিনই কারুর বিয়ে হয়নি। আমি আজও কুমারীই আছি।
আকাশ মনে মনে আর একবার চম্‌কে উঠে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে।
সাগর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলে,— একথা জানে শুধু বাবা, এখানকার মাষ্টর মশাই আর ওনার স্ত্রী, আর আমার মধুসূদন। আজ জানলেন আপনি। খুব অবাক হচ্ছেন তাই না?
অবাক দৃষ্টিতে আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— কিন্তু এই সিঁদুর, শাখা পলা! এগুলো তাহলে কিসের জন্যে?
সাগর দুঃখের হাসি হেসে বলে,— সে অনেক কথা, অনেক সময় লাগবে বলতে।
একটু থেমে বলে,— সবাইকে সব কথা বলা যায় না। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয়েছে সব কিছু বিশ্বাস করে বলা যায়। জানেন তো, একটা মানুষের সাথে অনেক বছর ঘর করেও মনে হয় মানুষটা কতদূরের, কেমন যেন অপরিচিত। আবার এমনও হয়, যে, অচেনা একটা লোককে দেখে মনে হয় যেন কতদিনের পরিচিত। আমার মধুসূদন এই প্রথম কোন সত্যিকারের বন্ধুকে আমার কাছে পাঠিয়েছে, তাই আপনার যাওয়ার আগে আপনাকে সব বলব। কিন্তু অনেক রাত হোল, আজ থাক্। চলুন।
— চলুন।
— আর একটা কথা বলব?
— হ্যাঁ বলুন।
সাগর হেসে হেসে বলে,— আপনাকে আমার মধুসূদন পাঠিয়েছে আমার কাছে। তাই আমি আপনাকে ঠাকুর বলে ডাকব। আর যদি অনুমতি দেন তবে তুমি করে বলব। রাগ করবেন না তো?
আকাশ হেসে বলে,— না, বরং খুশীই হব।

সাগর একটু এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে পিছন ঘুরে জিজ্ঞাসা করে,— ও হ্যাঁ, তুমি ওষুধ খেয়েছ না দেবো।
আকাশ এই প্রথম 'তুমি' ডাকটা শুনে এক মুহূর্তের জন্য হক্‌চকিয়ে গিয়ে পর মুহূর্তেই উত্তর দেয়,— না জ্বর এখন নেই। যদি রাত্রে আসে তাহলে খাবো। তবে দরকার পড়বে না বলে মনে হয়।

সাগর এগিয়ে এসে আকাশের কপালে হাত দিয়ে দেখে বলে,— ঠিক আছে। আর জেগে থেকো না। যদি জ্বর আসে তাহলে আমাকে ডেকো রাত্রে। বাবার জন্য রাত্রে আমাকে অনেকবার উঠতে হয়। সংকোচ কোর না।
আকাশ চুপ করে থাকে।
সাগর এগিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে যায়।
আকাশ চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভাবে,— 'কোনটা বেশী সুন্দর, চাঁদের রূপ না সাগরের মন?'

(৪৬)

অন্ধকার ঘরে বিছানায় শোয়া নিদ্রাহীন আকাশের চোখে বার বার সাগরের মুখটা ভেসে ওঠে। আকাশ মনে মনে ভাবে,— 'মানুষের মন যদি সুন্দর হয় তাহলে তার সবকাজই আরোও সুন্দর। যত দেখছি ততই ভালো লাগছে মেয়েটাকে। অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় কতো আলাদা। হাসি মুখে অপরের জন্য করে যাচ্ছে, অথচ নিজের জন্য কোন চাহিদা নেই।'
নিজেকে প্রশ্ন করে আকাশ,— 'সত্যিই কি নিজের জন্য কোন চাহিদা নেই সাগরের? প্রতিটা মানুষের বিভিন্ন রকম আশা, স্বপ্ন আছে। সাগরও নিশ্চই তার ব্যাতিক্রম নয়? কিন্তু দেখলে তো বোঝা যায় না?'
আকাশ নিজেই আবার মনে মনে উত্তর দেয়,— 'আসলে এরা বড্ড চাপা। অন্তরে যদি গুমরে গুমরে মরেও যায় তাহলেও এরা মুখে তাদের যন্ত্রনাটা প্রকাশ কবতে পারে না। মুখে হাসি নিয়ে নীরবে চোখের জল ফেলে।'
আকাশ নিজেকে আবার প্রশ্ন করে,— 'কিন্তু মনের মানুষের কাছেও কি এরকমই নীরব থাকে? নাকি হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়ে সব কিছু উন্মুক্ত করে দেয়?'

আকাশ মনে মনে চিন্তা করে,— 'সাগরের অদ্ভুত সুরেলা গলা, ক্লাসিকাল বেস। মুখে কেমন একটা বুদ্ধি মত্তার প্রশাধনেব আভা। চেহারায় কেমন একটা নারী সুলভ কোমলতা, চপলতা ও অবলা ভাব। সবকিছু ঠিক গুছিয়ে বলা সম্ভব নয়। এককথায় অসাধারণ। আকাশের মনে হয় ওর কথায়, ঠোটের কোনায় দুষ্টুমি ভরা বাঁকা হাসিতে, বিদ্যুতের ঝিলিক্ ভরা চোখের তারায়, ওর ব্যবহারে এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যেগুলো ভীষণ ভাবে আকর্ষন করে। রীতিমত দুর্লভ। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সাগরকে দেখে আকাশের যেটা মনে হয়েছে, সোজা কথায় বলতে গেলে, বলতে হয় যে সাগরের মত বা ওর চেয়ে বেশী নারীত্ব আকাশ এর আগে কোন নারীতে দেখে নি।'
আকাশ নিজেকে প্রশ্ন করে,— 'নাহ্ সাগরের ওপর কেমন যেন একটা টান মনে হচ্ছে, ভালো লাগাটা বাড়ছে নাকি? সাগরের কথা মাথা থেকে সরাতে পারছি না কেন?'
আকাশ নিজেই নিজেকে বলে,— 'তাড়াতাড়ি করে এখান থেকে পালাও তুমি, নাহলে বিপদে পড়বে। সুলেখার ঘটনায় শিক্ষা হয়নি তোমার? কত কষ্ট পেয়েছ বলোতো? আবার সেই একই জালে জড়াবে। তাছাড়া সাগর কে কতটুকু চেনো তুমি? সাগরকে যা ভাবছ তা তো নাও হতে পারে। হয়তো অন্য কোন ঘটনা লুকিয়ে আছে এর পিছনে। যা তুমি ভাবতেও পারছ না।'
আকাশ মনে মনে ভাবে,— 'কিন্তু বৃদ্ধ না মারা গেলে চলে যাওয়াটাও তো ভালো দেখাবে না। আজ সকালে চলে গেলেই ভালো হোত।'

পরক্ষণেই বৃদ্ধকে দেওয়া কথা গুলো কাঁটার মতো বেঁধে আকাশের মনে। আকাশকে নিজের মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে,— 'এতো কাপুরুষ তুমি? একটা নিস্পাপ মেয়ের দায়িত্ব তুমি নিতে পারো না? এখনতো সাগর বিবাহিত নয়, তাহলে পালিয়ে যাচ্ছ কেন?'
আকাশ নিজেই মনে মনে উত্তর দেয়,— 'সাগরকে শুধুই ভালো লেগেছে। একটা ভালো মানুষকে তো সবারই ভালো লাগে। কিন্তু ভালো লাগা আর ভালোবাসার মধ্যে অনেক তফাৎ। জোর করে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো কাউকে ভালোবাসা যায় না।'

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ কপালে হাতের হাল্কা স্পর্শ পেয়ে মনে মনে চম্‌কে উঠে আকাশ বুঝতে পারে সাগর আকাশের কপালে হাত দিয়ে গায়ে জ্বর আছে কিনা অনুভব করার চেষ্টা করছে। আকাশ চোখ বুজে ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকে।

সাগর হাতের তালু দিয়ে আলতো করে আকাশের কপালে স্পর্শ করে আবার হাতের উল্টো পিঠ কপালে ঠেকায়। পায়ের কাছে রাখা চাদরটা খুলে আকাশের শরীরে আস্তে করে চাপা দিয়ে কয়েক মুহূর্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার ভিতরের ঘরে চলে যায়।

ভিতরের ঘরের দরজা বন্ধ করার হাল্কা শব্দে আকাশ চোখ মেলে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে,— 'সাগর কি সত্যিই কোন মানুষ, নাকি ছোটবেলায় গল্পে পড়া শাপভ্রষ্টা স্বর্গের কোন নারী, দেবতাদের অভিশাপে মর্ত্যে এসেছে ভোগকাল কাটাতে জীবের সেবা করার জন্য?

(৪৭)

সূর্য্যদয়ের আগে লাল আবির ছড়ানো আকাশের নীচে পাখীদের কলরব মুখবিত প্রকৃতির বুকে হাওয়ায় দুলতে থাকা চারিপাশে সবুজ পরিবেশ। দুচোখে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে দেখতে দেখতে হেঁটে চলেছে আকাশ।

রাস্তার ডান দিকে বাঁক নিয়ে পুকুর পারের কাছে স্নান সেরে কলস কাঁকে, সিক্ত খোলা চুল এলিয়ে, শরীরে নানা রকমের ঢেউ তুলে হেঁটে আসা সাগরের সাথে দেখা হয়ে যায়। মুহূর্তের জন্য আকাশের মনে হয় কোন জীবন্ত পদ্ম যেন সবে পাপড়ি মেলেছে। কানের পাশে গালের সাথে সেঁটে থাকা বাঁকা চুল গুলো থেকে তখনও জল গড়িয়ে পড়ছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য আকাশ কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে — কি বলবে, কি ভাবে কথা শুরু করবে, মাথার মধ্যে সব গোলমাল পাকিয়ে যায়।

গায়ের ভিজে শাড়ীটা ভালো করে টেনে বুকে চাপা দিয়ে টানা টানা সুগভীর বড়চোখের দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— এত ভোরে কোথায় চললে ঠাকুর?
আকাশ নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে উত্তর দেয়,— বৌ ঠাকুরাণীকে খুঁজতে।
— দেখো আজ যেন তোমায় আবার না ভূতে ধরে। — চোখ বড় বড় করে সাগর বলে।
আকাশ ওপরের দিকে তাকিয়ে বলে,— গত কালের মতো মধুসূদন বাঁচাবে।
আকাশ এবার সাগরকে পাল্টা প্রশ্ন করে,— তা তুমি কোথা থেকে আসছ, কাজল ধোয়া বেদনার অশ্রু মেখে, নাকি লিপস্টিক মেশানো অশ্রু মেখে? গায়ের রঙটাতো লাল পদ্মের মতো হয়ে গেছে।
লজ্জায় মুখ লাল হয় যায় সাগরের। লাজুক ভাবে বলে,— না, নদীতে গিয়েছিলাম।

সাগরের মুখ দেখে আকাশ বুঝতে পারে সাগর লজ্জা পেয়েছে। আকাশ অন্য দিকে কথা ঘুরিয়ে বলে,— এত ভোরে স্নান করে ভিজে কাপড়ে এভাবে যাচ্ছ, ঠাণ্ডা হাওয়ায় জ্বর এলে কে দেখবে?

সাগর হেসে উত্তর দেয়,— যতক্ষণ তুমি আছো তুমি দেখবে আর তুমি চলে যাওয়ার পর আমার মধুসূদন দেখবে।

আকাশ বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলে,— তা অবশ্য ঠিক। বিশ্ব প্রেমিক মধুসূদন আবার মহিলাদের কষ্ট সহ্য করতে পারে না, তাতে যদি আবার অল্প বয়সী লাল পদ্মের মতো সুন্দরী হয়। সেবা করার জন্য প্রাণ উথলে ওঠে।

— দেখো ঠাকুর ভালো হবে না বলছি। — কপট রাগ দেখিয়ে বলে সাগর।

এবার শাসন করার ভঙ্গীতে বলে,-- তোমার না কালকে জ্বর এসেছিল? এত সকালে ঠাণ্ডা হাওয়ায় তোমার যদি আবার জ্বর আসে!

আকাশ হেসে উত্তর দেয়,— যতক্ষণ এখানে আছি তুমি দেখবে আর যখন চলে যাব তখন মধুসূদন দেখবে।

আপসোসের সুরে আবার বলে,— নাহ্, মধুসূদন আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।

একটা কোকিলের ডাক শুনে ওপরের দিকে তাকিয়ে কোকিলটাকে খোঁজার চেষ্টা করতে করতে বলে,— সুন্দরীও নই, আর পদ্মের মতো গায়ের রঙও নয়।

— আমি তোমার সাথে কথা বলব না। -— মিথ্যে রাগ দেখিয়ে সাগর এগিয়ে গিয়ে পিছনে ফিরে বলে,— তাড়াতাড়ি ফিরো।

আকাশ হেসে মাথা নাড়ায়।

সাগরের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে আকাশ। সাগরের দেহের দোলায় চুল গুলো সাপের মতো দুলছে। সাগরের হেঁটে যাওয়ার ধরন দেখে, রক্তিমের লেখা একটা কবিতা মনে পড়ে যায় আকাশের। আকাশ মনে মনে হাসে,— 'এখানেও রক্তিম! — রক্তিমরা সত্যিই হারায় না। এরা না থেকেও থেকে যায় মনের ভিতর, ঘোরা ফেরা করে সর্বদা। কারণ, ওদের নাম যে, রক্তিম।' অস্ফুট স্বরে আকাশ কবিতাটা আপন মনেই বলতে থাকে,—

'চলার তালে চম্‌কে ওঠে তোমার দেহের ভাঁজ,
পায়ের ছোঁয়ায় ফুটে ওঠে যৌবনেরই আঁচ।
গগন তলে, সবুজ মাঝে, ঝিলিক্ মারা কাচ।।

রৌদ্র ছায়ায় ছিট্‌কে বেরোয় উন্মাদনার তাপ,
তোমার চলার ধরনটা ঠিক, যেন বাঁকা সাপ।

ঝরা পাতা করুন নয়নে তোমার পানে চায়,
আনতে ফাগুন, ভেসে যাওয়া মেঘ, কোন দেশেতে যায়।

ভোরের বাতাস সুর তুলে যায়, কোকিল ধরে গান,
ঘাসের ওপর শিশির কণা, কত যেন ম্রিয়মান।
সবুজ পাতায় রবি হাসে, মন করে আনচান।।

পিছনে ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে,— সাগরের গায়ের রঙ বহু মেয়ের কাছেই ঈর্ষনীয়।

এর আগেও আকাশ নিজেকে বারকয়েক প্রশ্নটা করেছে। এখন আবার একবার নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে,— 'কয়েকদিন যাবৎ এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছি। তাই শহরে মহিলাদের মুখ গুলো দেখতে পাচ্ছিনা বলেই হয়তো সাগরকে স্বপ্নের সেরা সুন্দরী বলে ভুল করছি।'
আকাশ মাথা নাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজেই নিজেকে আবার উত্তর দেয়,— 'কিন্তু এতো শুধু সুন্দরী অসুন্দরীর ব্যাপার নয়। সাগরের মতো কমনীয় ভাবে হাসতে, কথা বলতে, টানা টানা কাজল কালো বড়ো চোখের পাতা নাচিয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে মিষ্টি করে ঝগড়া করতে কজন পারে! আমি তো অন্তত কোন দিন কোন মেয়েকে দেখিনি। তাছাড়া সাগরকে না সাজা অবস্থাতেই তো দেখেছি। এমন চোখ ধাঁধানো রূপ যার, তার আবার নতুন করে সাজার কি দরকার!

কাঁছা দিয়ে গামছা পরে, কোমরে একটা কাস্তে ঝুলিয়ে একটা লোককে সামনে কিছুটা দূরে একটা খেজুর গাছে মসৃণভাবে উঠে যেতে দেখে সেদিকে এগিয়ে যায় আকাশ।

(৪৮)

সাগর অকাশের কথা চিন্তা করতে করতে হেঁটে চলে। — 'কি সুদর্শন চেহারা ভদ্রলোকের। কথাবার্তায় মনে হয় ভগবানের ব্যাপারে ঘোর অবিশ্বাসী।'

মেয়েরা বোধহয় একটা জন্মগত প্রতিভা নিয়েই জন্মায়। অল্প আলাপে একটা পুরুষকে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব না হলেও তাদের মনের ব্যাপারে আগাম কিছুটা আঁচ করতে পারে। এটা বোধহয় সৃষ্টি কর্তার একটা ছোট্ট অবদান, যাতে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

সাগর মনে মনে ভাবে,— 'এই মানুষটা ওপরে একটু রুক্ষ হলেও, ভিতরে একটা নরম মন লুকিয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে নিজের মধ্যেই কোথায় হারিয়ে যায়। কেমন যেন একটু ভাব প্রবন। এরা সাধারণত মাঝে মাঝে অবেগ প্রবন হয়ে পড়ে।'
একটা কথা ভেবে সাগরের খ্‌ব অবাক লাগে। মানুষটার সাথে কয়েক ঘণ্টার আলাপ, নাম পর্যন্ত এখনো জানা হয়ে ওঠেনি, অথচ কেন জানিনা বার বার মনে হচ্ছে মানুষটা যেন কতদিনের চেনা, কত আপন। নিজেকেই প্রশ্ন করে সাগর,— 'কেন এমন হচ্ছে?'
নিজের মনের ভিতর থেকে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে।

সাগর হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির সামনে এসে উঠোনের বেড়ার দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গফুর আর করিমকে দাওয়ায় বসে থাকতে দেখে।

গফুর আর করিম সাগরকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলে,— পেন্নাম মা জননী।

সাগর বুকের কাপড়টা ঠিক করে এগিয়ে আসতে আসতে বলে,— কি ব্যাপার গফুর! এতো সকালে?
— কাল আমি ক্ষেতে কাজ করতে যেতে পারবো না। তাই তোমারে বলতে এলাম গো। — ইতস্তত করে বলে গফুর।
সাগর কলসীটা দাওয়ায় রাখতে রাখতে বলে,— কেন গফুর, কালকে কি আছে?
গফুর হাত জোর করে বলে,— কাল যে আমার বিটির বিয়া।
সাগর অবাক হয়ে বলে,— তোমার মেয়ের বিয়ে! কই আমাকে বলোনি তো আগে?

গফুর মাথা নীচু করে বলে,— আমরা বেজাত, আপনি তো আর যেতেন না, তাই বলি নাই আপনারে।

গফুরকে মাথা নীচু করে থাকতে দেখে সাগর এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে গফুরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্নেহ সুলভ গলায় বলে,— আমার দিকে তাকাও।

যেন বড়ো অপরাধ করে ফেলেছে, এরকম দৃষ্টি নিয়ে সাগরের দিকে চোখ তুলে তাকায় গফুর।

মমতা মেশানো গলায় সাগর বলে,— আর কতদিন অন্ধকার ঘরে বন্দী হয়ে থাকবে গফুর?

সাগরের কথা বুঝতে না পেরে গফুর আবার মাথা নীচু করে। সাগর করিমের দিকে তাকিয়ে আবার গফুরের দিকে তাকায়। বলে,— আমাদের সবার ওপরে অলক্ষে যে মালিক বসে আছে, তার কাছে কোন জাতের বিচার নেই, কোন উঁচু নীচু ভেদাভেদ নেই। সে একটাই। আমরা সবাই তার সন্তান।

গফুর সাগরের দিকে তাকায়। সাগর গফুরকে জিজ্ঞাসা করে,— আচ্ছা গফুর বলোতো, তোমার যে বউ, তাকে তুমি বিবি বলো তো?

গফুর মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে। সাগর আবার বলে,— তোমার বউকে তুমি বলছ বিবি, তোমার ছেলে বলছে আম্মি, কেউ আবার তোমার বউকে চাচী বলছে, কেউ বলছে দিদি, কত লোক কত নামে ডাকছে। তাতে কি তোমার বউ পাল্টে গেল?

গফুর মাথা নেড়ে 'না' বলে।

সাগর জিজ্ঞাসা করে,— তোমার বিবিই রইল তো?

গফুর এবার মুখে বলে,— হ্যাঁ মা।

সাগর গফুরের গায়ে হাত দিয়ে বলে,— ঠিক এরকম করেই আমরা হিন্দুরা তাকে ভগবান বলি, তোমরা বলো আল্লা। এক এক ধর্মের লোক তাকে এক এক নামে ডাকছে। আসলে সে একই।

গফুর আর করিম দুজনেই মাথা নাড়ে। একটু থেমে সাগর করিমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,— ধর্ম মানে কি জানো?

করিম মাথা নাড়িয়ে 'না' বলে।

সাগর করিমকে বলে,— ধর্ম মানে হোল রাস্তা। ওপরে যে মালিক বসে আছে তাকে পেতে হলে এই ধর্মের রাস্তা দিয়েই যেতে হয়। তাহলে বুঝতে পারছো তো, আমরা সবাই একই জায়গায় যাচ্ছি। তুমি যাচ্ছ ওদিক দিয়ে আর আমি যাচ্ছি এদিক দিয়ে। এক একটা ধর্মের লোক এক একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু সবাই সেই মালিকের কাছেই।

একটু থেমে সাগর আবার বলে,— আমি হিন্দু মায়ের কোলে জন্মেছি, তাই আমি হিন্দু, আর তুমি মুসলমান মায়ের কোলে জন্মেছ, তাই তুমি মুসলমান। আর কোন তফাৎ নেই। একজন হিন্দুর শরীরে যা যা আছে, একজন মুসলমানের শরীরেও তাই আছে এবং আমাদের প্রত্যেকের রক্তের রঙও এক।

গফুরের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। বলে,— আমাদের কেউ এমন করে বলে নাই গো মা।

গফুরের দিকে তাকিয়ে, সাগর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে,— ঠিক আছে, আজ বুঝলে তো?

সাগর কথাটা বলে করিমের দিকে তাকায়। করিম ও গফুর দুজনেই এক সাথে 'হ্যাঁ' বলে।

— তোমরাও এবার থেকে সবাইকে তাহলে বোঝাও। — সাগর গফুরের দিকে তাকিয়ে বলে।

গফুর খুব আগ্রহের সাথে সাগরকে জিজ্ঞাসা করে,— তাহলে আপনি আসবেন তো মা জননী?

— কেন যাবো না, নিশ্চই যাবো। — সাগর উত্তর দেয়।

— শুনলাম দাদাবাবু এসেছেন। দাদাবাবু আসবেন তো? — গফুর সাগরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

— নিশ্চই যাবে।

— তাহলে আজ আসি মা জননী। — হাত জোর করে মাথায় ঠেকিয়ে গফুর বলে।

সাগর দুজনের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়,— হ্যাঁ এসো।

গফুর আর করিম চলে যায়। সাগর ওদের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে কলসীটা কাঁকে নিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে,— 'এই সরল সোজা মানুষ গুলোকে যারা নিজেদের সার্থ সিদ্ধির জন্য বিষিয়ে দেয়, তাদের কি শাস্তি হওয়া উচিৎ, তারা কি মানুষ, তাদের কি ঈশ্বর ক্ষমা করে?

(৪৯)

বাইরের ঘরে সুটকেশের ভিতর থেকে ওষুধ বার কবতে করতে আকাশ জিজ্ঞাসা করে সাগরকে,— কাশিটা যেন কখন বাড়ে বললে?

খাটের সামনে দাঁড়িয়ে সাগর বলে,— রাত্রে বেলা।

আকাশ ওষুধের পাতাটা সাগরের হাতে দিয়ে বলে,— যা ওষুধ চলছে চলুক। তার সাথে এই ওষুধটা সকালে একটা রাত্রে একটা খাইয়ে দেখো।

ওষুধটা হাতে নিয়ে সাগর আকাশকে জিজ্ঞাসা করে,— তোমার নামটা কিন্তু এখনো জানা হয়নি ঠাকুর?

সুটকেশ বন্ধ করতে করতে আকাশ জবাব দেয়,— আকাশ মুখার্জী।

সাগব হেসে বলে,— ব্রাহ্মন সন্তান। তা ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে বলেতো মনে হয় না, গায়ত্রী জপতো দূরের কথা।

— ওটা দুর্বল মানসিকতার লক্ষণ। যারা ভাবে তাদের কোন ক্ষমতা নেই, ঈশ্বরই সব। — সুটকেশ বন্ধ করে ঘুরে বসে সাগবের দিকে তাকিয়ে কথা গুলো বলে আকাশ।

— মানুষের ক্ষমতা কতটুকু ঠাকুব? — হেসে জিজ্ঞাসা করে সাগর।

চোখ নাচিয়ে আকাশ বলে,— অনেক। তোমাদের পূজনীয় চন্দ্র দেবতার বুকে পা রেখেছে মানুষ! সেখানে বসবাস করার কথাও ভাবছে।

সাগর হেসে হেসে বলে,— এ তোমাদেব অহংকাব বলছে। চাঁদে গিয়ে পৌছনোটাই শক্তি বা ক্ষমতা প্রকাশের চরম নিদর্শন হতে পারে না। এই পৃথিবীতে এমন অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে, যার কোন ব্যাখ্যা মেলে না। যে অদৃশ্য শক্তি এগুলো ঘটায়, আমরা পূজো, জপ বা ধ্যানের মাধ্যমে তারই আরাধনা করি, তার কাছেই নিজেকে সমর্পন করি।

আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞার হাসি হেসে, বোঝানোর মতো করে বলে,— যে জিনিসে ব্যাখ্যা মেলে না, হয় তার ঠিক মতো বিচার করা হয়নি, আর না হয় ঠিক মতো বিশ্লেষণ করা হয়নি। তাছাড়া তোমরা কেমন স্বার্থপর দেখো, তোমরা ভাবো তোমাদের অলীক শক্তিমান বাবু বোধহয় সবচেয়ে শক্তিধর এবং যা খুশী তাই করতে পারে। তাই তোমরা মানুষকে অবহেলা করে তার জন্য সময় নষ্ট করো, নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ পাওয়ার জন্য এবং নিজ স্বার্থে তোমরা তার পূজো করো। অথচ সেই সময়টা মানুষের সেবার কাজে দিলে অর্থাৎ তোমার কথায় বলি, মানুষ পূজো করলে, বেশ কিছু মানুষ বেঁচে যেত। তোমরা যা

করছ, তা স্বার্থপরতার চরম নিদর্শন।
এক নাগাড়ে কথা গুলো বলে থামে আকাশ। সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসতে থাকে। সাগর তাকিয়ে হাসছে দেখে, আকাশ হেসে, বাইরের দালানের দিকে তাকায়।
সাগর হাসতে হাসতে আকাশকে বলে,— বাবা! তুমি কি রেগে গেছ ঠাকুর। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি বাবাকে ওষুধটা খাইয়ে এসে তোমার দুটো উত্তরই দিচ্ছি।
আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে,— হ্যাঁ, ভালো করে ভেবে এসো।
ভিতরের ঘরের দিকে যেতে যেতে সাগর হেসে বলে,— ভাবার প্রয়োজন নেই ঠাকুর। এ উত্তর আমার ছোট বেলা থেকেই কণ্ঠস্থ।

কথা গুলো বলতে বলতে সাগর ভিতরের ঘরে ঢুকে যায়। আকাশ একটু মুচকি হেসে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে তার থেকে একটা সিগারেট বার করে দালানে বেরিয়ে যায়।

(৫০)

আকাশ দালানের খুঁটিতে হেলান দিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে ফুলে ভরা গন্ধরাজ গাছটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে,— 'এই ফুলের গাছটা দিনের আলোয় কত শান্ত সৌম্য কিন্তু নিষ্প্রাণ, জড়াগ্রস্থ বৃদ্ধর মতো নিরস। সুন্দর কিন্তু রূপ সর্বস্ব। অথচ অন্ধকার নামার সাথে সাথেই এই গাছটাই কত উজ্জ্বল, কত উচ্ছল, কত চঞ্চল, কত প্রাণবন্ত, আবেশ জড়ানো, মাধুরী ছড়ানো এক গুণী শিল্পী।

হাসনুহানার ঝোপটার দিকে আকাশ তাকিয়ে দেখে, থোকা থোকা ফুলে সাদা হয়ে রয়েছে। আকাশের মনে হয়, যেন কোন সদ্য নিদ্রা জাগরিতা এক সুন্দরী, যার ঘুমের আমেজ এখনো কাটেনি। কিন্তু সাঁঝের প্রদীপ জ্বলার সাথে সাথেই সুবাস ছড়িয়ে, ধুসর ওড়না গায়ে জড়িয়ে দুরু দুরু বুকে, অভিসারে যাওয়া এক রূপসী।

সাগর দালানে বেরিয়ে আকাশের কাছে এসে বলে,— এবার বলো।

সাগরের গলা পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আকাশ হেসে বলে,— আমি আর কি বলব? বলবে তো তুমি। ভালো করে ভেবে এসেছ তো?
সাগর ঘাড়টাকে একদম বাঁদিকে হেলিয়ে দিয়ে হেসে বলে,— হ্যাঁ —
তারপর আবার বলে,— তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলি, তুমিতো ডাক্তার। মানুষের দেহ কাটাছেঁড়া করেও দেখেছ। মানুষের শরীর বিজ্ঞান সম্বন্ধে তোমার নিশ্চই ভালো ধারনা আছে। তোমরা যাকে বলো হিউম্যান ফিজিওলজি।
আকাশ মনে মনে চমকে উঠে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে। রহস্যময় হাসি মুখে এনে সাগর আকাশকে বলে,— অবাক হোচ্ছ ঠাকুর?. অবশ্য অবাক হওয়ারই কথা। একটা অজ্ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে যদি ইংরেজী শব্দ বলে। আমি কিন্তু আরো কয়েকটা ইংরেজী শব্দ জানি।
মুহূর্তের মধ্যে আকাশের মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক্ খেলে যায়। আকাশের মনে মনে ভাবে,— 'সাগরের মধ্যে আরোও অনেক কিছু লুকিয়ে রয়েছে, যেটা আকাশ এখনো অনুমান করতে পারেনি।'
আকাশ তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে।

সাগর আকাশের চোখের সামনে হাতটা নাড়িয়ে বলে,— তুমি হাঁ করে দেখবে, না শুনবে?
আকাশ নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,— হ্যাঁ বলো।
সাগর বলতে থাকে,— হ্যাঁ, তাহলে তুমি নিশ্চই জানো, যে, মানুষের শরীরের ভিতর কত রকম আশ্চর্য্য জিনিস আছে এবং প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে, সুক্ষ থেকে সুক্ষতর, যেমন ভিসেরা, টিসু, সেল। তার মধ্যেও আবার কত সুক্ষ ভাগে ভাগ করা রয়েছে, যেগুলো খালি চোখে দেখা যায় না অথচ এদের কার্যকরিতার গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম।
ভিতরে ভিতরে অবাক হলেও মুখে কিছুই হয়নি এরকম ভাব বজায় রেখে আকাশ তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে। সাগর আকাশের মনোভাব বুঝতে পেরে আকাশের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসতে থাকে। আকাশ নিজের মুখটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে।
সাগর আবার বলাতে শুরু করে,— হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এগুলো সব কি অদ্ভুত সয়ংক্রিয় ভাবে অর্থাৎ, অটোমেটিক্যালি কাজ করে চলেছে। তোমরা জানো এটা হচ্ছে, এটা হয়, এবং এইভাবে হয়। কিন্তু কেন হয়, কেন হচ্ছে তার সবকিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যা কি পাও? এরা যদিও প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ করে চলেছে, তবুও একটাকে অন্যটা নিয়ন্ত্রন করছে ও পারস্পরিক একটা বোঝাপড়া আছে। এর কি কোন ব্যাখ্যা পাও?
সাগর একটু চুপ করে। শেষ টানটা দিয়ে আকাশ সিগারেটের টুকরোটা উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সাগর আবার বলে,— সবশেষে বলি, আলটিমেট্লি এদের যে কন্ট্রোল করছে, তাকে কে চালাচ্ছে বা মূলশক্তিটা কি, তার কোন ব্যাখ্যা পাও? তুমি হয়তো বলবে এভাবেই হয়, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করবো কেন হয়? আমি এও জিজ্ঞাসা করবো কে করাচ্ছে? তোমরা যখন কোন একটা রোগের সমস্ত লক্ষন পেয়েও ডায়াগনোসিস্ করতে পারো না, তখন ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বলে দাও সিন্ড্রোম, আর কারণ দেখাতে গিয়ে বলো ইডিওপ্যাথি। আরোও শুনতে চাও? তাহলে শোন, মস্তিষ্কের কোষ গুলো কেমন করে কাজ করে, তার সবটার স্পষ্ট ব্যাখ্যা তোমাদের কাছে আছে? হাইপোথ্যালামাস্ শব্দটার সাথে তো তুমি খুবই পরিচিত।
আকাশ অবাক চোখে সাগরের দিকে পলক্হীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

সাগর আবার বলতে থাকে,— আমরা যা কিছু দেখছি তার ছবিটা আমাদের রেটিনার মধ্যে তো উল্টো করে এসে পড়ে, তা সত্ত্বেও আমরা সোজা দেখি কি করে। তা তোমরা আজও বার করতে পারোনি।
আকাশ সাগরের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে।
সাগর রহস্যময় হাসি হেসে আকাশকে জিজ্ঞাসা করে,— কি ঠাকুর, আমি ঠিক বলছিতো?
কথা না বলে আকাশ হাসি মুখের সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকে।
একটু থেমে সাগর আবার হেসে বলে,— তাহলে ঠাকুর, সবকিছুর ব্যাখ্যা হয়, না বিশ্লেষণ হয়?
এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সাগর আবার বলে,— এবার একটু অন্য ভাবে ঘুরিয়ে বলি। বলা ভালো, এটা অন্যরকম ভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়।
আকাশ কোন কথা না বলে সাগরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।
কয়েক মুহূর্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে কথা গুলো মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে বলে,— এই যে তোমরা সব সময় 'আমি' 'আমি' করো, সব ব্যাপারে বলো, আমি করেছি, আমি বলেছি, আমি গিয়েছি। একবারও কি তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগে না, বা, মনে করার প্রয়োজন বোধ করো না যে, এই 'আমি'টা কি বা কে? কখনো ভেবে দেখেছ?

— প্রয়োজন বোধ করিনি। কারণ এই 'আমি'টা, যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ আমিই। বরং তোমার যদি এবিষয়ে কিছু বলার থাকে বলতে পারো। আমি শুনছি। — উত্তর দেয় আকাশ।
সাগর চুপ করে আকাশের দিকে দু-এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বোঝানোর ভঙ্গীমায় বলে,— ধরো, তুমি কোন কথা বলার চেষ্টা করলে, সাথে সাথে তোমার জিভ, ঠোঁট নড়ে উঠল, তার সাথে তাল মিলিয়ে 'ভোকাল কর্ড' দিয়ে গলার স্বর ফুটে উঠল। তুমি হাঁটতে গেলে, সাথে সাথে পা চলতে শুরু করল, তুমি এবার দৌড়তে গেলে, ওমনি পা দুটো আরো জোরে চলতে শুরু করল। তুমি যাতে পড়ে না যাও, তার জন্য শরীরের বাকী অংশ ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে লাগল, বা, কোন কিছু একটা নিতে গেলে, সাথে সাথে তোমার হাত আর আঙুল কাজ করতে শুরু করল। অর্থাৎ তোমার ইচ্ছা অনুসারে তোমার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাজ করছে। অন্যভাবে বলা যায়, তোমার ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখছে এরা। আরো পরিস্কার করে বলা যায়, তোমাকে যদি মনিব ভাবি, তাহলে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হচ্ছে তোমার ভৃত্য। প্রভুকে তার ভৃত্য প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী, চাহিদা অনুযায়ী, কাজের মাধ্যমে সহযোগীতা করে যথাযোগ্য সম্মান জানাচ্ছে।
সাগরের কথার মাঝখানে বাধা সৃষ্টি করে আকাশ শান্ত ভাবে বলে,— তুমি এতক্ষণ যা কিছু বললে বিজ্ঞানের ভাষায় তার এক কথায় উত্তর হল, 'রিফ্লেক্স এ্যাকশান্' বা প্রতিবর্ত্ত ক্রিয়া। একটু থেমে আকাশ হেসে আবার বলে,— এবার আমি তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলি।
— বলো। — হেসে বলে সাগর।
— এই রিফ্লেক্স এ্যাকশান্ দুরকমের হয়। একটা হোল লোকাল বা পেরিফেরাল রিফ্লেক্স এ্যাকশান্ অথবা ডাইরেক্ট, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ। আর একটা হোল, সেন্ট্রাল রিফ্লেক্স এ্যাকশান্ বা ইনডাইরেক্ট, অর্থাৎ পরোক্ষ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,— ধরো, তুমি একমনে কোন একটা কাজ করছ, হঠাৎ তোমার শরীরের কোন অংশে কিছু একটা অনুভব করলে। তুমি কাজ করতে করতেই অন্যমনস্ক ভাবে তৎক্ষনাৎ শরীরের সেই অংশটাতে হাত দিলে। এটা হচ্ছে, লোকাল বা পেরিফেরাল রিফ্লেক্স এ্যাকশান্। কিন্তু হাত দেওয়ার পরেও যদি কোন কাজ না হয়, এবার যখন তুমি শরীরের সেই অংশের দিকে চোখ দিয়ে দেখলে, যে একটা পিঁপড়ে কামড়ে ধরে বসে আছে, তুমি তাড়াতাড়ি করে পিঁপড়েটাকে ধরে, ফেলে দিয়ে শরীরের সেই অংশে হাত বোলাতে লাগলে, তখন তাকে বলা হয় সেন্ট্রাল রিফ্লেক্স এ্যাকশান্। অর্থাৎ, সেই মুহূর্তে তোমার শরীরের সেই বিশেষ অনুভূতি প্রবন জায়গার নার্ভ বা স্নায়ু, সেন্ট্রাল নার্ভের মাধ্যমে তখনই খবর পাঠিয়ে দিচ্ছে তোমার ব্রেনে হাইপোথ্যালামাসে, যে, এই অনুভূতি প্রবন অংশে কিছু একটা হচ্ছে। সাথে সাথে হাইপোথ্যালামাস তোমার চোখ, হাতকে নির্দেশ দিচ্ছে কাজ করার এবং কি করতে হবে তাও বলে দিচ্ছে। এই শারীরিক ক্রিয়া গুলো কিন্তু ঘটে যাচ্ছে চোখের পলক্ ফেলার জন্য যে সময় লাগে তার চাইতেও অনেক কম সময়ের মধ্যে।
পিঠের ওপর লুটিয়ে থাকা চুল গুলো, হাত দিয়ে খোঁপা করতে করতে সাগর হেসে বলে,— তা তো বুঝলাম কিন্তু একটা প্রশ্নতো এখনো থেকে গেল, হাইপোথ্যালামাসকে কাজ করাচ্ছে কে, কোন শক্তি?
— এটা একটা অটোমেটিক সিস্টেম। মানুষের শরীরের মধ্যে ইনবিল্ট্। এই সিস্টেমটা নিয়েই প্রতিটা মানুষ জন্মায় এবং এই ভাবেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে প্রতিটা প্রাণীর ক্ষেত্রে হয়ে আসছে। মানুষের ভিতরকার জীবনী শক্তি মানুষকে সুস্থ এবং বাঁচিয়ে রাখার জন্য অহরহ নিজেকে এবং

শরীরের সমস্ত যন্ত্র গুলোকে কাজ করিয়ে চলেছে। এটাই বাস্তব এবং এই বাস্তবের উত্তর খোঁজার জন্য অযথা অবাস্তব রহস্য তৈরী করে বা অলীক কিছু কল্পনা করে সময় নষ্ট করাটা মুর্খামি এবং নিরর্থক। আমি বলব এটা অপরিণত মস্তিস্ক এবং দুর্বল চিত্তের লক্ষণ। — বেশ জোরের সাথে রাগত ভাবে বলে আকাশ।

সাগর হেসে বলে,— নিয়ম করে এই যে ঋতু পরিবর্তন হয়, রোজ চন্দ্র সূর্য্য ওঠে, গঙ্গায় জোয়ার ভাঁটা খেলে, গাছে ফুল ফোটে, এগুলোও কিন্তু একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়েই হয়। পৃথিবীতে এরকম আরো অনেক অদৃশ্য সিস্টেম আছে। যাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রকৃতি এবং জীবজগৎ। সেই সিস্টেমটা চালাচ্ছে কে? এমন কোন সিস্টেমের কথা আমায় বলতে পারো, যেটা আপনা আপনি তৈরী হয় বা হয়েছে? যার পিছনে কোন শক্তি কাজ করছে না? ঠাকুর, কোন শক্তি যদি কোন সিস্টেম তৈরী না করে বা না চালায়, তাহলে কোন সিস্টেম তৈরী হতে পারে না, বা চলতে পারে না। এবার, বাস্তবের কথা যখন বললে, তখন বলি, কোনটা বাস্তব আর কোনটা অবাস্তব সঠিক ভাবে কে বলতে পারে ঠাকুর! যার কাছে যেটা সত্যি, তার কাছে সেটাই বাস্তব। এই বাস্তবের বিশ্বাস আসে আবার বিশেষ অনুভূতি থেকে। একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বলি, তোমরা অধিকাংশ এ্যালোপ্যাথিক্ ডাক্তাররা মনে করো তোমাদের চিকিৎসার ধরনটা বা সিস্টেমটা বৈজ্ঞানিক, যুক্তিপূর্ণ এবং বাস্তব সম্মত এবং হোমিওপ্যাথিটা অবাস্তব ও এতে বেশীর ভাগ রোগই সারে না। আবার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বড় ডাক্তাররাও মনে করেন তাদের চিকিৎসাই বাস্তব সম্মত। এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় রোগ পুরোপুরি সারে না। অর্থাৎ তোমাদের দুপক্ষের কাছেই তোমাদের চিন্তাধারাটাই একমাত্র বাস্তব সম্মত। কিন্তু কোনটা সঠিক, বলতে পারবে সেই রোগী, যে, কোন একটা প্যাথিতে চিকিৎসা করিয়ে তার অনুভুতির দ্বারা বুঝতে পেরেছে সেই প্যাথিতে রোগ সেরেছে কিনা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন জনের আবার বিভিন্ন মত থাকতেই পারে। কেউ কেউ কোন একটা প্যাথির কথা বলবে, কেউ বা দুটো প্যাথিরই কথা বলবে। অতএব বাস্তব কি এবং কোনটা এর সঠিক উত্তর এ নিয়ে বিতর্ক আছে। এটাকে আবার বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে, সে অনেক সময়ের ব্যাপার। তার চেয়ে বরং যেটা বলছিলাম সেটাই বলি, হয়তো কিছুটা বোঝা যাবে। তুমি শুনবে কি?

— বলো।

— কি বলছিলাম যেন! — আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে করতে বলে সাগর।

— আমি মনিব আমার হাত পা ভৃত্য।

— ও হ্যাঁ। ভৃত্য অর্থাৎ, আমাদের শরীর, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি। এই শরীর কিন্তু কেবলই একটা নশ্বর, স্থূল এবং জড় পদার্থ মাত্র। এটা কখনোই 'আমি' হতে পারে না, কারণ এর কোন প্রাণ নেই, নিজস্বতা নেই। এই শরীর তখনই সচল হয়, যখন একে পরিচালনা করে সুক্ষ ইন্দ্রিয়। আবার ইন্দ্রিয় কিন্তু 'আমি' নয়, কারণ ইন্দ্রিয় হল মনের দাস। অর্থাৎ মন চালনা করে ইন্দ্রিয়কে। মজার ব্যাপার দেখো, আমাদের এই মনও কিন্তু 'আমি' নয়। বুদ্ধি যতক্ষণ না মনকে কাজ করাচ্ছে ততক্ষণ মন নির্জীবীত, নিস্প্রান বা মৃত। বুদ্ধিকে চালনা করছে কে?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সাগর তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

— তুমি বলে যাও আমি শুনছি। শুনতে ভালো লাগছে। সুন্দর করে জমিয়ে গল্প বলার জন্য একটা বিশেষ ক্ষমতার দরকার হয়। সবাই সেটা পারে না। — বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে আকাশ।

মুচ্‌কি হেসে আগের কথার জের টেনে সাগর বলে,— বুদ্ধিকে চালনা করছে সুক্ষাতি সুক্ষ নিরাকার, জন্ম, মৃত্যু রহিত আত্মা। যাকে কোন ভাবেই দেখা যায় না, ধরা যায় না, দাহ্য করা যায় না, সিক্ত করা যায় না। এই আত্মাই হচ্ছে 'আমি' বা অন্তর্যামী। মজার ব্যাপার হল, কোন কর্মের জন্যই কিন্তু এই আত্মা বা 'আমি' কে কিন্তু দায়ী করা যায় না।

কথাটা বলে সাগর চুপ করে হাসি মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশ গম্ভীর মুখ করে অবাক দৃষ্টিতে সাগরের দিকে তাকায়। সাগরকে ওইভাবে তাকিয়ে হাসতে দেখে, আকাশও হেসে ফেলে। বলে,— এই আত্মাকে চালায় কে? তোমার মধুসূদন নিশ্চই!

সাগর কপালে হাত রেখে বলে,— হায়রে — আমার পোড়া কপাল!

— কথাটা বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর আবার বলে,— কেউ যদি প্রশ্ন করে, সূর্য্য আকাশ থেকে কত দূরে, অথবা চাঁদ তার কিরণ থেকে কত দূরে সেটা যেরকম বোকার মতো শোনাবে, তোমার এই প্রশ্নটাও একই রকম?

— কি, আমি বোকা! — রাগ করার ভান করে বলে আকাশ।

— তুমি শুধু বোকাই নও, একেবারে বুদ্ধু রাম। — কথাটা বলে সাগর আকাশকে জিভ্‌ ভেঙায়। তারপর আবার বলে,— যা বলছি, চুপ করে শোন। এই আত্মাই হচ্ছে একটা শক্তি, আবার শক্তির অংশও বলতে পাবো। অর্থাৎ ঘুরে ফিরে সেই একই কথা, সেই অদৃশ্য মূল শক্তি, বা একটা অনন্ত শক্তি অথবা আদি শক্তি, যাঁর খেয়ালে সৃষ্টি হয় জন্ম, মৃত্যু, অদৃষ্ট। সে সম্বন্ধেও অনেক কিছু ব্যাখ্যা করা যায়। তার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাই সেসব কথা এখন থাক, কারণ, প্রথমতঃ সময়াভাব, দ্বিতীয়ত, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে শোনার মতো ধৈর্য্য এবং মানসিকতা নেই। যারা চাঁদে গেছে, তারাও তোমার আমার মতোই মানুষ, তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রোযজ্য। অর্থাৎ তাদের শরীরেও একই জিনিস আছে এবং একটা অদৃশ্য শক্তি সেই শরীরটাকে চালাচ্ছে। তুমি ডাক্তার বলে শুধু মানব শরীরেরই উদাহরণ দিলাম। একটা শিশু জন্মানোর পরেই, মায়ের বুক থেকে দুধ খাওয়ার যে সাকিং রিফ্লেক্স বা কচ্ছপের বাচ্চা গুলো ডিম ফুটে বেরিয়েই অন্য দিকে না গিয়ে জলের দিকে ছুটে যাওয়ার ব্যাখ্যা তোমরা বার করতে না পেরে বলে দিয়েছ 'ন্যাচারাল ইনস্টিংক্ট'। এরকম আরো কতো আছে।

— তোমার কথা যদি মেনেও নিই, তাহলেও তো আর একটা প্রশ্ন জাগে মনে।

— বলো শুনি!

— এই আত্মাই যদি সব হয়, এই আত্মাই যদি আমি হয়, অন্তর্যামী হয়, তাহলে কিছু মানুষ কষ্ট পাচ্ছে আবার কিছু মানুষ সুখী হচ্ছে কেন? এই বোধটা তো থাকার কথা নয় এবং এই উপকার, সেবা, সাহায্য কথা গুলোর দরকার পড়বে না।

মুখের ওপর ঝুঁকে পড়া কযেকটা চুল কানের পাশে রাখতে রাখতে সাগর বলে,— এই বোধটা আসে দুর্বল ইন্দ্রিয় থেকে। যে মানুষ তার বুদ্ধির দ্বারা মনকে চালিত করে ইন্দ্রিয়কে দমন করতে পেরেছে তার সুখ দুঃখের কোন বোধ নেই। আমরা সাধারণ মানুষ সেটা না। তাছাড়া কর্মফল বলেও একটা কথা রয়েছে।

— তাহলেও তো দুরকম কথা হচ্ছে। আত্মাকে যখন কোন কর্মের জন্য দায়ী করা যায় না তখন কর্মফল কথাটা আসবে কেন? কর্মটা কে করছে?

— তোমার নিরাকার 'আমি'-টা তোমার স্থূল, সাকার 'আমি'-টা কে বিবেকের মাধ্যমে সবসময় ভালোটা করার নির্দেশ দেয়। এবার এই স্থূল 'আমি'-টা কি করবে বা করছে, তার ওপর কর্মফল

নির্ভর করে। আর এই কর্মফল ভোগ করে স্থূল 'আমি'। নিরাকার আমি ভোগ রহিত।
— আত্মাই যখন বুদ্ধিকে চালনা করে তখন মানুষ খারাপ কাজ করবে কেন?
— বুদ্ধি যখন মনকে প্রভাবিত করতে পারে না, মন যখন ইন্দ্রিয়কে প্রশমিত করতে পারে না, তখন মানুষ হিতাহিত জ্ঞান শূণ্য হয়ে অজ্ঞানতার মোড়কে আবৃত হয়ে, বিবেকের কথা না শুনে বা বুঝে, খারাপ কাজ করে। আর সেই কারণেই মনকে, ইন্দ্রিয়কে বশে আনার জন্য দরকার হয় ধ্যানের, পূজোর এবং সেই শক্তির কাছেই নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণের।

বিতর্ক বাড়াতে ইচ্ছা করে না আকাশের। হেসে সাগরকে বলে,— দেখো, মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করার ইচ্ছা আমার কোনদিনই ছিল না, আজও নেই। যদি না সেই বিশ্বাস, মানুষের ক্ষতি করে বা মঙ্গলের পথে অন্তরায় হয়। যার যা বিশ্বাস, সেটা তার কাছেই থাকা ভালো। আমি যেটা বিশ্বাস করি এবং বুঝি সেটা হল, প্রতিটা মানুষ যদি কর্তব্য পরায়ণ ও সেবা পরায়ণ হয়, মনুষত্ব — বিবেক বোধ সম্পন্ন হয়, তাহলে এই পৃথিবীর পরিবেশটাই বদলে যাবে। অন্তত আমার তাই ধারনা এবং আমি নিজেকে সেই ভাবেই তৈরী করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য জানি না কতটুকু সফল হতে পেরেছি বা আদৌ পেরেছি কিনা। আমি শুধু যা চোখে দেখা যায়, হাতে ধরা যায়, অনুভব করা যায়, বুদ্ধিতে, বিজ্ঞানে এবং যুক্তি দিয়ে যার গ্রহণ যোগ্য ব্যাখ্যা মেলে তাতেই বিশ্বাসী। তার বাইরে কোন কিছুতে নয়।
— একটু আগে তুমি বিবেকের কথা বললে। এই বিবেক কি বলতে পারো?
প্রশ্নটা করে সাগর নিজেই আবার উত্তর দেয়,— খুব ছোট করে বলা যায় বিবেক হল, তোমার অভ্যন্তরে অবস্থিত একটা সূক্ষ্ম স্বচ্ছ বোধশক্তি। যা ভালো আর খারাপের পার্থক্য গড়ে তোলে, খারাপের থেকে ভালোকে আলাদা করে, বুদ্ধির দ্বারা মনকে প্রশমিত করে ভালোটা করার নির্দেশ দেয়। এই বিবেক, মন, বুদ্ধি এরাও তো অদৃশ্য, নিরাকার এবং অস্তিত্বহীন। এদের কে যদি মানো, বিশ্বাস করো, তাহলে বাকীটুকুকে তো জোর করে মানব না বলেই না মানা। কোন কিছু বিশ্বাস বা বিচার করতে গেলে, সেটাকে বোঝার দরকার। বোঝার জন্য জানার দরকার হয় এবং জানতে গেলে তার জন্য যেটা দরকার, সেটা হল ইচ্ছা বা আগ্রহের। না জেনে বিশ্বাস করাটা বোকামি আর অবিশ্বাস বা বিচার করাটা অন্যায়। শুধু এই কথা বলে নয়, এটা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আকাশ অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে সাগরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে,— 'মেয়েটাকে যতটা সাধারণ মনে করেছিলাম ততটা সাধারণ নয়। একটা বড়ো কোন ইতিহাস, কোন ঘটনা বহুল অতীত লুকিয়ে রয়েছে।'
আকাশের কৌতুহলটা বেড়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে,— দ্বিতীয় উত্তরটা শুনি?
সাগর কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। শূন্যে দৃষ্টি মেলে বলে,— জানো ঠাকুর, সবাই কিন্তু নিজেদের জন্যই শুধু চায় না। এমন কিছু মানুষ আছে, যারা ঈশ্বরের কাছে অপরের মঙ্গল কামনা করে এবং সব আশা স্বপ্নের চিতা জ্বালিয়ে অপরের প্রতি সেবা, কর্তব্যই করে যায় শুধু, আর মনে মনে ঈশ্বরের কাছে এই পৃথিবীর থেকে মুক্তি কামনা করে, কারণ, তাদের আর নতুন করে কিছু পাওয়ার নেই। তাদের তুমি স্বার্থপর বলবে! আবার অন্যভাবে দেখলে এটা কিন্তু একরকমের স্বার্থপরতা। কারণ, এই সেবা করার মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দানুভুতির সৃষ্টি হয় মনে। ধরো, তুমি কোন একজন অসহায় মানুষের উপকার করলে, তুমি হয়তো মনে মনে ভাবলে, সেই মানুষটার তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ, বা ঋণী থাকা উচিৎ। তোমার এই

বোধ থেকে তখন তোমার অবচেতন বা সচেতন মনে একটা ফলাসক্তি বোধ জন্মায় সেই সাহায্য প্রাপ্ত মানুষটার কাছ থেকে এবং কোন বিশেষ মুহূর্তে সেই লোকটির কাছ থেকে বিনিময়ে আশানুরূপ কিছু না পাওয়া গেলে ক্রোধের উদ্রেক হয়। কিন্তু আমি বলব, তোমারও সেই মানুষটার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। কেন জান? কারণ, তোমার ভিতরে ঈশ্বরের দেওয়া ভালো গুণ গুলোর মধ্যেই আছে এই সেবা, দয়া। আর তুমি তা প্রকাশ করতে পারছ এই মানুষটার জন্যই। আবার দেখ, তুমি কিন্তু কিছুই করছ না, যা করার সে ঈশ্বরই করছেন। অর্থাৎ সেই মানুষটা তার নিজের ভাগ্যের জোরেই বা ঈশ্বরের কৃপায় সাহায্য প্রাপ্ত হচ্ছে। এবার তুমি যদি তাকে সাহায্য নাও করো, তাহলেও কিন্তু তার আটকে থাকবে না। অন্য কেউ এগিয়ে আসবে তাকে সাহায্য করার জন্য। অবশ্য যদি তার ভাগ্যে সাহায্য বা সেবা কিম্বা উপকার পাওয়ার থাকে। এটা পূর্ব নির্ধারিত। কারুব জন্য কোন কিছু আটকে থাকে না। এখানে তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র। আর এই উপকার বা সেবার ঘটনাটা শুধু একটা উপলক্ষ মাত্র। আসলে এই উপলক্ষের মাধ্যমে তোমাকে নিমিত্ত করে ঈশ্বর তোমাকে দিয়ে ভালো কিছু করাতে চাইছে। কারণ, তুমি হয়তো ঈশ্বরের প্রিয়, তুমি হয়তো ঈশ্বরের কাছের মানুষ, তোমার ওপর হয়তো ঈশ্বরের আশীর্বাদ কাজ করছে। তাই তোমাকে দিয়েই সেবা করিয়ে নিজেও তোমার সেবা পেতে চাইছে। অর্থাৎ তুমিও সেই মানুষটাকে সেবার মাধ্যমে আসলে ঈশ্বরেরই সেবা করছ বা অন্যভাবে বলা যায় ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য নিজ স্বার্থে মানুষটার বা মানুষের কিম্বা জীবের সেবা করছ। এটাও তো তাহলে স্বার্থপরতা। সবশেষে এটাই বলব, যে, এই মনভাব নিয়েই প্রতিটা মানুষ মানুষের জন্য, জীবের জন্য সেবা করুক। তাহলেও তো মানুষের এবং জীব জগতের উপকার হবে, মঙ্গল হবে। আর ঈশ্বরেরও সেবা করা হবে। এক সময় দেখবে এই ফলাসক্তি বোধটা আর নেই, স্বার্থপর মনোভাবটাও আর নেই, এগুলো সব গৌণ হয়ে গেছে। অপরের কষ্ট দেখলে, দুঃখ দেখলে তোমারও মন কাঁদবে, তখন সেবা, দয়া, ক্ষমা, উপকার এগুলোই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর মনের ভিতর একটা অদ্ভুত আনন্দানুভুতি বিরাজ করছে। পাওয়ার আনন্দ তো আছেই কিন্তু কেউ যদি মনে কোন দন্দ্ব বা দ্বিধা না রেখে, খোলা মনে কাউকে কিছু দিতে পারে, তার আনন্দও কিন্তু কম নয়, বরং কিছু মানুষের কাছে পাওয়ার চাইতে দেওয়ার আনন্দটা অনেক বেশী। এবার তুমি আমায় বলো, এর পরেও কি আমাদের কোন কিছুর জন্য বা কোন কর্মের জন্য অহংকার করা সাজে? আরো একটা কথা কি জান? এই সেবা করার সুযোগ বা সেবা করার মতো 'মন' সবাই কিন্তু পায় না, এটাও পূর্ব নির্ধারিত। এই 'মন' পাওয়াটাও একটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। কেউ যদি ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করে, তাতে ঈশ্বর এতটুকু রাগ করে না বরং সে যদি সত্যি কারের মন দিয়ে, নির্বিকার চিত্তে জীবের সেবা করে, জীবের মঙ্গল করার কর্মে লিপ্ত হয়, এমন কি, সে যদি অক্ষম হয়, শুধু মাত্র মনে মনেও জীবের মঙ্গল কামনা করে, তাতে ঈশ্বর অনেক বেশী খুশী হয়। সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের খুব প্রিয় হয়। ঈশ্বর আশুতোষ, সে অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়।

অবজ্ঞার হাসি হেসে আকাশ বলে,— আগেই যদি সবকিছু ঠিক করা থাকে, তাহলে মানুষের আর চিন্তা কিসেব? মানুষ তাহলে তো খাবে, ঘুমোবে, ঘুরে বেড়াবে আর আনন্দ ফূর্তি করে বেড়াবে, কারণ যা আসার তা তো আসবেই আর যা যাওয়ার তা তো যাবেই। অর্থাৎ, যা ঘটার তা তো ঘটবেই। তাহলে আর অযথা দুঃখ করা কেন, কোন কিছুর জন্য চেষ্টা করাটাও তো বৃথা।

সাগর হেসে বলে,— আমাকে এরকম একটা মানুষও দেখাতে পারবে, যে এইভাবে নির্লিপ্ত থাকতে পারে? কাম, ক্রোধ, লোভ তো ঘিরে ধরবেই, তার থেকে বাঁচবে কি করে? তখনই মানুষ বিভিন্ন রকম কর্ম করবে। তারপরেই তার আসক্তি জন্মাবে, তার থেকে কাম আসবে, আর কাম বাধা পেলেই ক্রোধের উদয় হবে। যে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী, তারও কিন্তু আসক্তি আছে, কাম আছে। কিন্তু সেটা বহুমুখী নয়, এক জায়গায় সীমাবদ্ধ, একটা মাত্র লক্ষ্যে স্থির। জীবের সেবা, জীবের মঙ্গল, ঈশ্বরের সেবা, ঈশ্বরকে ডাকা, ঈশ্বরকে কাছে পাওয়া, আবশেষ মুক্তি লাভ। এটাই তার কাম আর এর জন্য যে কর্ম, তাতে তার আসক্তি। সে তখন তার আত্মাতেই সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত এবং সুখী। সমস্ত কর্ম করেও ফলের আশা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে। পদ্ম পাতায় যেমন জল লাগে না, হংস পাখায় যেমন দাগ লাগে না, তেমনি সেই মুক্ত পুরুষ, মহাপুরুষ, কর্ম করেও কোন কর্মে লিপ্ত হয় না।

সাগর কথা বন্ধ করে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশ আবার জিজ্ঞাসা করে,— কিন্তু যারা একদিকে ঈশ্বর ডাকছে, আর অন্যদিকে মানুষের সর্বনাশ করছে, অথবা যারা মানুষের ক্ষতি না করলেও মানুষের জন্য ভাবে না, তারা শুধুই নিজেদের স্বার্থে সাবাদিন ভগবানের পূজো করছে, তাদের কি বলবে?

সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়,— তাদের কথা আমি জানিনা, তবে জীবের সেবার মধ্যে দিয়েই তো ঈশ্বরের সেবা করা হয়, তাকে খুশী করা হয়। এই জীব জগৎ তো তারই সৃষ্টি। সৃষ্টিকে অবহেলা করে কি কখনো স্রষ্টাকে তুষ্ট করা যায়? যেমন ধরো, একটা ছেলেকে তুমি রোজ মারো, গালাগাল করো। আর তার মাকে ভালো ভালো কথা বলো, তোয়াজ করো। তুমি কি মনে করো, সেই মা তোমার ওপর খুশী হবে?

আকাশ মুখে কৃত্রিম গম্ভীর ভাব এনে বলে,— না আমি কোনদিন কোন মহিলাকে খুশী করার চেষ্টা করিনি। আমার চরিত্র খুবই ভালো। এই মুহূর্তে অবশ্য কোন সার্টিফিকেট দিতে পারবো না।

সাগর লজ্জা পেয়ে বলে,— যাঃ, আমি কি তাই বলেছি নাকি?

আকাশ অন্য দিকে তাকিয়ে বলে,— ওই একই হোল। অতিথি নারায়ণ, তাই ঘুরিয়ে নাক দেখানো আর কি? সোজাসুজি বললেই হোত।

সাগর লাজুক ভাবে বলে,— এমা — আর কখনো যদি কিছু বলেছি।

আকাশ আড় চোখে সাগরকে দেখে নিয়ে হেসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে বলে,— একটু ঘুরে আসছি।

সাগর জিজ্ঞাসা করে,— আবার কোথায় চললে?

আকাশ উঠোনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে বলে,— আছি যখন, তখন একবার কুসুমের মাকে দেখে আসি, ঢেঁকিতো স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।

সাগর জিজ্ঞাসা করে,— জীবের সেবা?

আকাশ পিছন ফিরে সাগরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে,— না, মনের।

কথাটা বলে আকাশ উঠোন থেকে বেরিয়ে ডান দিকে বাঁক নেয়।

সাগর কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হেসে ঘরে ঢুকে যায়।

সাগর ঘরে ঢুকে দেখে বৃদ্ধ খুব আস্তে আস্তে নিজের মনে কথা বলছে। সাগর ভয়ে ভয়ে খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে কথা গুলো শোনার চেষ্টা করে।

— আমি আজ যাব না গুরুদেব। আপনি কালকে আসুন। আমি কাল যাব। আজ আমার ছেলে আসবে।

একটু চুপ করে গিয়ে বৃদ্ধ ডাকে,— সাগর —

সাগর খাটে উঠে বৃদ্ধের গায়ে হাত দিয়ে বলে,— এইতো বাবা।

বৃদ্ধ বলে,— গুরুদেব এসেছেন মা, একটা আসন দাও।

সাগর চুপ করে থেকে মনে মনে ভাবে,— 'আর সময় বেশী নেই।'

বৃদ্ধ আবার নিজের মনে বলে,— কে? ও,— মা এসেছ? কেমন আছো মা? কতদিন পরে তোমায় দেখলাম।

বৃদ্ধ আবার সাগরকে ডাকে।

সাগর সাড়া দেয়,— এইতো বাবা, আমি এখানেই আছি।

— আমার মা এসেছে, বসতে দাও।

চুপ করে গিয়ে বৃদ্ধ যেন কিছু শোনার চেষ্টা করে। সাগর তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধর দিকে।

বৃদ্ধ আবার নিজের মনে বল,— কি বলছো? আমায় ডাকছো?

বৃদ্ধ একটু থেমে যায়, যেন কারুর কথা শুনছে। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করে,— কি বলছো? আবার একটু চুপ করে থেকে উত্তর দেয়,— আমি কাল যাব, তুমি এই সময় এসো।

চুপ করে যায় বৃদ্ধ। সাগর বৃদ্ধকে ডাকে কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

সাগর ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধকে আবার ডাকে,— বাবা, — বাবা —

বৃদ্ধ সাড়া দেয়,— উঁ

সাগর জিজ্ঞাসা করে,— তুমি কার সাথে কথা বলছ?

চুপ করে থাকে বৃদ্ধ। সাগর আবার ডাকে,— বাবা —

— উঁ

— তুমি কার সাথে কথা বলছ?

— কই? কেউ নাতো।

— তুমি যে এক্ষুনি বললে বসতে দিতে!

— আমার মা আর গুরুদেব এসেছিলেন। কাল আমি চলে যাব। খোকা এসেছে?

সাগর বুঝতে পারে বৃদ্ধের কিছুই মনে থাকছে না।

— আসবে। — উত্তর দেয় সাগর।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে বৃদ্ধ। সাগরের নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হয়। কি করবে বুঝতে পারে না। বৃদ্ধ আস্তে আস্তে সাগরকে বলে,— তুমি এখন যাও মা পরে এসো।

সাগর খাট থেকে নেমে কিছুক্ষণ বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থেকে খাটের পায়ের দিকের অন্য একটা দরজা দিয়ে ভিতরের আর একটা ঘরে চলে যায়।

বৃদ্ধ চুপ করে শুয়ে থাকে বিছানায়।

আলের রাস্তা ছেড়ে চওড়া মাটির রাস্তায় উঠে একটু এগিয়ে গিয়ে খেজুর গাছটাকে বাঁদিকে রেখে ডানদিকের রাস্তায় বাঁক নেয় আকাশ। জায়গাটাতে খড়ের ছাউনি দেওয়া অনেকগুলো মাটির ঘর, আর তার সামনে খোলা জায়গায় কতগুলো শিশু মাটির ওপর বসে খেলা করছে। ওদের পাশেই অনেক গুলো চটের থলে বিছিয়ে চাল আর ডাল আলাদা ভাবে শুকোতে দেওয়া আছে। অনেক গুলো কাঠবিড়ালী এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা আবার ছুটে এসে ডাল আর চাল মুখে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। একঝাঁক চড়াই পাখী এদিক ওদিকে দেখতে দেখতে চাল ডাল খেয়ে যাচ্ছে। কাঠবিড়ালী গুলোকে এগিয়ে আসতে দেখলেই উড়ে গিয়ে অন্য জায়গায় বসছে, কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে আসছে।

একজন অল্প বয়সী বৌ দাওয়ায় বসে তার কোলের শিশু সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে মাটিতে চাল বাছছে। আকাশকে আসতে দেখে বুকের কাপড়টা টেনে নিয়ে বুক সমেত শিশুটিকে ঢেকে দিয়ে, ঘোমটাটা সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে, মাথা নীচু করে চাল বাছতে থাকে।

প্রত্যেকটা বাড়িতেই দালানের ওপর খড়ের চালে লতানো লাউ আর কুমড়ো গাছ। কয়েকটা গাছে ছোট বড় নানা মাপের গোল লাউ, লম্বাটে লাউ আবার কয়েকটা গাছে ছোট ছোট মাপের ঘন সবুজের ওপর হাল্কা সাদাটে রঙের দাগ দাগ কাটা কুমড়োর ফলন ধরেছে। সামনের ডানদিকের কোণায় পরপর চারটে ধানের গোলার পাশে বেশ কয়েকটা ফলন ধরা কলা গাছ। বড় বড় সবুজ কলার কাঁদি গুলো ঝুলছে গাছে।

আকাশ শিশু গুলোকে দেখতে দেখতে ধানের গোলা গুলোর পাশ দিয়ে একটা বাড়ির পিছনের পুকুর পাড়ের রাস্তায় দুটো গরুকে রাস্তা আগলে ঘাস খেতে দেখতে পায়। গলায় ছোট ছোট কাঠের খোঁটা সমেত দড়িটা লুটোচ্ছে মাটিতে। গরু দুটোর পাশ কাটিয়ে দুধারে সন্ধ্যামালতীর ঝোপের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় দুটো ছাগল ছানাকে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা কবতে দেখে দাঁড়িয়ে যায়। খুব ভালো লাগে আকাশের ওদের খেলা দেখতে।

একটা পরিচিত পোড়া গন্ধের সাথে ধোঁয়া দেখতে পেয়ে, আকাশ বাঁদিকে তাকিয়ে দেখে।

রাস্তার বাঁদিকে একটা বাড়ির সামনে, চারিদিকে বাঁশের বেড়া দেওয়া উঠোনের মতো জায়গায়, মাটিতে গর্ত করে বানানো উনুনে একজন মহিলা শুকনো খেজুর পাতা দিয়ে আগুন জেলে রান্না করছে। পাশে অরো অনেক গুলো শুকনো খেজুর পাতা, নারকেল পাতা পড়ে আছে। পাশেই একটা ল্যাংটা শিশু হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অদূরেই একটা কুকুর লম্বা হয়ে শুয়ে দিবা নিদ্রা যাচ্ছে। উঠোনের কোণায় একটা লাল হয়ে থাকা জবা ফুলের গাছ। আর তার পাশেই বিভিন্ন রকম গাঁদা গাছের ঝোপ। অল্প কয়েকটা গাঁদা ফুল ফুটে রয়েছে গাছে। পাশেই একটা মাঝারি উচ্চতার পেঁপে গাছ। বেশ কয়েকটা ছোট বড় সবুজ পেঁপে ঝুলছে গাছে। বেড়ার দরজার পাশে একটা পাতি লেবুর গাছে অনেক গুলো লেবু হয়ে রয়েছে। গাছটাকে পুরো দেখা যাচ্ছে না, কারণ, গাছটার অর্ধেকটা ঢেকে গেছে নীল ফুল ফুটে থাকা অপরাজিতার লতানো গাছে।

পুকুরেব দিকে তাকিয়ে আকাশ দেখে একজন মহিলা স্নান করছে এবং আর একজন মহিলা স্নান

সেরে উঠে আসছে ভিজে কাপড়ে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা সমীচীন নয় মনে করে আকাশ কিছুদূরে তালগাছের সারির দিকে চোখ মেলে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে।

স্নান সেরে পুকুর থেকে উঠে আসা মহিলা আকাশের সামনা সামনি আসতেই মাথায় ঘোমটাটা সামনের দিকে বড় করে টেনে নিয়ে মাথা নীচু করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। চরিদিকে দেখতে দেখতে অলস ভাবে হাঁটতে থাকে আকাশ।

দুজন লোককে একটু দূরে একটা তালগাছের নীচে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে দেখতে পায় আকাশ। চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে এগিয়ে গিয়ে সামনে তালগাছের নীচে কথা বলতে থাকা লোক গুলোর কাছে আসতে তাদের কথা গুলো কানে আসে আকাশের। আকাশ বুঝতে পারে ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত লোকটির নাম তিনকড়ি, আর তার সামনে একটা সার্ট আর ধুতিটাকে লুঙ্গির মতো করে পরে থাকা লোকটির নাম দশরথ। তিনকড়ি খুব উত্তেজিত হয়ে দশরথকে বলে,— ভালো কথায় টাকা যদি না দাও তবে বাড়িতে গিয়ে বৌ মেয়ে সমেত টেনে বার করবো।
দশরথ হাতজোড় করে তিন কড়িকে বলে,— আমায় একটু বোঝার চেষ্টা করো ভাই, তোমার টাকা নিয়েতো আমি ব্যবসা করিনি, তোমার টাকায় আমার মেয়ের অপারেশন করিয়েছি ভাই, নইলে আমার মেয়েটাতো মরে যেতো।
তিনকড়ি আরো রেগে গিয়ে দশরথের দিকে একটু এগিয়ে এসে বলে,— তোমার মেয়ের কি হোত তা জেনে আমার লাভ নেই। এইতো সেদিন, সুধার বাবা আমায় বলল, সুধার বিয়ের দিন সুধার বাবা নাকি পণের টাকা দিতে পারেনি বলে, পাত্রপক্ষ বিয়ের পিঁড়ি থেকে বর তুলে নিয়ে চলে গেছে। সেদিন রাতেই সুধা জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। তা আমি কি করবো অতশত জেনে, কে আত্মহত্যা করেছে, কে পণের টাকা দিতে পারেনি, কার অপারেশন হয়েছে। টাকা ধার নিয়েছ সুদ দাও, নাহলে বকেয়া সুদ সমেত টাকা ফেরত দাও। এটা আমার ব্যবসা। আমার ঘরেও ছেলে বউ আছে। তুমি টাকা দেবে কিনা বলো?
দশরথ অনুনয় করে বলে,— তোমার তো আরো ব্যবসা আছে ভাই। এতো নয় যে আমার টাকাটার জন্য তোমার সবকিছু আটকে যাচ্ছে।
তিনকড়ি চেঁচিয়ে বলে,— আমার আরো ব্যবসা আছে বলে, তুমি আমার টাকাটা ফেরত দেবে না?

চেঁচামেচি শুনে কয়েকজন পুরুষ মহিলা ও কয়েকটা বাচ্চা ছেলে পাশের ঘর গুলো থেকে বেরিয়ে এসে মুখ বাড়িয়ে দেখে। তাদের মধ্যে থেকে একটি আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে এগিয়ে আসে।

আকাশ হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসে ভীড়ের কাছে।
দশরথ অপরাধীর মতো মুখ করে বলে,— দেবো না তো বলিনি ভাই, শুধু একটু সময় চাইছি।
তিনকড়ি একই ভাবে বলে,— আজ চার মাস হয়ে গেল সুদ দাও না, এরপরেও সময় চাইতে লজ্জা করেনা তোমার?
দশরথ নিজের স্বপক্ষে বলার চেষ্টা করে,— কি করবো বলো, টাকা দেওয়ার সময় তুমি আমার ক্ষেতের জমিটা বন্ধক রেখে দিয়েছ। তোমাকে বললাম, বন্ধক রেখেছ ঠিক আছে, কিন্তু আমায় চাষ করতে দাও, যাতে তোমার ধার শোধ করতে পারি। কিন্তু তুমি তা করতে দিলে না।

আমার রোজগারটাই তো বন্ধ হয়ে গেছে। দুবেলা ভালো করে খেতে পাইনা, তোমার সুদ দেব কি করে?

ভীড়ের মধ্যে এগিয়ে আসা মেয়েটি দশরথের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তিনকড়ির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকে। তিনকড়ির ওপরে আকাশের কেমন যেন রাগ হয়। তিনকড়ি সজোরে দশরথের গালে একটা চড় মেরে বলে,— আমার থেকে উপকার নিয়ে মেয়ের প্রাণ বাঁচালে আবার আমাকেই দোষারোপ করছ? টাকাটা হাত পেতে নেওয়ার সময় এটা মনে ছিল না? বেইমান কোথাকার!

চড়ের ধাক্কায় দশরথ মাটিতে পড়ে গিয়ে, মেয়ের উপস্থিতিতে ও সবার সামনে অপমানিত হওয়ার লজ্জায় চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। দশরথের মেয়ে বাবাকে অপদস্থ হতে দেখে ভয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। ধরা গলায় দশরথ তিনকড়িকে বলে,— তুমি আমার মেয়ের সামনে, আমাকে মারলে? তুমি না আমার ছেলেবেলার বন্ধু?

তিনকড়ি হিংস্র ভাবে বলে,— ব্যাবসার মধ্যে কোন বন্ধুত্ব নেই। চোখের জল ফেলে, এসব কথা বলে আমাকে ভোলাতে পারবে না। আমার টাকাটা কবে দেবে বলো?

কাঁদতে কাঁদতে দশরথ বলে,— তিন হাজার টাকাতো তোমাকে দিয়েই দিয়েছি। বাকী শুধু দুহাজার টাকা আর চারমাসের সুদ আটশো টাকা। এই কটা টাকার জন্য তুমি আমাকে সবার সামনে এভাবে অপদস্থ করলে? আমার অবস্থাটা একটু বুঝলে না?

দশরথের মেয়ে বাবাকে কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরা অবস্থাতেই বলে,— বাবা তুমি বাড়ি চলো।

তিনকড়ি নীচু হয়ে দশরথের মেয়ের চুল ধরে নাড়িয়ে বলে,— বাড়ি যাবে কি রে? আগে তোর বাপ আমায় বলবে, কবে আমার টাকা দেবে, তবে বাড়ি যাবে। আর শোন দশরথ, অপদস্থর এখনো কিছু দেখোনি। এক সপ্তাহের মধ্যে যদি টাকাটা না পাই তাহলে দেখবে অপদস্থ হওয়া কাকে বলে।

মাথায় আগুন জ্বলতে শুরু করে দেয় আকাশের। চুলের মধ্যে ঘন ঘন হাত চালাতে শুরু করে দেয়।

দশরথ দুঃখের হাসি হেসে বলে,— আমার তো আর কিছুই নেই ভাই, এক সপ্তাহের মধ্যে আমি পারবো না। এ ওত্যেচার কোর না, আমায় তুমি দয়া করে একটু সময় দাও।

ধূর্ত শিয়ালের দৃষ্টিতে তিনকড়ি বলে,— কেন, বউ-এর গয়না গুলো কোথায় রেখেছ? মেয়ের বিয়ের জন্য? যে তোমার অসময়ে উপকার করেছে তোমার কি উচিত নয় সেই গয়না দিয়ে তার ধার শোধ করা?

করুন মুখ করে দশরথ বলে,— সে গয়না থাকলে কি আর তোমার কাছে চড় খেয়ে অপদস্থ হই? তোমার দেওয়া পাঁচ হাজার টাকার সাথে ওই গয়না বেচার টাকাতো অপারেশনে গেছে।

আবার রেগে যায় তিনকড়ি, বলে,— কই, গয়না বেচার সময় তো আমার কাছে আসোনি? দরকার হলে তোমার বাড়ি বেচে টাকা দেবে, আর তাও যদি না পারো তবে বউ মেয়ে বেচে টাকা দেবে।

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন মহিলা বলে ওঠে,— বাবা, টাকা দিয়েছে বলে লোকটাকে গলায় পা দিয়ে শেষ করে দেবে?

তিনকড়ি মহিলার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে,— চুপ করো বেয়াদব, মেরে মুখ ভেঙে দেব। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

আকাশ নিজেকে আর সামলাতে পারে না। নিজের অজান্তেই ভীড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে গিয়ে তিনকড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে,— আপনি মারলেন কেন ওনাকে?
তিনকড়ি আকাশকে আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে,— আপনি জিজ্ঞাসা করার কে মশাই? এই গ্রামে নতুন মনে হচ্ছে?
ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন মহিলার গলা পাওয়া যায়,— আমাদের সাগরের বব লো।
একটা চাপা গুঞ্জন ওঠে আকাশের পিছনে। আকাশ একহাত দিয়ে তিনকড়ির গলাটা চেপে ধরে হিম শীতল গলায় আবার জিজ্ঞাসা করে,— আপনি ওনাকে মারলেন কেন বলুন?
তিনকড়ি ভয় পেয়ে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে আমতা আমতা করতে থাকে।
দশরথ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের হাতটা ধরে বলে,— ওকে ছেড়ে দিন বাবু, ওকে ছেড়ে দিন। ওর কোন দোষ নেই। আমিই সময় মতো টাকাটা দিতে পারিনি।
আকাশ কিছুক্ষণ দশরথের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনকড়িকে ছেড়ে দেয়। তিনকড়ি ভীড়েব দিকে তাকিয়ে গলায় হাত বোলাতে বোলাতে মাথাটাকে দুদিকে নাড়িয়ে গলা ঠিক করতে থাকে।
দশবথ আকাশকে বলে,— কি করব বাবু, অভাবে ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া জোটেনা দুবেলা, তাই ইচ্ছা থাকলেও টাকাটা দিতে পারিনি।
আকাশ তিনকড়িকে জিজ্ঞাসা করে,— আপনার কতটাকা পাওনা হয়েছে?
তিনকড়ি ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়,— আজ্ঞে দুহাজার আটশো।
আকাশ তিনকড়িব দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলে,— আপনি আজ বিকালের মধ্যে টাকাটা পেয়ে যাবেন।
দশরথেব দিকে ফিরে আকাশ বলে,— আপনি দুপুরবেলা টাকাটা সাগরের কাছ থেকে নিয়ে ওনাকে শোধ করে দিয়ে জমিব কাগজটা নিয়ে নেবেন। আপনি সাগরের বাড়ি চেনেন?
দশরথের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— হ্যাঁ বাবু।
আকাশ আর দাঁড়ায় না। ইতি মধ্যে আরো বাড়তে থাকা ভীড় সরিয়ে আকাশ বেরিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যায়।

(৫৩)

অনেক গুলো প্রশ্ন আকাশের মনে ভীড় জমায়। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আকাশ মনে মনে ভাবে,— 'এই তিনকড়িরাই বা কেন মানুষের আর্থিক দুরাবস্থা আর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তার সাথে ব্যবসা করে? টাকা ধার দিয়ে মানুষের উপকার করে আবার সুদ নেয় কেন? মানুষ কেন এত স্বার্থপর হয়, মানুষ কেন মানুষের জন্য ভাবে না? হতাশাগ্রস্থ, দুর্দশাগ্রস্থ, আর্থিক অনটনের ঘূর্নি পাকের আবর্তে আবদ্ধ সমস্যায় ছিন্নভিন্ন, অভাবে জর্জরিত, দৈনদশা ফুটে ওঠা চারিপাশের ভীড় করে থাকা মুখ গুলো দেখে কি একটুও করুনা হয় না এই তিনকড়িদের? নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত, আরো পাওয়ার নেশায় ছুটে চলা মানুষ গুলোরও কি একটুও সময় নেই এদের কথা ভাবার? মান আর হুঁশ এই নিয়েই তো মানুষ— সমাজের উচ্চতর জীব। অথচ যাদের অনেক আছে সেইসব মানুষ গুলো মানটাকে গলায় লকেটের মতো ঝুলিয়ে, হুঁশটাকে টাকার ব্যাগে ভরে, কপালে সমাজে প্রতিষ্ঠিত সম্মানিয় ব্যক্তির লেবেল সেঁটে, বুক ফুলিয়ে, মাথা উঁচু করে কেমন নির্বিকার চিত্তে, নির্লজ্জ ও নির্দয় ভাবে মানুষ, মানবিকতা, মনুষত্ব, বিবেক কথা

গুলোর সংগা বদলে দিয়ে বহাল তবিয়তে শুধু মাত্র নিজেদের সুখ চিন্তায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে রয়েছে। কখনো কি এরা মনে মনে এই অভাবগ্রস্থ, মানসিক যন্ত্রনা কবলিত দুঃখী মানুষ গুলো জায়গায় নিজেদের দাঁড় করিয়ে এদের কষ্ট, এদের ব্যথা বোঝার চেষ্টা করে না! — কেন?'
এই 'কেন'-র কোন উত্তর নেই বুঝে আকাশ হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনে মনেই মাথা নাড়িয়ে বলে,— 'অথচ একটু সাহায্য, মানবিকতার স্পর্শ পেলে বেঁচে যেত অনেক গুলো অভাবী মানুষ।'
নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে আকাশ,— 'তাহলে প্রতিদিন সকালে দৈনন্দিন সমস্যার ঝুলি কাঁধে নিয়ে দুবেলা খেটে খাওয়া সরল সোজা অভাবী মানুষ গুলোর কথা কারা ভাববে? এই তিনকড়িরা তো একটু একটু করে একদিন পুরো গ্রাস করে নেবে এদের। তিনকড়িদের থামানোর কি কোন রাস্তা নেই? সত্যিই কি কোন রাস্তা নেই তিনকড়িদের কবল থেকে এই অসহায় দশরথদের বাঁচানোর?'
আকাশের মনে হয়, এই সুদের ব্যবসা এমনি একটা ব্যবসা, যেন একটা অসীম বলশালী রাক্ষস দুর্বল ধুঁকতে থাকা একটা মানুষের শরীর থেকে রক্ত চোষা বাদুরের মতো একটু একটু করে রক্ত চুষে খাচ্ছে, অথচ মানুষটার বাধা দেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। কারণ তার অভাব তাকে স্বেচ্ছায় এই রাক্ষসের কাছে এনেছে।

রক্তিমের কথা মনে পড়ে আকাশের। রক্তিম বলতো,— 'এই সুদখোররা একটা অতি বুদ্ধিমান শকুন। শকুনগুলো যেমন পলকহীন চোখে তার শিকারের মৃত্যুর আশায় ওত পেতে থাকে, এই চড়া সুদের ব্যবাসায়ীরাও ঠিক তেমনি ভাবে জাল ছড়িয়ে বসে থাকে। বেশীর ভাগ শিকার এদের জাল ছিঁড়ে বেরোতে পারে না কোনদিন। এই ব্যবসায়ীরা এবার একটু একটু করে খুবলে খেয়ে এদের সাথে পুরো পরিবারটাকে পৌছে দেয় মৃত্যুর দরজায়। জীবন দিয়ে ঋণ শোধ করার এ এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর খেলা।'
আকাশের মনে পড়ে রক্তিমকে প্রশ্ন করেছিল,— 'ছোটবেলায় পাঠ্য পুস্তকে পড়া প্রাথমিক শিক্ষার কি কোন দাম নেই? এরা এদের সন্তানদের কি শিক্ষা দেবে? বরনীয়, প্রাতঃস্মরনীয় মনীষীদের বাণী, উপদেশ, জীবনী নিয়ে কঠিন শব্দের বুলি আউরে গরম গরম লেক্‌চার মারা উদ্যোক্তাদের এবং অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া কজন সত্যিকারের মানুষ নিঃস্বার্থে এগিয়ে আসে এদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য?'
উত্তরে রক্তিম বলেছিল,— 'আজকের দিনে অধিকাংশ মানুষের কাছে, এইসব বাণী, উপদেশের কোন দাম নেই। অনেক পুরোনো হয়ে গেছে। এখন বিজ্ঞানের যুগ, যান্ত্রিক মানসিকতার যুগ, প্রতিযোগিতা মূলক মানসিকতার যুগ। পাশের মানুষকে দেখার সময় কোথায়? পুরোনো মানসিকতার আমূল পরিবর্তন দরকার, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়। এটা হচ্ছে মানসিকতার বিপ্লব। 'বিপ্লব' কথাটার মানে হল, দ্রুত এবং আমূল পরিবর্তনের জন্য যে বিদ্রোহ অথবা আন্দোলন। কোন পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙে বিপ্লবের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন করে গড়ে তুলতে গেলে তার আগে সর্বপ্রথম দরকার হয় মানসিকতার বিপ্লবের। অর্থাৎ পুরোনো মানসিকতাকে ভেঙে, গুঁড়িয়ে নতুন মানসিকতার জন্ম দেওয়ার এবং তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার। এখানেও তাই হয়েছে।

"আমরা খাব তোমরা বাদ,
এই মানসিকতার বিপ্লব জিন্দাবাদ।"

আজকের দিনে প্রতিটা মুহূর্ত অমূল্য। শুধু নিজেরটাই ভাব। দেশ এগিয়ে চলেছে না!'

একটু থেমে আবার বলেছিল,— 'সবকিছু দেখে শুনে ঘেন্না ধরে গেছে রে। আশে পাশের স্বার্থপর মানুষ গুলোকে দেখে গা রি রি করে ওঠে। নিজের প্রতিও রাগ হয়, বিতৃষ্ণা জন্মায়, প্রতিবাদ করতে না পেরে চুপ করে থাকতে হয় বলে। এই অত্যাধুনিক মানসিকতা তার কালো থাবা বসিয়ে দিয়েছে অধিকাংশ মানুষের মনে। একটা বিষের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে কেমন যেন বদলে যাচ্ছে চারিপাশের মানুষ গুলো।'

আকাশ হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে ভাবে,— 'বনের একটা জন্তুও আর একটা জন্তুকে বিপদে সাহায্য করে। তাহলে মানুষ কেন মানুষের উপকারের বিনিময়ে তার সাথে হিংস্র খেলা খেলে?'
রক্তিম বলতো,— 'আর্থিক দুরাবস্থার শিকার হওয়া মানুষের সংখ্যা যতো বাড়বে, এই চড়া সুদের ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ততই বাড়বে। এই অর্থশালী লোক গুলো দরিদ্র অভাবী লোক গুলোর বুকের ওপর বসে এদের রক্ত চুষে আরোও বলশালী হবে।'
রক্তিমের দর্শন বোধ ছিলো অদ্ভুত রকমের আলাদা। বলতো,— 'এই ব্যবসায়ী গুলো এখানকার আদালতে নিরাপরাধ হলেও, ভগবানের আদালতে কিন্তু চরম অপরাধী। আমরা আগেও জন্মেছি, আবারও জন্মাব, যতদিন না আমাদের আত্মার সার্বিক মুক্তি হচ্ছে। এরা আগের জন্মে কোন এক ভালো কর্মের জন্য এত অর্থ, ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়েছে। কিন্তু এজন্মে এই যে এরা মানুষকে যন্ত্রনা দিচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে, তারজন্য এরাই আবার পরের জন্মে সারাজীবন ধরে ঠিক এই রকমই কষ্ট, যন্ত্রনা ভোগ করবে। শাস্তি এদের পেতেই হবে, কারণ আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান এবং তার কাছে সবাই সমান।'
আকাশের নিজের কথা মনে পড়ে। রক্তিমের কথার উত্তরে হেসে বলেছিল,— 'এখানে তোর সাথে এক হতে পারলাম না। আমি তোর ভগবান, জন্মান্তর কিছুই বিশ্বাস করি না। এসব একদম বাজে কথা। ক্ষমতা, শক্তি সবই মানুষের হাতে, খারাপ ভালো যা কিছু করা, তার ফল এখানেই পেতে হবে। আর মারা গেলে সব শেষ।'
রক্তিম শান্ত ভাবে বলে,— 'আমি জানি তোরা বিশ্বাস করবি না। তোরা যুক্তিবাদী, তোদের কাছে বিজ্ঞানই শেষ কথা। কিন্তু জানিস তো, বিজ্ঞান যেখানে শেষ, তার বাইরে যে জিনিসটার ব্যাখ্যা তোদের বিজ্ঞানে মেলে না তোরা বলিস বুজরুকি। কিন্তু সেখান থেকে আরো একটা বিজ্ঞান শুরু হয়, তাকে বলে প্যারা সাইকোলজি।'
একটু থেমে গিয়ে আবার বলে,— 'থাক, ওসব কথা তোর মাথায় ঢুকবে না। আচ্ছা, একটা কথার উত্তর দেতো আমায়। একটা মানুষ কানা, খোঁড়া হয়ে জন্মালো, আর একটা মানুষ সুস্থ, সবল, সুদর্শন হয়ে জন্মালো। একজন ভিখারীর ঘরে জন্মালো আর একজন ধনীর ঘরে জন্মালো। কেন বলতে পারিস?
রক্তিম আকাশকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই উত্তর দেয়,— 'এটাই হচ্ছে আগের জন্মের কর্মফল। গত জন্মে প্রথম জনের খারাপ কাজের পাল্লা ভারী আর দ্বিতীয় জনের ভালো কাজের পাল্লা ভারী।'
আকাশ জোর দিয়ে বলে,—'কখনোই না। এটা প্রকৃতির সামঞ্জস্য বজায় রাখার একটা সিস্টেম্।'
রক্তিম হেসে বলে,— 'দুর পাগল, তাই কখনো হয় নাকি? প্রকৃতি বলতে কি বুঝিস? প্রকৃতিতো একটা সৃষ্টি মাত্র। কিন্তু সৃষ্টি কর্তা কে? যার ইচ্ছায় প্রকৃতির বুকে গাছে ফুল ফোটে, যার ইচ্ছায় চন্দ্র, সূর্য্য ওঠে বাতাস বয়, যার ইচ্ছায় গঙ্গায় জোয়ার ভাঁটা খেলে, তারই ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে এই প্রকৃতি, এই জীবজগৎ। তাকেই আমরা ঈশ্বর বা ভগবান বলি! তুই কি মনে করিস,

সেই স্রষ্টা শুধু প্রকৃতিতে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য একজন নিরাপরাধকে কানা, খোঁড়া করে শাস্তির বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে, আর একজনকে এমনিই সুস্থ সবল করছে? এতো ভয়ানক অপরাধ। তাহলে মানুষে আর ভগবানে তফাৎ কি রইল?'
আকাশ হেসে বলে,— 'তোর সেই স্রষ্টাই কিন্তু একটা নিস্পাপ হরিণ শিশুর সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, যাতে তাকে বাঘ, সিংহে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে পারে। যাতে ইকোলজিক্যাল্ ব্যালান্স বজায় থাকে।'
শান্ত ভাবে আস্তে আস্তে বোঝানোর ভঙ্গিতে রক্তিম বলে,— 'জানিসতো, একটা মানুষের যেমন মৃত্যু ভয় থেকে মানসিক যন্ত্রনা আছে, আঘাত থেকে শারীরিক ব্যথা যন্ত্রনা আছে, ঠিক সেরকমই বোধ আছে অন্যান্য জীবেরও। একটা খুনী যখন কোন মানুষ বা কোন জীবকে অযথা খুন করে, তখন সে একবারও ভাবে না যে, যাকে সে খুন করছে বা করেছে, সে কতটা কষ্ট পাচ্ছে বা পেয়েছে শারীরিক ও মানসিক ভাবে। খুনীটা হয়তো অনেক খুন করেছে জীবনে। কে বলতে পারে যে, ভগবান সেই খুনীটাকেই পরের জন্মে শাস্তি দেওয়ার জন্য হরিণ শিশু বা অন্য কোন জীব করে পাঠায়নি পৃথিবীতে? যাতে সে এজন্মে একই ভাবে মৃত্যুর শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রনা ভোগ করে। হয়তো কয়েক জন্ম তাকে এই ভাবেই জন্ম নিতে হবে। ঈশ্বরের বিচার আমরা বুঝব নারে, শুধুই বিতর্ক বাড়বে।'
আকাশ রক্তিমকে যুক্তিতে পরাস্ত করতে পারছেনা দেখে একটু উত্তেজিত হয়ে বলে,— 'আচ্ছা ওসব কথা থাক। এমন মানুষও তো আছে, যারা সারাজীবন অন্যের কতই না সর্বনাশ করেছে অথচ তাদের কোন শাস্তি হল না, বহাল তবিয়তে সারাজীবন সুখে কাটিয়ে গেল, তখন ভগবানের বিচার কোথায় গেল? পাপ, পূণ্য, শাস্তির কি হোল?'
রক্তিম হেসে বলে,— 'কে কতটা সুখে আছে তা কি বাইরে থেকে বোঝা যায়রে। যদি তোর কথাই ধরে নিই, যে, লোকটা সত্যিই সুখে আছে তাহলে একই কথা বলব যে, সে হয়তো আগের জন্মে এতো ভালো কর্ম করেছে যে, তার সুফল বা পূণ্য ফল এজন্মে ভোগ করছে। এজন্মে যদি সেই ফল ভোগ কেটে যায়, তাহলে এজন্মের কৃতকর্ম আবার সামনের জন্মে ভোগ করবে। আবার এই গত জন্মের ভালো কর্মের ফলভোগ যদি এ জন্মে আগেই শেষ হয়ে যায় তাহলে, এ জন্মের খারাপ কর্মের ফল ভোগটা এজন্মেই শুরু হয়ে যাবে।
আজ সঞ্চয় করো কাল খাও। যেমন কর্ম করবে তার ফল হয় এজন্মেই না হয় পরের জন্মে আমাদের পেতেই হবে।'

আকাশ হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনে হেসে বলে,— 'পাগল ছিল রক্তিমটা। ওর সরল মানসিকতার জন্যই এতো কষ্ট পেলো। পৃথিবীটাকে নিজের মতো করে দেখে গেল। আজকের দিনে রক্তিমদের মতো ছেলেদের প্রতিটা মুহূর্ত হোঁচট্ খেতে খেতে হারিয়ে যেতে হয়। এখানেও বোধহয় সেই সামঞ্জস্য। রক্তিমরা না হারালে অনেক স্বার্থান্বেষী মানুষকে যে সরে যেতে হবে।

(৫৪)

রাস্তার ডানদিকে বাঁক নিয়ে চওড়া মাটির রাস্তায় একটু এগিয়ে গিয়ে আকাশ দেখতে পায় কিছু দূরেই দুধারে ঘন বসতির মাঝে অনেকটা খোলামেলা জায়গায় একটা বিশাল বটগাছের নীচে গোল করে বাঁধানো বেদীর ওপর জনাকয়েক লোক নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে, আর তাদের সামনে কয়েকটা বাচ্চা ছেলে আদুর গায়ে ছোটাছুটি করে খেলছে। বেদীর পাশে একটা লোক

পায়জামা পড়ে খালি গায় মুখে দাড়ি কামানোর সাবান মেখে আয়না হাতে পিঁড়ের ওপর বসে আছে। সামনের পিঁড়েয় বসা আর একজন লোক দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে। ওদের ঠিক পিছনেই একটা বিড়াল অলস ভাবে শুয়ে আছে। বিড়ালটার গায়ের ওপর দিয়ে তিনটে বাচ্চা বেড়াল খেলা করে চলেছে। দুটো মুরগী তাদের ছানাপোনা সমেত মাটি থেকে খুঁটে খেতে খেতে এদিক ওদিক চড়ে বেড়াচ্ছে।

আকাশ এগিয়ে যেতে যেতে লক্ষ করে, বসে থাকা লোক গুলো সম্ভবত ওকে দেখেই নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছে। আকাশ কাছে আসতে বেদীর ওপর বসে থাকা লোকজনের মধ্যে থেকে জনৈক বয়স্ক লোক আকাশকে ডাকে,— এই যে বাবা।
আকাশ দাঁড়িয়ে গিয়ে ঘুরে তাকায় ওদের দিকে।
বয়স্ক লোকটি হাসি মুখ করে জিজ্ঞাসা করে,— তুমিতো আমাদের সাগরের বর না?
— হ্যাঁ। — ছোট করে জবাব দেয় আকাশ।
জনৈক বৃদ্ধ এবার বলে,— তোমাকে তুমি করে বললাম বাবা। আমাদের গ্রামেরই ছেলে তুমি, অনেক আপনার জন।
আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— আমায় কিছু বলবেন?
বয়স্ক মানুষটি এবার আকাশকে বলে,— না বাবা, কাল থেকে শুনছি তোমার কথা। তোমাকে আসতে দেখে ভাবলাম তোমার সাথে আলাপ কবি।
লোক গুলোর পায়ের কাছে ধুতি পরে খালি গায়ে বসে থাকা লোকটি বৃদ্ধকে বলে, – ছেলে আমাদের মস্ত বড় ডাক্তার গো কত্তা। কাল পুষ্পকে এক ওষুধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।
বৃদ্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— ভালো হয়েছে বাবা, খুব ভালো হয়েছে। আমাদের গ্রামে কোন ডাক্তার নেই। কতজন যে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। সাগর মা আমাদের সত্যিই ভাগ্যবতী, নাহলে এত সুন্দর স্বামী পায। বয়স্ক লোকটি এবার আকাশকে বলে,— তুমি সাগরের স্বামী, তুমিতো ভালো জানবেই। আমরাওতো সাগরকে দেখছি, ওর মতো মেয়ে হয়না।
আকাশ কোন কথা না বলে হাসি মুখ করে সবার কথা শোনে।
পায়ের কাছে বসে থাকা লোকটা এবার বয়স্ক লোকটির দিকে তাকিয়ে বলে,— ও মানুষ নয়, দেবী গো দেবী। কেউ ওর কাছে কিছু চেয়ে আজ পর্যন্ত না শোনেনি। কেন কত্তা, তোমার মনে নেই! সেই সেবার যখন পরাণের বসন্ত হোল গো, তখন কিভাবে দিন রাত সেবা করেছিল?
আর একজন বয়স্ক মানুষ এবার আকাশকে প্রশ্ন করে,— এদিকে কোথাও গিয়েছিলে বাবা?
আকাশ হেসে উত্তর দেয়,— হ্যাঁ, কুসুমের মাকে দেখে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম।
কথাটা বলে আকাশ হাতজোড় করে সবার উদ্দেশ্যে বলে,— আচ্ছা আসি।
বৃদ্ধ লোকটি তাড়াতাড়ি করে বলে,— ঠিক আছে বাবা, তুমি আর দেরী কোর না। সাগর মা হয়তো বসে আছে তোমার জন্য। বেঁচে থাকো বাবা, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক।
আকাশ এগিয়ে গিয়ে একটা মাটির বাড়ির পাশ দিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে বাড়ি ফেরার রাস্তা ধরে।

(৫৫)

সাগর হাতে একটা ভিজে কাপড় ঝুলিয়ে আর একটা কাপড় দড়িতে মেলে দিতে দিতে ঘার

ঘুড়িয়ে আকাশকে ঢুকতে দেখে আবার কাপড়টাকে টেনে ঠিক করতে করতে জিজ্ঞাসা করে,— এত দেরী হোল?
দালানের দিকে যেতে যেতে আকাশ বলে,— বউ-এর প্রশংসা শুনছিলাম।
সাগর প্রথমটায় বুঝতে না পেরে আকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,— কার প্রশংসা?
পরক্ষণেই বুঝতে পেরে বলে,— ও।
হাতে ঝোলানো কাপড়টা আগের কাপড়ের পাশে মেলে দিতে দিতে হেসে জিজ্ঞাসা করে সাগর,— হিংসে হচ্ছে?
আকাশ দালানে বসতে বসতে বলে,— একদমই না, বরং গর্ব হচ্ছে, বৌ বলে কথা।

মাথার সামনের চুল গুলো হাওয়ায় উড়ছে। দুপাশের কানের ওপর দিয়ে এসে চুল গুলো শেষ হয়েছে পিঠের ওপর ঝুলে থাকা আলগা খোঁপায়। সাগরের শরীরের দোলায় খোঁপাটা দুলছে। বেশ লাগছে। আকাশ তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে।

কুসুমকে ঢুকতে দেখে মেলা কাপড়টা ঠিক করতে করতে সাগর জিজ্ঞাসা করে,— কিরে কুসুম? কুসুম উত্তর না দিয়ে তুলসী মঞ্চের কাছে এসে দাঁড়ায়। সাগর কুসুমের দিকে ফিরে কুসুমের হাত দুটো পিছনে লোকানো দেখে জিজ্ঞাসা করে,— তোর হাতে কি?
কুসুম হাত দুটো সামনে এনে নিস্তেজ গলায় বলে,— তোমার বরের জন্য, না, ডাক্তার বাবুর জন্য ফুল এনেছি।
আকাশকে একবার দেখে নেয় কুসুম। কুসুমের হাতে অনেক গুলো হলুদ ফুল দেখে সাগর এগিয়ে আসতে আসতে বলে,— স্বর্ণচাপা! কই দেখি!
কুসুম হাত দুটো সাগরের দিকে বাড়িয়ে দেয়। সাগর এগিয়ে এসে কুসুমের হাত দুটো ধরে মাথা নীচু করে ফুলের গন্ধ নিয়ে বলে,— আমার ফুল কোথায়!
কুসুম সাগরের দিকে নিষ্পাপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে,— তুমি নাও এর থেকে।
সাগর চোখ নাচিয়ে বলে,— এর থেকে কেন নেব, আমার জন্য কেন আনিসনি?
কুসুক আস্তে আস্তে বলে,— গাছটা অনেক বড়ো তো, তাই হাত পাইনি। দেখোনা পড়ে গেছি। কুসুম হাঁটুটা দেখায় সাগরকে। সাগরের মনে হয় কুসুমকে যেন আজ বড়ো বেশী শান্ত লাগছে, সেই ছট্‌ফটানিটা কুসুমের মধ্যে আজ যেন নেই। সাগর বসে পড়ে কুসুমের হাঁটুতে হাত বুলিয়ে দেয়।

আকাশ এগিয়ে এসে কুসুমকে বলে,— কই দাও।
কুসুমের হাত থেকে ফুলগুলো নিয়ে গন্ধ শুঁকে বলে,— বাঃ খুব সুন্দর গন্ধ তো?
— তুমি যাবে নাতো? আমি অনেক দুর থেকে তোমার জন্য এগুলো এনেছি। আকাশের দিকে তাকিয়ে করুন মুখে কুসুম বলে।
উঠে দাঁড়িয়ে কুসুমের দিকে তাকিয়ে সাগরের মনে হয়,— 'কুসুম আজ ঠিক নেই। কোথাও একটা ভিন্ন সুর বাজছে। কেমন যেন একটা ছন্দের অভাব।'
কয়েক মুহূর্ত কুসুমের দিকে তাকিয়ে থেকে সাগর জিজ্ঞাসা করে,— হ্যাঁরে কুসুম, আজ তোকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে?
কথাটা বলে কুসুমের হাতের দিকে লক্ষ্য পড়ে সাগরের। কুসুম চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।
— তোর হাতে কি হয়েছে? — জিজ্ঞাসা করে সাগর।

কুসুম উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে। সাগর আবার জিজ্ঞাসা করে,— মা মেরেছে, তাই না?
কুসুম কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে থাকে।
— মুখ দেখেতো মনে হচ্ছে সকাল থেকে পেটেও কিছু পড়েনি বোধহয়।
কুসুম সাগরকে জড়িয়ে বুকের মধ্যে মুখ লুকোয়। দুহাতে কুসুমের মুখটা ধরে তুলতে তুলতে মাতৃ সুলভ শাসনের গলায় বলে,— বল, কি হয়েছে?
সাগর কুসুমের মুখটা তুলে দেখে চোখ দুটো জলে ভিজে গেছে। কুসুম কাঁদতে কাঁদতে নীচু গলায় বলে,— খুব খিদে পেয়েছিল, তাই মার কাছে খেতে চেয়েছিলাম।
কথা শেষ না করে চুপ করে যায় কুসুম।
— তাই জন্য তোর মা মেরেছে। কেন? — সাগর কুসুমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে।
চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে কুসুমের। বলে,— ঘরে কিছু নেই যে।
কুসুমকে জড়িয়ে ধরে সাগর স্নেহ মেশানো গলায় বলে,— এই নিয়ে তুই ফুল পাড়তে গিয়েছিলি?
— ডাক্তার বাবু যে না হলে চলে যাবে। আমার যে মা ছাড়া আর কেউ নেই। মার অসুখ করলে কে দেখবে? — কুসুম সাগরের বুকে মুখ রেখে বলে।
চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে সাগরের, বলে,— হতচ্ছারি, সকালে আমার কাছে এসে একবার বলতে পারোনি যে খাওয়া হয়নি? এত লজ্জা তোমার?
কুসুম খুব নীচু গলায় বলে,— অনেক দিনই তো খাওয়া হয়না, রোজ রোজ তোমাকে বললে তুমি বিরক্ত হবে না?
সাগর কুসুমকে দুহাতে সামনে ঠেলে দাঁড় করিয়ে বলে,— এক চড় মারব এবার পাকামী করলে। কুসুমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সাগর মাতৃসুলভ গলায় জিজ্ঞাসা করে,— খুব খিদে পেয়েছে নারে?
কুসুম উত্তর না দিয়ে আস্তে করে সাগরকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রাখে আবার। কুসুমের হাত ছাড়িয়ে সাগর যেতে যেতে বলে,— তুই দাঁড়া, আমি আসছি।
— মা হয়েছে না আরো কিছু। শরীরে এতটুকু মায়া দয়া যদি থাকতো। — কথা গুলো বলতে বলতে সাগর দালানে উঠে যায়।
আকাশ পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে কুসুমের সামনে ধরে বলে,— এটা মাকে দিও।
কুসুম হাত নাড়িয়ে বলে,— মা বকবে। বাবা বলতো কারুর কাছ থেকে এমনি এমনি টাকা পয়সা নিতে নেই।
আকাশ কুসুমকে বোঝানোর চেষ্টা করে বলে,— এমনি কোথায়, তুমি যে আমায় রোজ ফুল দিচ্ছ!
কুসুম সরল ভাবে উত্তর দেয়,— সেতো তোমাকে এমনিই দিই।
আকাশ কুসুমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে,— তোমার মা কিছু বলবে না। তুমি বলো আমি তোমাকে দিয়েছি, না হলে কিন্তু আমি চলে যাব।
কুসুম তাড়াতাড়ি করে আকাশের হাতদুটো ধরে বলে,— তুমি যেও না গো। আমার মার যদি আবার অসুখ করে?
আকাশ কুসুমের হাতে টাকাটা ধরিয়ে দিয়ে বলে,— তাহলে নাও।

কুসুম ইতস্তত করে টাকাটা নিয়ে মুঠো করে ধরে থাকে।

সাগর একটা বড় বাটিতে ভাত তরকারী নিয়ে কুসুমের সামনে এসে বলে,— এটা বাড়ি নিয়ে যা। কুসুমকে বাটিটা ধরিয়ে দিয়ে সাগর মুঠো করে ধরা একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বাটি ধরা অবস্থায় কুসুমের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে,— মাকে দিয়ে দিবি।
কুসুম তাড়াতাড়ি চোখ বড় করে সাগরকে বলে,— টাকা লাগবে না। ডাক্তার বাবু আমাকে এক-শো টাকা দিয়েছে।
সাগর আকাশকে একবার দেখে নিয়ে কুসুমকে বলে,— ঠিক আছে এটাও রাখ।
কথাটা বলে আকাশের দিকে আবার তাকায় সাগর।
আকাশ সাগরকে হেসে বলে,— জীবের সেবা।
সাগর কুসুমের দিকে তাকিয়ে বলে,— সাবধানে যাবি, মায়ের হাতে আগে টাকাগুলো দিয়ে দিবি গিয়ে।
কুসুম যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ায়। সাগর পিছন থেকে বলে,— আর শোন পোড়ামুখী, যখন খিদে পাবে আমার কাছে চলে আসবি কেমন?
কুসুম মাথা নেড়ে চলে যায়।
সাগর আবার বলে,— গিয়ে খেয়ে নে আগে।
কুসুম আবার মাথা নেড়ে এগিয়ে গিয়ে বেরিয়ে যায়।

কুসুম উঠোনের বাইরে ডানদিকে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে, আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকে। সাগর আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে আকাশকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করে,— কি দেখছ ঠাকুর?
আকাশ হেসে মাথা নাড়িয়ে বলে,— কিছু না।

(৫৬)

দালান থেকে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সাগর আকাশকে জিজ্ঞাসা করে,— আমাদের গ্রাম কেমন লাগছে ঠাকুর?
আকাশ হেসে উত্তর দেয়,— খুব ভালো, তবে মানুষ গুলো আরো ভালো।
সাগর আকাশের দিকে ঘুরে বলে,— ঠিক বলেছ ঠাকুর। আমি অবাক হয়ে যাই এখানকার মানুষ গুলোকে দেখে। এরা শত দুঃখেও কেমন হাসে, কেমন প্রাণ খুলে মেশে মানুষের সাথে। কত সহজ সরল এরা। শুধু এখানকার লোক বলেই নয়, সব গ্রামেরই, বিশেষ করে এই অভাবী মানুষ গুলোকে বোধহয় ভগবান একটা অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়েছে কষ্ট সহ্য করার।

খাটে বসতে বসতে সাগর মজা করে হেসে জিজ্ঞাসা করে,— আমাকে কেমন লেগেছে বললে নাতো?
আকাশ খাটে বসতে বসতে নাটকীয় ঢঙে বলে,— ভেবে দেখিনি! পরে ভেবে বলব।
সাগর খাট থেকে উঠতে উঠতে বলে,— ঠিক আছে, পরে ভেবে বোলো, আমি এখন চলি, অনেক কাজ পড়ে আছে।
সাগর ভিতরের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। আকাশ পিছন থেকে বলে,— তোমাকে যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি।

সাগর ঘুরে দাঁড়িয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করে,— কেন ঠাকুর, আমার মধ্যে অবাক হওয়ার মতো কি দেখলে?
— দেখার থেকেও অনুভব করেছি অনেক বেশী। — সাগরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আকাশ কথাটা বলে।
— হৃদয় দিয়ে না মন দিয়ে? — চোখ নাচিয়ে ঠোঁটের কোনায় একটা রহস্যময় হাসি এনে সাগর জিজ্ঞাসা করে।
আকাশ ভ্রু কুঁচকে একটু চিন্তা করে বলে,— নাহ্ মনেই আটকে আছে, হৃদয়ে এসে পৌছয়নি এখনো।
কথাটা বলে আকাশ সাগরের দিকে তাকায়। সাগর অন্যদিকে তাকিয়ে বলে,— সেই ভালো ঠাকুর। না হলে বড়ো কষ্ট পেতে হয়।
কথাটা বলে সাগর চুপ করে গিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে।
মুহূর্তের মধ্যে ঘরের পরিবেশটা কেমন যেন ভারী হয়ে যায়।
আকাশ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে।

হঠাৎ উঠোন থেকে পুরুষ কণ্ঠের ডাক ভেসে আসে,— সাগর মা —
— আসি মাস্টার মশাই। — সাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি করে ঘর থেকে দালানে বেরিয়ে যায় সাগর।

(৫৭)

সাগর দালানে বেরিয়ে দেখে, মাথার সব চুল সাদা হয়ে যাওয়া, লাঠি হাতে, চোখে চশমা, সৌম্য কান্তি প্রৌঢ় মাস্টার মশাই দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। সাগর তাড়াতাড়ি করে উঠোনে নেমে গিয়ে মাস্টার মশাই-এর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।
মাস্টার মশাই সাগরের মাথায় হাত রেখে বলে,-- থাক মা থাক। রোজ রোজ প্রণাম করো কেন মা।
সাগর মাস্টার মশাইয়ের হাত ধরে বলে,— আপনার স্নেহ আর আশীর্বাদেই তো মনে জোর রেখে বেঁচে আছি মাস্টার মশাই।
মাস্টার মশাই সাগরের একটা হাত ধরে বলে,— ও কথা বলো না মা। তোমার গোপাল তোমার সাথে আছে। গতকাল তোমার খোঁজ নিতে পারিনি। তা মা, তোমার বাবা কেমন আছেন?
সাগর চিন্তান্বিত মুখে বলে,— ভালো না। যে কোন সময় হয়তো চলে যেতে পারে।

আকাশ দালানে বেরিয়ে এলে মাস্টার মশাইয়ের সাথে চোখাচোখি হয়। সাগর আকাশকে দেখে মাস্টার মশাইয়ের সাথে আকাশের পরিচয় করিয়ে দেয়। আকাশকে দেখিয়ে সাগর মাস্টার মশাইকে বলে,— ইনি একজন ডাক্তার, পরশু রাতে কাজল ডাঙা থেকে কলকাতা ফিরছিলেন। ওই দুর্যোগের রাতে যাওয়াটা বিপজ্জনক বলে, আমিই ওনাকে থেকে যেতে বলি।
সাগরের কথার মাঝেই আকাশ ও মাস্টার মশাই দুজন দুজনকে হাত তুলে নমস্কার বিনিময় করে। সাগর বলতে থাকে,— সেদিন ওনাকে মধুসূদনই পাঠিয়েছিলেন। সেদিন রাতে বাবার যা অবস্থা হয়েছিল, আমি ভীষন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। উনি কাজল ডাঙা বেড়াতে এসেছিলেন কিন্তু সবাই বাইরে গেছে বলে উনি ফিরে যাচ্ছিলেন। বাবার কথা ভেবে আমিই ওনাকে অনুরোধ করি

কয়েকটা দিন এখানে থেকে যাওয়ার জন্য। বাবার যা অবস্থা।
সাগর হেসে আবার বলে,— ডাক্তার বাবু খুব ভালো মানুষ মাস্টার মশাই। সব থেকে বড় কথা কি জানেন মাস্টার মশাই, বাবা এবার একটু শান্তিতে যেতে পারবে। কারণ বাবার যখনই হুঁশ আসছে ছেলে আসছে না বলে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। উনি গিয়ে শান্ত করছেন। বাবা মনে করছে ছেলে ফিরে এসেছে। তখনকার মতো শান্ত হয়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু পরক্ষণেই ভুলে যাচ্ছে। পরে একই ভাবে শান্ত করতে হচ্ছে অবার।
মাস্টার মশাই সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— খুব ভালো করেছ মা।
একটু থেমে আবার হাসতে হাসতে বলে,— কিন্তু আমি যে আবার অন্য রকম শুনেছি মা।
সাগর শাড়ীর আঁচলের খুঁটটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে লাজুক ভাবে বলে,— ঠিকই শুনেছেন মাস্টার মশাই। এখানকার লোকেরা আপনা থেকেই নিজেদের মনগড়া একটা ধারণা করে নিয়েছে, আমিও আর কিছু বলিনি, কারণ বুঝতেইতো পারছেন, যদি এরা জানতে পারে ইনি আমার কেউ নন অথচ এ বাড়িতে রাত কাটিয়েছেন, তাহলে তো আর —
সাগর কথা শেষ করার আগেই মাস্টার মশাই বলে,— আমি বুঝি মা। তবে —
একটু চিন্তিত মনে হয় মাস্টার মশাইকে।
আকাশের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে,— আপনার সাথে এবার একটু আলাপ করি ভাই।
আকাশ হেসে বলে,— আপনি আমাকে তুমি করেই বলুন। আমার নাম আকাশ মুখার্জী।
— কলকাতায় কোথায় প্র্যাকটিস করো?
— বালীগঞ্জে। একটা নার্সিংহোম আছে আমার, তার পাশেই আমার চেম্বার।
— বাঃ! খুব ভালো। বালীগঞ্জে কয়েকবার গিয়েছি আমি। তাও অনেক বছর হয়ে গেল।
সাগর মাস্টার মশাইকে দেখিয়ে আকাশকে বলে,— ইনি আমাদের এখানকার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বছর খানেক হলো রিটায়ার করেছেন। উনি আমাকে নতুন করে জীবন দান করেছেন।
মাস্টার মশাই তাড়াতাড়ি করে বলে,— ও কথা কেন বলছ মা? যে ভালো, ঈশ্বর সব সময় তার সাথে থাকে।
আকাশের দিকে তাকিয়ে মাস্টার মশাই এবার বলে,— ব্যস্ত মানুষ তুমি, তবুও বলছি। এসেই যখন পড়েছ, কয়েকটা দিন থেকেই যাও আমাদের সাথে। বড় ভালো এই মেয়েটা। ওর সাথে গল্প করে তোমার খুব ভালো লাগবে। অনেক বিষয়ে জ্ঞান আছে ওর।
আকাশ গম্ভীর মুখ করে বলে,— সে আর বলতে মাস্টার মশাই, এই একদিনেই আমাকে নারায়ণ সেবা করে জীবের সেবার ওপর যা তত্ত্ব কথা উনি শুনিয়েছেন আমিতো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ওনার গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছি।
সাগর মাস্টার মশাইকে একবার দেখে নিয়ে আকাশের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকায়। মাস্টার মশাই আকাশের মনোভাব বুঝতে না পেরে বলে,— ঠিক বলেছ বাবা। অদ্ভুত একটা টান আছে এই মেয়েটার মধ্যে। একদিন না দেখলে মন খারাপ লাগে।
আকাশ সাথে সাথে বলে,— ঠিক বলেছেন মাস্টার মশাই।
একটু ইতস্তত করে বলে আবার,— সেই জন্যই, আমাকে থেকে যাওয়ার জন্য যখন উনি অনুরোধ করলেন, আমি আর যেতে পারলাম না।
সাগর ঠোঁটের কোনাটা কামড়ে চোখ বড় বড় করে তাকায় আকাশের দিকে।
সাগর মাস্টার মশাইকে আদুরে স্বরে বলে.— তাই বুঝি কাল এলেন না?

মাস্টার মশাই সাগরকে বলে,— গতকাল শরীরটা বিশেষ ভালো ছিলনা মা। বয়েস হয়েছে তো মা, নানা রকম সমস্যা। আমারও তো এবার সময় —

কথা শেষ করার আগেই সাগর তাড়াতাড়ি করে মাস্টার মশাইয়ের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, ওকথা বলবেন না মাস্টার মশাই। আমার ভীষন কষ্ট হয়! আপনাকে ছাড়া আপনার সাগর যে ভেসে যাবে।

মাস্টার মশাই সাগরের হাত ধরে বলে,— ছিঃ মা, ওকথা বলতে নেই। সাগর যে ঈশ্বরের দান তার কোন ক্ষতি কখনো হতে পারে না, ঈশ্বরই রক্ষা করবেন।

উঠে দাঁড়িয়ে বলে,— আজ আমি উঠি মা। আজ একবার স্কুলে যেতে হবে। কি একটা সই করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— চলি বাবা।

আকাশ হেসে বলে,— আসুন।

সাগর মাস্টার মশাইকে বলে,— সাবধানে যাবেন। কাল আবার আসবেন।

মাস্টার মশাই সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— আজ একটা কথা বলে যাই মা তোমায়। যে তপস্যা তুমি করছ, একদিন না একদিন শিবের ধ্যান ভঙ্গ হবেই।

কথা না বলে সাগর মাস্টার মশাইয়ের সাথে সাথে হাঁটতে থাকে। মাস্টার মশাই বেরিয়ে গেলে সাগর বেড়ার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মাস্টার মশাইয়ের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

(৫৮)

বিকাল বেলা গ্রামের শেষ প্রান্তে বাগদী পাড়াটাকে পিছনে ফেলে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে একটা টালির চাল দেওয়া দোকান ঘর দেখে আকাশ দাঁড়িয়ে গিয়ে দেখে, ভিতরে একটি লোক ঠোঙায় করে কিছু, দাঁড়িপাল্লায় ওজন করছে আর দোকানের সামনে একজন মহিলা আর একটা বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিনিসের জন্য।

আকাশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার হাঁটতে শুরু করে।

সোনা রঙে মাখা মাখি নীল আকাশের নীচে, এক প্রান্ত থেকে আব এক প্রান্তে, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে উড়ে যাওয়া, বিভিন্ন সংখ্যায় দলবদ্ধ ভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া আর শালিক পাখীর দলের ডানা নাড়ানো দেখতে দেখতে পিয়ালী গ্রামটা ছাড়িয়ে দুধারে সবুজ ধান খেতের মাঝে সীমাহীন লম্বা মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চলে আকাশ। মনে মনে ভাবে,— 'শহরে এমন নানা রঙের মেলার মাঝে শরীর মন ঠাণ্ডা করা এরকম প্রাণ চঞ্চল বাতাস কোথায়?'

সকালে একরকম পরিবেশ, আবার পরন্তবেলার পাকা রঙ মেখে দুধারে সবুজ ধান খেত গুলো আর একরকম পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

নীল আকাশের আলিঙ্গনে আপ্লুত দূরের ছোট হয়ে যাওয়া সবুজ বনবিথীকে পিছনে রেখে একটা গরুর গাড়ীকে দূর থেকে মেঠো পথ ধরে এগিয়ে আসতে দেখে আকাশের খুব ভালো লাগে। ধীর পায়ে এগোতে এগোতে দূরে আসতে থাকা গরুর গাড়ীটাকে দেখে আকাশের এবার মনে পড়ে,— 'খুব ছোট বেলায় মা জিজ্ঞাসা করেছিল আকাশকে,— সোনা, তুমি বড় হয়ে কি হবে?' আকাশ তখন মার গলা জড়িয়ে ধরে আবদার করে বলেছিল,— মা, আমি বড় হয়ে গরুর গাড়ী চালাব। কেমন মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াব, যেখানে খুশী যাবো, বাঁশী বাজাবো, আমায় বেশ কেউ

কিছু বলবে না। আমার ঘরে থাকতে ভালো লাগে না মা।
আকাশের মা আদর করে বুঝিয়ে বলেছিল,— 'ওকথা বলতে নেই বাবা। পড়াশোনা শিখে তুমি কত বড় হবে। আকাশ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল,— তবে যে তুমি রোজ বলো, দুধটা খেয়ে নে, তবে বড় হবি, গায়ে শক্তি হবে। এখন আবার বলছ পড়াশোনা করলে বড় হয়।'
পরেও অবশ্য মার কাছে আকাশ কয়েকবার শুনেছিল ছোট বেলার এই কথা গুলো। আকাশ হাসতো।

ভাবতে ভাবতে আকাশ এগিয়ে গিয়ে বাঁশীর সুন্দর একটা সুর শুনে ভালো করে তাকিয়ে দেখে, যে ছেলেটা গাড়ী চালাচ্ছে, সে-ই আপন মনে বাঁশী বাজাচ্ছে। আকাশ এগিয়ে যাওয়ার সাথে বাড়তে থাকা বাঁশীর সুরের শব্দে মনে মনে ভাবে,— বাঁশীর সুর এতভালো লাগে কেন, মন এত উদাস হয়ে যায় কেন?
আকাশের মনে হয়,— 'এই মিষ্টি সুরটা এত সূক্ষ্ম ও ধারালো যে, মুহূর্তের মধ্যে কান দিয়ে প্রবেশ করে, মন ধরতে পারার আগেই, হৃদয়ের প্রাচীর ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যায়। সুরেলা আওয়াজে হৃদয় তন্ময় হয়ে গিয়ে সুরের স্রোতে গা ভাসিয়ে মনের রাশ আলগা করে দেয়, আর মন তখন সদ্য বাঁধন ছাড়া অভিভাবক হীন হয়ে এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায়।'

গরুর গাড়ীটা কাছে এসে যাওয়াতে আকাশ দাঁড়িয়ে গিয়ে তাকিয়ে থাকে।

গাড়ীচালক বাচ্চা ছেলেটা, মুখে এই জগতের প্রতি নিবাসক্তির ভাব ফুটিয়ে গাড়ীর দোলায় দোদুল্যমান হয়ে আপন মনে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। গাড়ীটা হেলেদুলে ধীর গতিতে আকাশের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। আকাশ পিছন থেকে দেখতে পায় গরুর গাড়ীর ছাউনির ভিতরে একটা লণ্ঠন তালে তালে দুলছে।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আকাশের এরকমই একটা দিনের স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সময়টা ছিল শেষ অপরাহ্নের আলোয় রাঙা একটা বিকেল —

(৫৯)

আগুনের গোলার মতো পড়ন্ত সূর্য্যের লাল রঙ মেখে অহংকারী কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো গোধূলির আলোয় সার বেঁধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে দূরের আবীর লাল আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন বলছে,— 'আমার রঙ তোমার মতো ধার করা নয়।'

দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের মাঝে অন্তহীন সর্পিল মেঠো পথ। ধীর গতিতে বিচিত্র আওয়াজ তুলে দুলকি চালে এগিয়ে চলেছে একটা গরুর গাড়ী। আর ছাউনির মধ্যে দুলতে থাকা লণ্ঠনের আলোয় আকাশ একমনে বাঁশীতে সুরের সৃষ্টি করে চলেছে।

ছায়াগুলো বেশ বড় বড় লম্বা হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। আকাশের যতদূর চোখ যায় দেখতে পায়, শেষ হয়ে আসা বিকেলে, দাতা সূর্য তার দিগন্ত ব্যাপী বিষন্নতার ছাপ, ছড়িয়ে দিয়েছে গাছ গাছালীর মাথায় এবং সীমাহীন সবুজ প্রান্তরে। যেন কোন এক অদৃশ্য চিত্র করের তুলির ছোঁয়ায় পৃথিবীর বুকে লাল আবীরের আভা ফুটে উঠেছে। কোন এক অদৃশ্য বেহালা বাদক যেন প্রাণ জুড়ানো মন শীতল করা স্নিগ্ধ হাওয়ার সাহায্যে গোধূলীর আলোয় করুন সুর তুলে চলেছে।

অদ্ভুত একটা ভালো লাগা বোধ বুকের ঠিক মধ্যেখানে মোচড় মারছে আকাশের।

গাড়ীচালক মধু গাড়ী চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে বাঁশীর সুরের সাথে আপন মনে মাথা নাড়িয়ে চলেছে। বাঁশী বাজানো শুনতে শুনতে মধু সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়েই আকাশের উদ্দেশ্যে বলে,— তোমার সুরে জাদু আছেগো ছোটবাবু।
আকাশ বাঁশী বাজানো বন্ধ করে বলে,— কেন রে?
— তোমার বাঁশীর সুরে মনটা যেন কেমন কেমন করে। — মধু কথাটা বলে একটা গরুর পিঠে চাপড় মারে।
আকাশ উত্তর না দিয়ে আবার বাঁশীতে সুর তোলে। মধু আবার আকাশকে ডাকে,— ছোট কত্তা।
আকাশ বাঁশী থেকে মুখ সরিয়ে জিজ্ঞাসা করে,— কি হোল?
— কথাটা বলে আকাশ দেখতে পায়, একদল পুরুষ মহিলা মাথায় খড়ের বোঝা চাপিয়ে গাড়ীর পাশ দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। অস্তরাগের আলোয় কোমরে শাড়ীর আঁচল গুঁজে মাথায় বোঝা নিয়ে হেঁটে যাওযা মেয়ে গুলোর শরীরের দোলায় কোমরে যেন বিদ্যুতের চমক্। ভঙ্গিমাটা যেন বাঁকা সাপের মতো। ওদের চলার তালে তালে, পায়ের ছোঁয়ায় যেন যৌবনের স্পর্শ। কালো পাথরে খোদাই করা মেদহীন শরীরে যেন উষ্ণতার আঁচ।

মধু বলে,— অনেক দিন তোমার গান শুনিনি, একটা গান গাওনা। বেশ মনটা উথাল পাথাল করা একটা গান। আকাশ ওদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়েই বলে,— গান শুনবি?
মধু আগ্রহ ভরে বলে,— হ্যাঁ কত্তা।

রক্তিমের লেখা একটা গান মনে পড়ে যায় আকাশের। একবার মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে, সন্ধ্যার সময় জঙ্গলের রাস্তায় একদল সাঁওতাল ছেলেমেয়েকে গায়ে গা লাগিয়ে হাসি খুশী ভাবে ফিরতে দেখে রক্তিম গেষ্ট হাউসে ফিরে এসেই গানটা লিখে ফেলেছিল। একদিন সন্ধ্যেবেলা হোস্টেলে এক জমাটি আড্ডায়, নিজের গলায় গানটা গেয়ে আসর মাত করে দিয়েছিল রক্তিম।
আকাশ মধুকে বলে,— আজ অন্য একটা গান শোন্।
— আচ্ছ ছোট কত্তা। — গরু দুটোকে হাল্কা করে ছপটি দিয়ে মারতে মারতে মধু বলে।

রাস্তার দুধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লাল কৃষ্ণচূড়া গাছের তলা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া মহিলা পুরুষের দলের দিকে তাকিয়ে আকাশ গান ধরে,—

ফাগুন মাসে আগুন লাগে কৃষ্ণচূড়ার ডালে,
কি করি হায় ও সোহাগী, পরাণটা যে জ্বলে।
মহুয়াতে বিষ নামেনা, বিষযে আরো বাড়ে,
সাপ যেন তোর শরীর দোলায়, আমায় ছোবল মারে।
ওরে আমায় ছোবল মারে।।
ফাগুন মাসে আগুন লাগে কৃষ্ণচূড়ার ডালে,
কি করি হায় ও সোহাগী, পরাণটা যে জ্বলে।

কোমর থেকে বিজলী ছটা বিঁধছে পরাণ মাঝে,
মরেছিরে তোর প্রেমেতে, মন লাগে না কাজে।

বিষের জ্বালায় জ্বলছে শরীর, পীরিত বাঁশী শুনি,
মাঝ-রেতেতে দোর খুলে যে স্বপন জাল বুনি।
ওরে স্বপন জাল বুনি।।
ফাগুন মাসে আগুন লাগে কৃষ্ণচূড়ার ডালে,
কি করি হায় ও সোহাগী, পরাণটা যে জ্বলে।

কাল সাপিনী নাগিনী তুই, আসিস্ কেন হেলে,
ও চলানী পরাণ ঘাতী, দেনা গরল ঢেলে।
স্বপন শেষে ভোর হয়ে যায়, আকাশ ভরে লালে,
কাঁখে কলস্, বিজলী চমক, আবার পরাণ জ্বলে।
ওরে আবার পরাণ জ্বলে।।
ফাগুন মাসে আগুন লাগে কৃষ্ণচূড়ার ডালে,
কি করি হায় ও সোহাগী, পরাণটা যে জ্বলে।
ওরে পরাণটা যে জ্বলে।।

দিনের আলো কমে আসার মধ্যে আকাশ গান শেষ করে অস্পষ্ট আলোয় তাকিয়ে দেখে মহিলা পুরুষের দলটা অনেক দূরে চলে গেছে।

প্রকৃতির বুকে অন্ধকার নামতে থাকা পরিবেশের মাঝে গরুর গাড়ীর ছাউনির মধ্যে লণ্ঠনের আলোটা দুলতে দুলতে এগিয়ে চলে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে। আকাশ কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে বাঁশীটা মুখের সামনে ধরে আবার সুর তোলে।

(৬০)

অনেক দূরে চলে যাওয়া গাড়ীটার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে আকাশ। বাঁশীর সুরটা হাল্কা করে এখনো বাতাসে ভেসে আসছে কানে।

— কোথায় যাচ্ছ গো?
কুসুমের ডাকে ফিরে তাকায় আকাশ।
— আরে কুসুম! তুমি এখানে কি করছ?
দূরের দিকে হাত দেখিয়ে কুসুম বলে,— নদীর ধারে যাচ্ছি। তুমি কোথায় যাচ্ছ?
— আমিও নদীর ধারে বেড়াতে যাচ্ছি। চলো একসাথে যাই তাহলে।
— চলো। — আকাশের হাতটা ধরে বলে কুসুম।
হাঁটতে হাঁটতে আকাশ কুসুমকে জিজ্ঞাসা করে,— তুমি হঠাৎ এই সময় নদীর ধারে যাচ্ছ? একটু পরেই তো অন্ধকার হয়ে যাবে।
মাথা নাড়িয়ে কুসুম উত্তর দেয়,— সেইজন্যই তো যাচ্ছি।
আকাশ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে,— কেন?
— নদীর ধারে জঙ্গলে একটা চাঁপা গাছ আছে। সবাই বলে, আমার বাবাকে নাকি মাঝে মাঝে অন্ধকারে চাঁপা গাছের তলায় দেখতে পাওয়া যায়।
আকাশ হেসে জিজ্ঞাসা করে,— কে বলেছে?

কুসুম একটু জোর দিয়ে বলে,— সব্বাই বলে।
একটু হতাশ হয়ে আবার বলে,— জানো, রোজ গিয়ে কত ডাকি বাবাকে। বাবা আসেই না।
আকাশ চারদিকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করে,— তোমার ভয় করে না?
— বারে, ভয় করবে কেন, আমার বাবা তো! — অবাক হয়ে বলে কুসুম।
আকাশ বুঝতে পারে, বাবাকে কাছে না পাওয়ায়, কচি হৃদয়ের বাকরুদ্ধ যন্ত্রনায় ও বাবাকে দেখতে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্খায় ভয় শব্দটা এই নিস্পাপ শিশুটার মনে থাবা বসাতে পারেনি।
আকাশ কুসুমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে,— তোমার বাবা তোমায় খুব ভালোবাসতো?
কুসুম শিশু মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলে,— খু-উ-ব। রোজ আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেত নদীর ধারে।
করুন মুখ করে কুসুম আবার বলে,-- জানো, আমার সব বন্ধুর বাবা আছে। কতো আদর করে, ভালোবাসে, কতকিছু দেয়।
একটু থেমে আবার বলে,— আমার বাবাকে যদি একটু দেখতে পেতাম!
আকাশ কুসুমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মনে মনে বলে,— 'মৃত্যু শব্দটা বড়ো কঠোর, বড়ো নিষ্ঠুর সত্যি। একটা ছোট্ট শিশুর পিতৃস্নেহ বঞ্চিত ক্ষুধার্ত কোমল মন তা মানতে চায় না, উপলব্ধি করতে পারে না।'
দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায়।

(৬১)

কিছুদূরে বয়ে যাওয়া নদীটা দেখে কুসুম হাত তুলে আকাশকে দেখিয়ে বলে,— ওই দেখো।
এগিয়ে যেতে যেতে আকাশ দেখতে পায় বেশ চওড়া নদীটা, অনেক দূরে ওপারে ঢলতে থাকা সূর্য্যের লাল আলোয় ছোট ছোট ঢেউ বুকে নিয়ে, দুধারে শ্যামলকে সঙ্গী করে, এঁকে বেঁকে কতদূর চলে গেছে। নদীর পাড় থেকে অনেকটা উঁচুতে চওড়া বাঁধের মতো মাটির রাস্তাটা নদীর সাথেই এঁকে বেঁকে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। যতদূর চোখ যায়, রাস্তার দুধারে কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়ার গাছ গুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে সবুজের মাঝে অন্তহীন, সর্পিল লাল-হলুদের সারি এগিয়ে গেছে দূরে, যেখানে ওপরের নীল আকাশটা ঝুঁকে পড়েছে আসমান সবুজ সীমারেখার ওপর। রাস্তার দুদিকে ঢালু জায়গাটাতে বিচ্ছিন্ন ভাবে এগিয়ে চলেছে আকুন্দফুলের বুনো গাছ গুলো।

দূরে মাঝ নদীতে কিছুটা আগে পরে ছোট হয়ে থাকা দুটো নৌককে যেতে দেখে আকাশ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ আলোয় ফুটে উঠেছে অপরূপ দৃশ্যাবলী। আকাশের মনে হয়, কোন এক শিল্পী তার নিখুঁত তুলির টানে শেষ বেলার আলো দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছে, জীবন্ত করে তুলেছে প্রকৃতিকে। রচনা করেছে স্বর্গীয় পরিবেশের অপূর্ব শোভাকে। স্বর্বধূ প্রকৃতি।

অনেক উঁচুতে যেন আকাশের গায় ছোট ছোট কালো অসংখ্য পাখী বিভিন্ন আকারে দলবদ্ধ ভাবে মেঘের সাথে গা লাগিয়ে নদীর ওপার থেকে এপারে উড়ে আসছে। কত গুলো বক কোনা কুনি ভাবে ওপারে নামতে থাকা সূর্য্যকে অর্ধেকটা আড়াল করে, নদীর এপার থেকে কোন অজানার উদ্দেশ্যে উড়ে যাচ্ছে নদীর ওপারে। চঞ্চল পাখা মেলে উড়ে যাওয়া বক গুলোর দিকে তাকিয়ে

থাকে আকাশ।

— ডাক্তার বাবু!

কুসুমের ডাকে ফিরে তাকায় আকাশ। কুসুম দূরের দিকে হাত দেখিয়ে বলে,— ওই দেখ, কারা আসছে।

আকাশ তাকিয়ে দেখে, বেশ কিছুটা দূরে কয়েকজন লোক একটা পাল্কি কাঁধে নিয়ে এগিয়ে আসছে। আকাশ এগিয়ে চলে সামনের দিকে। কুসুম সাথে সাথে হাঁটতে থাকে।

লোকগুলো অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। ঘর্মাক্ত শরীরে চারজন স্বাস্থ্যবান খালি গায় ধুতি পরা লোক একহাতে লাঠি ধরে আর একহাতে পাল্কি থেকে বেরিয়ে আসা কাঠের লম্বা হাতল কাঁধে রেখে, চাপা গলায় 'হেঁইয়া-হো', 'হেঁইয়া-হো' আওয়াজ করতে করতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। লোক গুলোর চলার তালে তালে পাল্কিটাও দুলছে। পাল্কির সামনে আরো তিনজন লোক লাঠি হাতে, পাল্কির পিছনে তিনজন ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত লোক এবং ওদের পিছনে আরো তিনজন লোক লাঠি হাতে একইভাবে তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে আসছে।

আকাশ কুসুমের হাত ধরে রাস্তার একধারে সরে দাঁড়ায়। পাল্কি আকাশের সামনে দিয়ে এগিয়ে যায়। প্রত্যেকের মুখে ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। পাল্কির দরজায় একপাশের সরানো পর্দার পাশ দিয়ে নবপরিণিতা বধূর মুখ দেখতে পায় আকাশ। আকাশের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মেয়েটি দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। তিনজন ধুতি পাঞ্জাবি পরা লোকের মধ্যে একজনের কপালে চন্দনের ফোঁটা। একটু পরেই সন্ধ্যে নামবে। তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে চলেছে ওরা।

পাল্কি দূরে চলে যায়। আকাশ তাকিয়ে থাকে। 'হেঁইয়া-হো', 'হেঁইয়া-হো' শব্দটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।

অনেক দূরে এগিয়ে গেছে লোক গুলো। দূরে চলে যাওয়া পাল্কির দিকে তাকিয়ে আকাশ মনে মনে ভাবে,— 'বধূ বরনের পালা বোধ হয়, হয়ে গেল এখনি। পড়ন্ত বেলার স্বর্ণালি আলোয় স্নান করে, সোনা রং মনে নিয়ে নববধূ চলেছে, নতুন সংসার কে রাঙিয়ে তুলতে।'

— কই চল!

আকাশ কুসুমের দিকে তাকায়। কুসুম আবার বলে,— কই চল!

আকাশ মাথা নাড়িয়ে পিছনে ঘুরে কুসুমের হাত ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়।

নদীর পাড় দিয়ে কিছুদূর হেঁটে ডানদিকে গাছপালায় ভরা একটা জায়গা দেখিয়ে কুসুম আকাশকে বলে,— ওইখানে চাঁপা গাছটা আছে।

আকাশ কুসুমের হাতটা ধরে জায়গাটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখে, বেশ ঘন জঙ্গল মতো জায়গাটায় দিনের শেষ আলোয় গা ছম্ ছম্ করা আলো আঁধারীর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

জঙ্গলটার একটু ভিতরে ঢুকে চারিদিকে দেখতে দেখতে আকাশ কুসুমকে জিজ্ঞাসা করে,— এই জায়গাটার নাম কি কুসুম?

— এটা পঞ্চবটি শ্মশান। ওই ওদিকটায়। — কথাটা বলে কুসুম কোনাকুনি ভাবে নদীর দিকটা দেখায়।

আকাশ একটা উগ্রমিষ্টি গন্ধ অনুভব করে চারিদিকে দেখে।

— সবাইকে পোড়ানো হয় না। যাদের পয়সা নেই তাদের একটু খানি পুড়িয়ে কবর দেওয়া হয়।

— কুসুম কথাটা বলেই আবার হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে ওই দেখ চাঁপা গাছটা।
আকাশ সামনে তাকিয়ে পর পর দুটো স্বর্ণচাপা ফুলে ভরা গাছ দেখতে পায়। এগিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা ফুলগুলোর মধ্যে থেকে একটা ফুল তুলে নিয়ে নাকের সামনে এনে গন্ধ অনুভব করতে করতে তাকিয়ে থাকে গাছটার দিকে।
মুহূর্তের মধ্যে কোন এক জাদুকবের জাদুদণ্ডের স্পর্শে আকাশের চারপাশের সমস্ত দৃশ্যটা পাল্টে যায়।

(৬২)

ভোর বেলা দালানের খুঁটিতে হেলান দিয়ে একমনে বাঁশীতে সুর তুলে আচ্ছন্ন হয়ে আছে আকাশ।

হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে মাকে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, বাঁশী বাজানো বন্ধ করে হেসে জিজ্ঞাসা করে,— মা তুমি!
মা লাল পাড় শাড়ী পড়ে, ছোট একটা বেতের ঝুড়ি হাতে হেসে বলে,— তোর বাঁশী বাজানো শুনছিলাম। কি সুন্দর বাজাস রে তুই।
— তোমার ভালো লাগে? — হেসে মাকে জিজ্ঞাসা করে আকাশ।
আকাশের মাথায় হাত দিয়ে মা বলে,— খুব ভালো লাগে, মনটা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। বাঁশীর সুর আর চাঁপা ফুলের গন্ধ, কেমন যেন একটা মিল রয়েছে দুটোর মধ্যে।
উঠোনের কোনায় শ্বেত চাঁপা গাছটা দেখিয়ে মা বলে,— খোকা, তোর মনে আছে, মেলা থেকে কত ছোট গাছটা এনে পুঁতেছিলাম!
আকাশ গাছটার দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়,— হ্যাঁ।
মা দালানের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলে,— কত বড় হয়ে গেছে গাছটা। কত ফুল হয়। আমি রোজ মধুসূদনকে দিই। তুই বরং বাঁশী বাজা, আমি চাঁপা ফুল গুলো কুড়িয়েনি।
মাকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাছটার কাছে এগিয়ে যেতে দেখে, আকাশ আবার বাঁশীতে সুর ধরে।

মাকে ফুলে ভরা চাঁপা গাছের নীচে উঠোনে পড়ে থাকা ফুল গুলো কুড়িয়ে বেতের ঝুড়িতে রাখতে দেখে আকাশ বাঁশী বাজানো বন্ধ করে দালান থেকে নেমে, মায়ের কাছে গিয়ে ফুল কুড়িয়ে দেয় মাকে। মা ফুল কুড়োতে কুড়োতে আকাশকে জিজ্ঞাসা করে,— কি রে, বাজানো বন্ধ করে এখানে এলি কেন?
আকাশ ফুল কুড়ানো বন্ধ করে দাঁড়িয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে,— এই পূজোর কাপড়টা পড়ে রোজ ভোরবেলা তুমি যখন ফুল কুড়োও না মা, তখন তোমাকে কি সুন্দর লাগে।
মা ফুল কুড়োতে কুড়োতে হেসে বলে,— দূর পাগল।
মায়ের ফুল কুড়োনো হয়ে গেলে উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— শোন খোকা, আমি যখন থাকব না, তখন তুই যখন বাড়ি আসবি, রোজ সন্ধ্যেবেলা এই গাছের কাছে এসে আমাকে বাঁশী বাজিয়ে শোনাবি, কেমন?
আকাশ মাকে জড়িয়ে ধরে বলে,— ওরকম করে বোলনা মা। আমার ভীষণ কষ্ট হয়।
মা আকাশের চুলে হাত বুলিয়ে বলে,— মা কি কারো চিরকাল থাকে?
আকাশ আবদারের সুরে বলে,— মা, তুমি এমনি করে আর কখনো বলবে না।

আকাশের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে মা বলে,— আচ্ছা ঠিক আছে, এখন ছাড় দেখি, আমার পূজোর সময় হয়ে গেল।
আকাশ তবু জড়িয়ে ধরে থাকে মাকে। মা আবার বলে,— কইরে ছাড়।
আকাশ মাকে জড়িয়ে ধরেই জিজ্ঞাসা করে,— আচ্ছা মা, পূজো করে কি হয়?
মা উত্তর দেয়,— পূজোর মাধ্যমে আমরা আমাদের অহংকার কে বলি দিয়ে ভগবানের কাছে একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে মনকে শুদ্ধ করি। আর ধ্যানের মাধ্যমে তার প্রতি আমরা একাগ্রতা ও নিষ্ঠা প্রকাশ করি ও আমাদের মনের মধ্যেও বাড়ানোর চেষ্টা করি, কারণ মানুষের মন বড় চঞ্চল, একে নিজের আয়ত্তে আনার জন্য, বশীভূত করার জন্য এগুলোর প্রয়োজন আছে। আবার এই ধ্যান এক ধরনের পূজো, অন্যদিকে এই পূজোও এক ধরনের ধ্যান।
আকাশ জড়িয়ে ধরা অবস্থাতেই মা হাঁটার চেষ্টা করে। আকাশ মাকে জড়িয়ে ধরে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করে,— আচ্ছা মা, পূজোর সময় মন্ত্র পড়া হয় কেন?
সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফুলের ঝুড়িটা ডানহাত থেকে বাঁহাতে নিয়ে মা বলে,— শব্দব্রহ্ম। মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা বাতাসে যে শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেই শব্দের শক্তি অসীম। অবশ্য তার সাথে চাই সত্যিকারের বশীভূত মনের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা। আরো অনেক কিছু আছে। ওসব তোর মাথায় ঢুকবে না এখন, পরে কোন এক সময় বলবক্ষণ। শুধু এইটুকু জেনে রাখ্ আমরা এই সবই করি মোক্ষ লাভের জন্য অর্থাৎ আত্মার মুক্তি হওয়ার জন্য। এবার আমায় ছাড় দেখি, অনেক বেলা হয়ে গেল।

(৬৩)

নদীর পাড়ের জঙ্গলে চাঁপা গাছটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আকাশ মনে মনে বলে,— 'সেদিন বোধহয় সত্যিই বেলা হয়ে গিয়েছিল, তাই তোমার এতো তাড়াতাড়ি মুক্তি হয়ে গেল। সেদিন আমি তোমার কথার মানেটা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি, কিন্তু আজ বুঝি একাগ্রতা কি, নিষ্ঠা কি, পূজো কাকে বলে, ধ্যান কাকে বলে।'

— ডাক্তার বাবু।
কুসুমের ডাকে আকাশ মুখ ফিরিয়ে দেখে কুসুম আকাশের হাত ধরে নাড়াচ্ছে।
আকাশকে তাকাতে দেখে কুসুম বলে,— এই নিয়ে তিনবার ডাকলাম তোমায়। কি ভাবছিলে?
আকাশ মাথা নাড়িয়ে বলে,— কিছু না।
তারপর আবার কুসুমকে জিজ্ঞাসা করে,— বাবাকে পেলে?
কুসুম একটু মন মরা হয়ে উত্তর দেয়,— নাহ্, আজও বাবা এলো না।
আকাশ চাঁপা গাছটার দিকে তাকিয়ে বলে,— কেউ আসে না।
কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশ। তারপর আবার বলে,— চলো এবার যাই।
— চলো। — শেষ বারের মতো জঙ্গলের চারিদিকে, বাবাকে দেখতে পাওয়ার আশায় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে কুসুম উত্তর দেয়।

আকাশের হাত ধরে নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কুসুম চিন্তান্বিত মুখে বলে,— কিন্তু আমার বাবা বলেছিল,— 'আমি মরে গেলে এই চাঁপা গাছেই থাকবো। তুই রোজ আমাকে দেখতে আসবি। আমরা লুকোচুরি খেলব।'

আকাশ কুসুমকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলে,— তাহলে তোমার বাবা হয়তো দূর থেকে তোমায় দেখে লুকিয়ে পড়েছে।
কুসুম মাথা নাড়িয়ে বলে,— তাই হবে বোধহয়।
একটু চিন্তা করে আবার বলে,— কিন্তু একবারও যদি দেখা না দেয়, তাহলে লুকোচুরিটা খেলব কি করে?
এই ছোট্ট শিশুটার এতো বড় প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ করে হাঁটতে থাকে আকাশ।
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কুসুম আবার জিজ্ঞাসা করে,— আচ্ছা, মানুষ মরে যায় কেন?
রক্তিমের কথাগুলো মনে পড়ে আকাশের,— 'জানিসতো, এই পৃথিবীটা হচ্ছে একটা রঙ্গমঞ্চ। আমরা সবাই এই মঞ্চে অভিনয় করার জন্য আসি। যার যতটুকু অভিনয়, তাকে সেটা করতেই হবে। অভিনয় শেষ হলেই এসে যায় বিদায় নেওয়ার পালা। এক মুহূর্ত থাকার যো নেই।'
আকাশ কুসুমকে বোঝানোর চেষ্টা করে বলে,— মানুষের শরীরের ভিতরে অনেক গুলো যন্ত্র আছে তো, সেগুলো খারাপ হয়ে গেলে মানুষ মরে যায়।
— তোমরা ডাক্তার বাবুরা সারাতে পারো না? আমার বাবাতো সাইকেলটা খারাপ হয়ে গেলে সারিয়ে ঠিক করে দিতো।'
আকাশ অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়,— মানুষের শরীরের ভিতরে যন্ত্রগুলো সারানো অনেক বেশী শক্ত তো, তাই সব সময় সারানো যায় না।
কুসুমের শিশু মনের স্বাভাবিক কৌতূহল বোধটা একের পর এক প্রশ্নের ভীড় জমায়। জিজ্ঞাসা করে,— আচ্ছা, মানুষ মরে গেলে কোথায় যায়?
প্রশ্নটা শুনে মনে মনে চমকে উঠে আকাশের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে যায়,— কিছু মানুষ আছে, যারা বেঁচে যায়।
সুজয়ের মুখটা মনে পড়ে যায় আকাশের।
কুসুম তাড়াতাড়ি করে চোখ বড়ো করে জিজ্ঞাসা করে,— ও..., তারাই বুঝি আমার বাবার মতো কোথাও লুকিয়ে বা আকাশের তারা হয়ে যায়?
আকাশ অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেয়,— হ্যাঁ।
— তাহলে কি আমার বাবা আকাশের তারা হয়ে গেছে?
কথাটা বলে পরমুহূর্তেই আবার চিন্তান্বিত গলায় বলে,— কিন্তু বাবাতো বলেছিল, ওই চাঁপা গাছেই থাকবে।
আকাশ কুসুমের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বলে,— তোমার বাবা হয়তো তখন জানতো না।
কুসুম নিরাশ গলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,— আচ্ছা ডাক্তার বাবু, আমার বাবা কি তাহলে আর কোন দিন ফিরে আসবে না?
নির্মম সত্যি কথাটা ছোট্ট কুসুমকে বলতে না পেরে আকাশ তাকিয়ে থাকে কুসুমের মুখের দিকে।

নদীর ওপারে সরু ছোট হয়ে থাকা ঘন সবুজ সীমা রেখার ওপরে নামতে থাকা আগুনের গোলাটার লাল রঙ এসে পড়েছে কুসুমের মুখে। আকাশ কুসুমের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবে,— 'কে কার রঙে মুখ রাঙিয়েছে? অস্ত যাওয়ার পথে সূর্য্যের লাল রঙে কুসুম, নাকি, নিষ্পাপ কুসুমের পবিত্রতার রঙে বিশ্ববরেন্য সূর্যদেব?'

বাইরের ঘরে বসে বঁটিতে আনাজ কাটতে কাটতে দালানের দরজায় ঠক্ ঠক্ করে আওয়াজ শুনে, উঠে দাঁড়ায় সাগর। শাড়ীতে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে গিয়ে দরজার খিল খুলতে খুলতে বলে,— এই তোমার আসার সময় হল?

দরজা খুলেই মুখের ছবিটা পাল্টে যায়। চোখ বড় বড় করে ভীত সন্ত্রস্ত মুখে বলে,— তুমি?

দুহাতে দরজা আগলে মুকুন্দ বলে,— হ্যাঁ গো, আমি।

সাগর দরজা বন্ধ করতে গেলে, মুকুন্দ দরজা চেপে ধরে এগিয়ে আসে। সাগর একটু পিছিয়ে যায়।

মুকুন্দ এগিয়ে আসতে আসতে বলে,— তোমার স্বামী না কে, ওই লোকটাকে দেখলাম গো। নদীর পাড়ে একটা বাচ্ছা মেয়ের সাথে বেড়াচ্ছে। ওমনি তোমার নরম শরীরটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর লোভ সামলাতে পারলাম না। তাই চলে এলাম। সেই কবে থেকে অপেক্ষা করে আছি বলোতো? লোকটার আসতে দেরী আছে। তাড়াতাড়ি করো। বেশীক্ষণ লাগবে না।

মুকুন্দ দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করলে, সাগর তাড়াতাড়ি করে মাটি থেকে বঁটিটা তুলে নিয়ে বলে,— ভালো চাও তো বেরিয়ে যাও। সেদিন মার খেয়ে শিক্ষা হয়নি তোমার?

মুকুন্দ একটু ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে,— ও বাবা, এতো দেখছি মা দুর্গা।

সাগর বঁটিটা শক্ত করে ধরে বলে,— আর এক পাও এগিও না। এখনও বলছি চলে যাও। ও এসে গেলে আজ তোমায় শেষ করে দেবে।

মুকুন্দ এগিয়ে আসতে আসতে কর্কশ গলায় বলে,— কেটে ভাসিয়ে দেব নদীর জলে।

সাগর বঁটি দিয়ে মুকুন্দকে মারার চেষ্টা করলে মুকুন্দ সাগরের বঁটি সমেত হাতটা ধরে নেয়। তারপর ঠেলে বিছানার কাছে নিয়ে গিয়ে আধশোয়া করে দেয় বিছানার ওপর। সাগর মুকুন্দর হাত থেকে নিজেকে ছাড়ানোর জন্য মুকুন্দকে ঠেলার চেষ্টা করে। মুকুন্দ সাগরের হাত থেকে জোর করে বঁটিটা কেড়ে নিয়ে দালানে ছুঁড়ে ফেলে সাগরকে চেপে ধরে মুখটা নামিয়ে আনে সাগরের মুখের কাছে। সাগর মুখ সরিয়ে নিয়ে বলে,— ভালো চাওতো ছেড়ে দাও বলছি।

মুকুন্দ সাগরের পাদুটো ধরে বিছানায় তুলতে তুলতে বলে,— আজ তোর সব সতীপনা ঘুচিয়ে দেব।

মুকুন্দ বিছানায় উঠে সাগরের ওপর ওঠার চেষ্টা করতে থাকে। সাগর কোন রকমে পা টা টেনে নিয়ে সজোরে লাথি মারে। মুকুন্দ দরজার সামনে গিয়ে ছিটকে পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সাগর দ্রুত খাট থেকে নেমে কোমরে আঁচলটা গুঁজে নিয়ে মাটি থেকে হ্যারিকেনটা তুলে নেয়। তারপর আগুন ঝড়া দৃষ্টিতে একটু একটু করে এগোতে থাকে মুকুন্দর দিকে। মুকুন্দ সাগরের চোখে চোখ রেখে একটু একটু করে পিছিয়ে গিয়ে দরজার সামনে পড়ে থাকা বঁটিটা তুলে নেয়। একটু দাঁড়িয়ে যায় সাগর। বঁটি হাতে মুকুন্দ কর্কশ গলায় বলে,— বড় তেজ তোর না!

মুকুন্দকে এগিয়ে আসতে দেখে সাগর মুকুন্দকে হারিকেন দিয়ে মারার জন্য হাত তোলে। মুকুন্দ আরোও দুপা এগিয়ে এসে বঁটিটা দিয়ে সাগরকে মারতে চেষ্টা করতেই পিছন থেকে একটা হাত এসে বঁটি সমেত হাতটা চেপে ধরে। মুকুন্দ নিমেষে হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে তাকিয়ে আকাশকে দেখে। আকাশ গায়ের জোরে মুকুন্দর হাতটা নামানোর চেষ্টা করে। মুকুন্দ শরীরের সমস্ত শক্তি

দিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু আকাশের সাথে শক্তিতে পেরে ওঠে না। আকাশ মুকুন্দর হাতটা নামিয়ে এনে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিতেই বঁটিটা মুকুন্দর হাত থেকে পড়ে যায়। আকাশ মুকুন্দকে দরজার 'দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে সজোরে একটা ঘুষি মারে মুকুন্দর মুখে। ঘুষির আঘাতে মুকুন্দ দালানে ছিট্‌কে পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়। আকাশ এগিয়ে গিয়ে মুকুন্দকে আরো একটা ঘুষি মারে। মুকুন্দ দালান থেকে উঠোনে লুটিয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি করে উঠে দাঁড়িয়ে। দৌড়ে বেড়ার দরজার কাছে গিয়ে বলে,— বাঁচতে তুই পারবি না। আমি আবার আসব।

আকাশ দালান থেকে লাফ দিয়ে বসে পড়ে উঠোনে। মুকুন্দ দৌড়ে বাইরের অন্ধকারে মিশে যায়। আকাশ পায়ে হাত দিয়ে বসে থাকে। সাগর দালান থেকে উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞাসা করে,— কি হোল?

আকাশ কোন উত্তর না দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে বসে থাকে। সাগর তাড়াতাড়ি করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আকাশের পাশে বসে গায়ে হাত রেখে, মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় আবার জিজ্ঞাসা করে,— কি হয়েছে?

আকাশ মাথা নীচু করে যন্ত্রনা কাতর মুখে উত্তর দেয়,— পায়ে লেগেছে।

সাগর আকাশের পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে,— লোকটা তো পালিয়েই যাচ্ছিল। তুমি আবার উঠোনে লাফাতে গেলে কেন? কি হোল বলো তো?

সাগর আকাশকে দুহাতে ধরে বলে,— ওঠো দেখি আস্তে আস্তে।

আকাশ সাগরকে ধরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— খুব ব্যাথা করছে তো?

আকাশ ছোট্ট করে জবাব দেয়,— হুঁ।

সাগর আকাশকে ধরে নিয়ে যেতে যেতে বলে,— চলো আমি গরম জলের সেঁক দিয়ে দেব। সাগর আকাশের হাতটা নিয়ে ঘাড়ের পিছন দিয়ে নিজের কাঁধের ওপর রেখে, আকাশকে জড়িয়ে ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলে,— আস্তে আস্তে ওঠো।

আকাশ সাগরের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে দালানে উঠে, সাগরকে ধরে এগিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে যায়!

(৬৫)

সাগর আকাশকে ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে এসে খাটে বসিয়ে দেয়।

এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে বলে,— তুমি বসো, আমি গরম জল নিয়ে আসছি।

আকাশ তাড়াতাড়ি করে বলে,— না না, তোমাকে ব্যাস্ত হতে হবে না, আমার কাছে ওষুধ আছে। তুমি শুধু একগ্লাস জল দাও আমাকে।

সাগর ভিতরের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে,— ভাতের জন্য জল বসানোই আছে, আমি শুধু ঢেলে নিয়ে চলে আসছি। টেবিলের ওপর ঘটিতে জল আছে, আমি এসে দিচ্ছি।

সাগর যেতে গিয়ে আবার ফিরে এসে নীচু হয়ে বঁটি আর আনাজের বাটিটা তুলে নিয়ে ভিতরের ঘরে চলে যায়।

আকাশ সুটকেশ খুলে একটা বাক্স বার করে, অনেক গুলো ওষুধের মধ্যে থেকে একটা ওষুধের

পাতা বার করে। তার থেকে ছিঁড়ে একটা ট্যাবলেট বার করে, বাক্সটা সুটকেশে রেখে দিয়ে সুটকেশটা বন্ধ করে দেয়।

সাগর একটা ছোট গামলায় করে গরম জল নিয়ে হাতে গামছা ঝুলিয়ে ঘরে ঢুকে আকাশের পায়ের কাছে এনে রাখে। তারপর উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে গ্লাসটা নিয়ে ঘটি থেকে জল ঢেলে আকাশের কাছে নিয়ে আসে। আকাশকে জলের গ্লাসটা দিয়ে পায়ের কাছে বসে গামছাটা গরম জলে চুবিয়ে দেয়।

আকাশ ওষুধটা মুখে দিয়ে, জল খেয়ে সাগরকে গ্লাসটা দিতে দিতে বলে,— তুমি সরো আমি দিয়ে নিচ্ছি।
— কোন কথা না, চুপ করে বসো। — গ্লাসটা পাশে রাখতে রাখতে সাগর বলে।
সাগর গামছাটা গামলা থেকে তুলে জল সমেত আকাশের পায়ে গরম জলের সেঁক দেয়। পায়ে গরম অনুভব করে আকাশ বলে,— আরে বাবা, ভীষণ গরম লাগছে যে।
— লাগুক। একদম চুপ। — ধমকে ওঠে সাগর।
আকাশ কোন কথা না বলে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে।

কিছুক্ষণ সাগরের দিকে তাকিয়ে থেকে আকাশ সাগরকে বলে,— তুমি ঠিক আমার মায়ের মতো। কথাটা শুনে সাগর একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার সেঁক দিতে দিতে বলে,— একটা কথা বলব?
— কি কথা?
সাগর আকশের দিকে তাকিয়ে বলে.— রাগ করবে না, বা, অন্যভাবে নেবে না?
— না।
মাথা নীচু করে গামছাটা জলে ডুবিয়ে সাগর বলে,— তুমি কালই চলে যাও এখান থেকে। আমিই তোমাকে কটাদিন থেকে যেতে বলেছিলাম, কিন্তু আমিই আজ বলছি তোমাকে চলে যেতে।
— কেন বলছ একথা? — সাগরের দিকে তাকিয়ে আকাশ জিজ্ঞাসা করে।
সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়,— মুকুন্দ লোক ভালো নয়, আমি তো ওকে জানি। আমি চাইনা তুমি কোন বিপদে পড়ো। আর এমনিতেই নানা ভাবে তোমাকে বিব্রত করছি আমি।
আকাশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করে সাগরকে,— কিন্তু তুমি কি করবে? তোমার বাবাও তো আজ বাদে কাল —
কথা শেষ না করে আকাশ চুপ করে যায়।
গরম জলের গামছাটা আকাশের পায়ে দিতে দিতে বলে,— বাবা চলে গেলে আমিও মুক্তি পেয়ে যাব। রাধা মাধবকে বুকে করে বৌ —
সাগর চুপ করে গিয়ে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে।
সাগরকে কথা শেষ না করে চুপ করে যেতে দেখে আকাশ বলে,— বুঝতে পারলাম না আমি।
সাগর হেসে বলে,— ও তুমি বুঝবে না। আমার জন্য চিন্তা করো না, আমার রাধামাধব আছে, সে-ই দেখবে।

ঘন কালো জমাট বেঁধে থাকা গাছ পালা গুলোকে ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে থাকা নারকেল গাছ গুলো স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চাঁদের দিকে। রূপোর থালার মতো চাঁদের আলোয় উঠোনটা আলোকিত হয়ে রয়েছে। গন্ধরাজ আর হাসনুহানার গন্ধে মাতানো আলো ছায়ার লুকোচুরি খেলা পরিবেশে দালানে বসে সিঁড়িতে পা রেখে বাইরের গাছপালার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে,— 'চাঁদের অলো তো শুধুই তো একটা আলো, তাহলে এতভালো লাগে কেন? এত স্নিগ্ধ লাগে কেন? জোৎস্না রাতের পরিবেশে মানুষের মন বেসামাল হয় কেন?

আকাশের মনে হয়,— 'কোন কিছুর সাথে মানুষের মনের যদি মিল হয়, সেটাকে তখন তার ভালো লাগে, মন মিশে যাওয়ার চেষ্টা করে। মানুষের সুন্দরের পূজারী মনের গভীরে একটা স্নিগ্ধতা, পবিত্রতা, আবেগ ও ভালোলাগা বোধ লুকিয়ে আছে। যখন এই অবচেতন মনের চাহিদার সাথে মিলে যায় বাইরের কোন পরিবেশ, তখনই মানুষের অজান্তে এগুলো বরিয়ে এসে সেই পরিবেশের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। যে মানুষের এই গুণ বা বোধগুলো নেই, সেই ব্যতিক্রমী মানুষের চাঁদের আলোয় জোৎস্না রাতের পরিবেশ মনকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।'

সাগর দালানে বেরিয়ে আকাশকে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে।
এগিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করে,— পায়ের যন্ত্রনা কমেছে একটু?
আকাশ মুখ ফিরিয়ে সাগরকে আসতে দেখে হেসে বলে,— অনেকটা। কে সেবা করেছে দেখতে হবে তো?
কথাটা বলে আকাশ তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে। লাল পাড় হলুদ শাড়ী, বড় করে সিঁদুরের টিপ আর খোলা চুলে সাগরকে দেখে আকাশের মনে হয়, কোন মোহময়ী দেবী তার পবিত্রতা ঝড়াতে ঝড়াতে হেঁটে আসছে।

সাগর আকাশের কাছে এসে বলে,— খুব হয়েছে, চুন এনে রেখেছি। শোয়ার আগে চুন হলুদ করে দেবো।
আকাশ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,— তুমি এই অন্ধকারে চুন আনতে গিয়েছিলে?
সাগর খুঁটিতে হেলান দিয়ে বলে,— তো কি হয়েছে? আমরা গ্রামের মেয়েরা অন্ধকারকে ভয় করি না।
আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— তাই! তা লোকটা যদি আবার অন্ধকারে ধরতো?
— সে তখন দেখা যেতো। তবে তোমার কাছে আসতাম না ঠাকুর, তোমার পায়ের যা অবস্থা তাতে তোমাকেই আমায় বাঁচাতে হতো। — হেসে বলে সাগর।
বকুল ফুল পড়ে সাদা হয়ে থাকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আকাশ বলে,— সে তো দেখলামই। সেদিন ঝিলের ধারে, আর আজ এবাড়িতে।
আকাশ সাগরের কথা বলার ধরন অনুকরণ করার চেষ্টা করে বলে,— "ওগো শুনছো, বাঁচাও আমাকে।"
সাগর আকাশের মাথাটা নাড়িয়ে দিয়ে বলে,— একদম ভেঙাবে না বলছি। কি লোকরে বাবা, উপকার করে আবার খোঁটা দেয়।
আকাশ হাসতে হাসতে সাগরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,— কি ব্যাপার, আজ হঠাৎ এত

সুন্দর করে সেজেছ যে, আমায় ভোলানোর জন্য না তো?
— একদমই না। তোমায় ভোলানো যে ভগবানেরও অসাধ্য, সেকথা আমি ভাল করেই বুঝে গেছি। — হেসে বলে সাগর।
আকাশ হেসে জিজ্ঞাসা করে,— এরই মধ্যে বুঝে গেলে?
একটু নীচু গলায় আবার জিজ্ঞাসা করে,— চেষ্টা করে দেখেছিলে নাকি?
সাগর নীচু হয়ে আকাশের কানের কাছে মুখটা এনে বলে,— কখনোই না। আমার মাথায় কি ভূত চেপেছে?
আকাশ সাগরের দিকে তাকিযে বলে,— দাঁড়িয়ে আছো কেন, এখানে বোস না?
সাগর আকাশের পাশে এসে বসে। আকাশ অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ অনুভব করে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে।

চুল গুলোকে গুটিয়ে, হাত দিয়ে একটা এলো খোঁপা করে পিঠের ওপর ঝুলিয়ে দেয় সাগর। তারপর মাথার দুপাশের চুল গুলোকে কানের ওপর টেনে চাপা দিয়ে দেয়।

আকাশকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সাগর হেসে জিজ্ঞাসা করে,— কি দেখছো?
আকাশ মাথা নাড়িয়ে সাগরের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে,— জানিনা, বলতে পারবো না।
সাগর হেসে বলে,— ঠিক আছে, তুমি দেখো, আমি ততক্ষণ চাঁদটাকে ভালো করে দেখি।
চাঁদের দিকে তাকিয়ে সাগর বলে,— কি সুন্দর করে চাঁদ উঠেছে আজ।
আকাশ চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলে,— ওটা তোমার দেখার জন্য। যার মন সুন্দর, সে অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দরকে খুঁজে পায়। অপূর্ণতার মাঝেও পূর্ণতা দেখে।
সাগর কোন কথা না বলে তাকিয়ে থাকে পূর্ণ চাঁদের দিকে।
আকাশ চাঁদের দিকে তাকিয়েই বলে,— আম'কে তো কই বললে না তোমার আগের জীবনের কথা!
সাগর একই ভাবে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে,— আমার কথা!

বকুল ফুলের হাল্কা মিষ্টি গন্ধটা ভেসে আসে বাতাসে। বকুল গাছটার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সাগর বলতে শুরু করে,— খুব ছোট বেলায় বাবাকে হারিয়েছি আমি। ভালো করে মুখটাও মনে পড়ে না। শুধু যেটুকু ছবিতে দেখেছি। মা আর আমি, এই নিয়েই আমাদের অভাবের সংসার। অনেক কষ্ট করে মা সংসার চালাতো। আমিও চারটে টিউশানী করতাম। আজও মনে আছে, আর একমাস বাকী আমার বি.এস.সি. ফাইনালের। হঠাৎ একদিন রাত্রে মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন প্রায় রাত্রি বারোটা বাজে। আমি পাশের ঘরে পড়ছি। হঠাৎ পাশের ঘরে একনাগারে কাশির আওযাজ শুনে উঠে গিয়ে দেখি, মা কাশতে কাশতে মুখ দিয়ে রক্ত তুলছে। খুব ভয় পেয়ে গেলাম আমি। মাকে ধরে ধরে এনে বিছানায় শোয়ালাম। পরের দিন সকালে ডাক্তারবাবু এলেন, ওনার কথায় বুঝতে পারলাম নানা রকম রোগ বাসা বেঁধেছে মার শরীরে। সেদিন দুপুরে মায়ের শরীরটা আরো বেশী খারাপ হলো।

কথা গুলো বলতে বলতে, অতীতের ঘটনার ছবি গুলো সাগরের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

(৬৭)

জীর্ণ দেওয়ালের একটা ঘরে, খাটে শোওয়া অসুস্থ মায়ের পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সাগর বলে,— তোমার কিছু হয়নি মা। দেখো তুমি ভালো হয়ে যাবে।
সাগরের মা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বলে,— আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার চলে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। শুধু তোর জন্যই চিন্তা হয় মা। তোর বিয়েটাও যদি —
সাগর কথাটা শেষ করতে না দিয়ে, মায়ের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে,— তুমি চুপ করোতো।
একটু চুপ করে থেকে সাগর আবার বলে,— তুমি ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই মা। আমি কার কাছে থাকব বলতে পারো? বাড়িওয়ালার ছেলেটা কি বিশ্রী ভাবে তাকায়, আমায় খুব অস্বস্তি হয়।
— তোর মধুসূদন সব সময় তোর কাছে থাকবে।
— তুমি এখন ঘুমোও তো, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। বিকেলে ডাক্তারবাবু আবার আসবেন বলেছেন।
মা চিন্তান্বিত মুখে বলে,— কিন্তু ডাক্তারবাবুর ফি, ওষুধের পয়সা —
মাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সাগর বলে,— ও নিয়ে তোমায় চিন্তা করতে হবে না। টিউশনীর অনেক পয়সা জমেছে।
— সেতো সংসার খরচেই — কথাটা শেষ করতে পাবেনা মা।
সাগর তাড়াতাড়ি করে হেসে বলে,— এখনও বেশ কিছু আছে।
সাগরের মা যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ওপাশে মুখ ফিরিয়ে চোখ বোজে।
সাগর মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নিজের মনেই বলে,— হে মধুসূদন, টাকা কোথা থেকে পাবো?

(৬৮)

একটু থেমে সাগর আবার বলতে শুরু করে,— সেদিন দুপুরে লজ্জার মাথা খেয়ে ভয়ে ভয়ে পাশেই বাড়িওয়ালার বাড়ি গেলাম টাকা চাওয়ার জন্য। দরজার কড়া নেড়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। যে ভয়টা করেছিলাম সেটাই হলো। বাড়িওয়ালার ছেলে অনিলবাবু দরজা খুলে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,— তুমি!
পরক্ষণেই যেন হাতে অযাচিত ভাবে চাঁদ পেয়ে গেছে, মুখের ভাবটা এরকম করে একগাল হেসে বললেন,— আরে, ভিতরে এসো। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে?
আমি বললাম,— মেশোমশাইয়ের কাছে এসেছিলাম।
অনিলবাবু অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন,— ভিতরে তো এসো আগে, বাইরে দাঁড়িয়ে কথা হয় নাকি?
মনে মনে ভাবলাম,— অনিলবাবু হঠাৎ এতো পাল্টে গেলেন কি করে? তবে কি আমিই ভুল বুঝেছিলাম? যাই হোক, আঁচল দিয়ে শরীরটা ভালো করে ঢেকে, মনে একটা অস্বস্তি নিয়ে ওনার সাথে বাড়ির ভিতরে গেলাম। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম অনিলবাবুকে আমি চিনতে মোটেই ভুল করিনি, বরং যতটা ভেবেছিলাম তার চাইতেও বেশী। অনিলবাবু দরজা বন্ধ করে আমাকে বসতে বললেন। আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। আমি না বসে বললাম,— আপনি মেশোমশাইকে ডেকে দিন। কিন্তু অনিলবাবু বললেন,— বাবাতো বাড়ি নেই, কি ব্যাপার

আমাকে বলো।

(৬৯)

বাইরের বসার ঘরে দাঁড়িয়ে সাগর মাথা নীচু করে শাড়ীর আঁচলের খুঁটটা নাড়াচাড়া করতে করতে ইতস্তত করে বলে,— না মানে, মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। আমার কিছু টাকার দরকার ছিলো।

অনিল সোফায় বসতে বসতে বলে,— তোমাদের তো প্রায় এক বছরের ওপর বাড়ি ভাড়াও পড়ে আছে।

— হ্যাঁ, আমি জানি। মেশোমশাই এর সাথে সে ব্যপারে কথাও হয়েছে। আমি আস্তে আস্তে শোধ করে দেবো। — মাথা নীচু করে সাগর কথা গুলো বলে।

অনিল সাগরকে আপাদ মস্তক দেখতে দেখতে বলে,— দেখো আমি স্পষ্ট কথা বলতে ভালোবাসি। টাকার চাইতে মানুষের জীবন অনেক বেশী দামি। তার ওপর মা বলে কথা। তাই মাকে বাঁচাতে তোমারই সবকিছু করা উচিত, কারণ তুমি ছাড়া তোমার মার আর কেউ নেই। আর তোমারও তো মা ছাড়া আর কেউ নেই।

সাগর অনিলের কথাটা ঠিক মতো বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে,— আমি বুঝতে পারলাম না আপনার কথা।অনিল সোফা থেকে উঠতে উঠতে বলে,— দুনিয়াটা চলছে দেনা পাওনার ওপর। এক হাতে দাও, এক হাতে নাও। তোমার সাথে আমি অনেকদিন কথা বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমিতো কথাই বলতে চাইতে না। আজ সেই হাত পাততে আসতে হল তো আমার কাছে?

অপমানে, লজ্জায় মুখ লাল হয়ে যায় সাগরের। একবার ভাবে,— 'দৌড়ে চলে যাবে এখান থেকে, কিন্তু পরক্ষণেই মায়ের মুখটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে।'

সাগরের মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে,— 'নিজের অপমানের থেকে মায়ের জীবন অনেক বড়ো।'

মনে মনে ভাবে,— 'লোকটার কি অর্থ আছে বলে ভদ্রতা, সভ্যতা সব ভুলে গেল? মেয়েদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় জানে না?'

লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সাগর।

সাগরকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অনিল বলে,— দেখো যা হয়নি তা ভেবে এখন কোন লাভ নেই, বরং এখনকার কথা বলি। তোমার আমার বন্ধুত্ব যদি হয়, তাহলে তোমার আমার দুজনেরই লাভ।

সাগর অনিলের কথাটা পরিস্কার করে বুঝতে না পারলেও, একটা খারাপ কিছু আঁচ করে অনিলের দিকে তাকিয়ে বলে,— আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না।

অনিল এগিয়ে আসতে আসতে বলে,— বুঝতে পারছো না? দেখো পরিস্কার কথা বলছি, মাকে বাঁচানোর জন্য তোমার টাকার দরকার আর আমার দরকার তোমাকে। অমি তোমাকে চাই।

সাগর অবাক হয়ে ভাবে,— 'লোকটা কত বড়ো মনুষ্যত্বহীন, যে, একটা অসহায় সাহায্য প্রার্থী মেয়েকে কোন রকম সাহায্য করাতো দূরে থাক বরং দুর্বলতার সুযোগ নিতে চাইছে।'

সাগর অবাক ভাবে বলে,— একি বলছেন আপনি?

অনিল সাগরের সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিধাহীন ভাবে বলে,— ঠিকই বলছি। তোমার আমার এই বয়সে একটা চাহিদা থাকেই। এটাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই ববং এটাই স্বাভাবিক। তুমি

আমি ছাড়া আর তো কেউ জানতে যাচ্ছে না। দুই বন্ধু দুজনের প্রয়োজন মেটাব। তোমার যখন টাকার দরকার পড়বে, তুমি আমার কাছে চাইবে আর আমার চাহিদা তুমি মেটাবে।
সাগর তাকিয়ে থাকে অনিলের দিকে। ঘৃণায় মন ভরে যায়।

সাগর তাকিয়ে আছে দেখে অনিলের মনে হয় সাগরের বোধহয় সম্মতি আছে। অনিল সাগরের হাতটা ধরার চেষ্টা করতেই সাগর অনিলের গালে সপাটে একটা চড় মারে। অনিল সাগরকে ধরার চেষ্টা করে। সাগর গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে জোরে একটা ধাক্কা মারে অনিলকে। সাগর তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোনর চেষ্টা করতেই অনিল সাগরের সামনে এসে পথ আটকে বলে,— এত তাড়াতাড়ি তোমায় যেতে দেবো না।
সাগর কোমরে আঁচলটা গুঁজে নিয়ে অনিলের দিকে তাকিয়ে বলে,— ভালো চান তো পথ ছাড়ুন, নাহলে আমি চেঁচিয়ে লোক ডাকব কিন্তু। অনিল সাগরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সরে দাঁড়ায়।

সাগর দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়, পিছন থেকে অনিলের বলা কথা গুলো কানে আসে,— কালকের মধ্যে যদি ভাড়া না পাই, তাহলে আমি লোকজন নিয়ে যাব।

(৭০)

ডাক্তারবাবু নিজের ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে বিছানা থেকে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সাগর মায়ের মাথায় হাত বোলানো বন্ধ করে, ডাক্তার বাবুর পিছনে পিছনে দরজার কাছে গিয়ে ডাকে,— ডাক্তার বাবু!
ডাক্তার বাবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গিয়ে পিছনে ফিরে সাগরের দিকে ঘুরে তাকায়। সাগর ইতস্তত করে বলে,— আপনার টাকাটা কালকে গিয়ে দিয়ে আসব।
ডাক্তার বাবু অবাক হয়ে একটু ঝাঁজিয়ে বলে,— সেকি! আপনি প্রথমে বলেননি কেন?
সাগর লাজুক ভাবে বলে,— অসুবিধায় পড়ে গেছি। কিন্তু রোগতো আর সেটা শুনবে না।
ডাক্তার বাবু রেগে গিয়ে বলে,— তার জন্য তো আর আমি দায়ী নই এবং সেটা দেখা আমার কাজও নয়। এটা আমার পেশা। কে অসুবিধায় পড়ল তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি রোগী দেখব ফিজ্ নেব।
সাগর কথা না বলে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।
— কাল টাকাটা যেন পাই। মনে করে দিয়ে আসবেন। — কথাটা বলে ডাক্তার বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সাগর মায়ের পাশে এসে বসে মায়ের মাথায় হাত দিয়ে মাকে ডাকে। মায়ের সাড়া না পেয়ে সাগর আবার ডাকে,— মা!
মা চোখ খুলে সাগরের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে জড়ানো গলায় বলে,— লোকের কাছে কেন ছোট হচ্ছিস মা? এখন থেকে তোকে একাই লড়াই করতে হবে। মধুসূদন তোর সাথে রইল। কথাটা বলে সাগরের মা চোখ বোজে। সাগরের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে।
সাগর কাঁদতে কাঁদতে বলে,— তুমি এমনি করে বোল না মা। দেখো আমি ঠিক তোমায় সারিয়ে তুলব। আমি আজই তোমার ওষুধ এনে দেবো।
মা কথা না বলে চোখ বুজে শুয়ে থাকে। মায়ের কপালে হাত বোলাতে বোলাতে সাগর আবার

মাকে ডাকে। সাড়া না পেয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নীরবে চোখের জল ফেলে।

হঠাৎ সাগরের মায়ের শরীর কাঁপতে থাকে। পা দুটো হাঁটু থেকে ভাঁজ হয়ে যায়। চোখ বড় করে কাঁপা কাঁপা জড়ানো গলায় মা বলে,— ও সাগর, আমি যে চলে যাচ্ছি মা, আমায় ধর না, ও সাগর — সাগর।
সাগর মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে,— এই তো মা, আমি তোমায় ধরেই আছি। এই দেখো।
সাগরের মা ছট্‌ফট্ করতে করতে বলে,— সাগর, আমায় ধর, — সাগর —
সাগর ভয়ে চীৎকার করে বলে,— এই দেখো মা, আমি তোমায় ধরেই আছি, আমার কাছ থেকে কেউ তোমায় কেড়ে নিতে পারবে না।

মা হঠাৎ চুপ করে যায়, শুধু শরীরটা কাঁপতে থাকে। সাগর ভয়ে ভয়ে ডাকে,— মা — মা! মায়েব সাড়া না পেয়ে, কয়েক মুহূর্ত মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সাগর বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে টেবিলে থেকে জলের গ্লাসটা আনতে যায়।

টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে আসতে আসতে দেখে, শরীর স্থির হয়ে যায় মায়ের। সাগর খাটে এসে বসতেই মায়ের পা দুটো বিছানার ওপর সোজা হয়ে পড়ে যায়। সাগরের হাত কাঁপতে থাকে। কাঁপা হাতে জলের গ্লাসটা মার মুখের কাছে আস্তে আস্তে নিয়ে যায় জল খাওয়াবে বলে। মায়ের মাথাটা বালিশের ওপাশে হেলে পড়ে।
সাগর কাঁদতে কাঁদতে মাকে ডাকে,— মাগো — ওমা —
মা কোন সাড়া দেয় না। সাগর বুঝতে পারে মা আর নেই। মাকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে ডাকে,— মাগো —
সাগরের চোখের জল চিবুক বেয়ে মায়ের মুখে এসে পড়ে। মাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে সাগর বলে,— আমার যে আর কেউ রইল না মা। মাগো, তুমি আমায় একলা ফেলে রেখে চলে গেলে?

(৭১)

চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে সাগরের। আকাশ তাকিয়ে থাকে সাগরের মুখের দিকে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে আমায় বলতে শুরু করে সাগর,— মা আমার চলে গেল বিনা ওষুধে। রয়ে গেলাম আমি একা, নিস্বঃ, অসহায় একটা মেয়ে। চারিদিকে শুধু অসহ্য নির্জন অন্ধকার। পরের দিন সকালে টেবিলের ওপর মায়ের ছবিতে মালা ধূপ দিয়ে ছবির সামনে মাথা রেখে কাঁদছিলাম। খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার। হঠাৎ 'এই যে', কথাটা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি খোলা দরজার সামনে অনিলবাবু দাঁড়িয়ে। চোখ মুছে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,— আপনি?
অনিলবাবু হেসে বললেন,— নিজের বোকামীতে মা-টা-কে তো মারলে।
অনিলবাবুর আচরণ দেখে রাগের সাথে থেকেও কষ্ট হল আরো বেশী। মনে মনে ভাবলাম,— 'এরা কোন স্তরের জীব? ভগবান এদের কি দিয়ে তৈরী করেছেন?'
গম্ভীব হয়ে বললাম,— কি বলবেন বলুন?
অনিলবাবু আমায় বললেন,— ভাড়ার জন্য এসেছিলাম।

আমি অবাক হয়ে অনিলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম,— 'একটা বিষধর সাপও বোধহয় কোন সদ্যমাতৃ হারা সন্তানকে সেই মুহূর্তে ফণা তোলে না। কিন্তু অনিলবাবুতো সমাজে মানুষ বলে নাম কিনেছেন।

আমি গম্ভীর হয়েই বললাম,— একটু সময় দিন, দিয়ে দেবো। মেশোমশাইকে বলা আছে।

অনিলবাবু গাল চুলকোতে চুলকোতে বললেন,— বাবার সাথে কথা বলে কোন লাভ নেই। এখন থেকে যা কথা হবে তা আমার সাথেই।

অনিলবাবু আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে আমাকে বোঝানোর মতো করে বললেন,— তুমি এখন একদম একা। কোন মেয়ে এভাবে সংসারে একা একা বাঁচতে পারে না। আমার কথা শোন। আমার কথায় রাজী হও। আমি তোমায় জীবনে দাঁড় করিয়ে দেব, রানীর হালে থাকবে তুমি।

একে মায়ের জন্য বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্ট, তার ওপর আগের দিন থেকে পেটে কিছু না পড়ার দরুন দুর্বল লাগছিল। অনিলবাবুর মুখে আবার কুরুচিকর কথা শুনে প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল, বললাম,— এক্ষুণি বেরিয়ে যান এখান থেকে।

অনিলবাবু থমকে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চলে যেতে যেতে বললেন,— এখনকার মতো বেরিয়ে আমি যাচ্ছি ঠিকই, তবে আজ রাতের মধ্যে আমার টাকা চাই। নাহলে আজ রাতেই আমি উসুল করবো।

অনিলবাবু বেরিয়ে গেলে মনে মনে ভাবতে লাগলাম কি করব, কার কাছে যাবো আমি? খুব অসহায় লাগছিল আমার। মনে মনে মধুসূদনকে স্মরণ করে মায়ের ছবির সামনে চেয়ারে গিয়ে আবার বসে পড়লাম। কাঁদা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগলাম। সারাটা দিন, সারাটা সন্ধ্যে, প্রায় এইভাবেই কেটে গেল আমার।

(৭২)

অন্ধকার ঘরে খাটে শুয়ে মায়ের ছবির সামনে জ্বলন্ত মোমবাতিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সাগর।

মা যে নেই, একথাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সাগরের মন। মনে হয় এই বুঝি মা আসবে পাশের ঘর থেকে। মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই খাটের ওপর পাশের জায়গাটাতে আস্তে আস্তে হাত বুলোয়। চোখের কোন থেকে জল গড়িয়ে পড়ে বালিশ ভিজে যায়। সাগরের মনে পড়ে, মা বলতো,— 'আজ তুই এত কষ্ট করছিস, দেখিস, একদিন তুই খুব সুখী হবি। আমি বলছি তোকে।'

রত্নার কথা মনে পড়ে সাগরের। রত্নাও তো একদিন আর পাঁচটা মেয়ের মতো স্বপ্ন দেখেছিল, একটা সুখী সংসারের। আশা করেছিল স্বামী, সন্তান নিয়ে ঘর করবে। যেখানে ভালোবাসা থাকবে, শান্তি থাকবে, অর্থের প্রাচুর্যতা না থাক অভাব থাকবে না। এই বিশ্বাস নিয়েই সৈকতকে উজার করে দিয়েছিল নিজের শরীর মনের সবটুকু। অনেকদিন গঙ্গার পাড়ে বসে সৈকতকে বলেছিল মনের ইচ্ছার কথা। ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, বিশ্বস্ত প্রেমের সুযোগ নিয়ে রত্নাকে অন্তসত্ত্বা করে কোন কিছু না জানিয়েই সৈকত চলে গিয়েছিল দিল্লিতে একটা চাকরী নিয়ে।

রত্না সাগরকে এসে বলেছিল নিজের বিপদের কথা। সাগর জিজ্ঞাসা করেছিল রত্নাকে,— 'সৈকত জানত?'
রত্না ছোট্ট করে উত্তর দিয়েছিল,— হ্যাঁ।
সাগর রত্নার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিল,— 'ভয় পাসনা, আমি আছি তোর পাশে। আজ আমার সাথে সন্ধ্যেবেলা যাবি ডাক্তারের কাছে।'
দুদিন পর সাগর রত্নাকে নিয়ে গিয়ে অ্যাবোরসান্ করিয়ে নিয়ে এসেছিল।

সৈকতের কোন চিঠি না পেয়েও রত্না পথ চেয়ে বসে ছিল, দিন গুনেছিল এই আশা নিয়ে, যে, রত্নাকে জড়িয়ে ধরে বলা ভালোবাসার কথা গুলো, দেখানো স্বপ্নের ছবিগুলো মিথ্যা হতে পারে না।

প্রায় একবছর পর যেদিন রত্না জানতে পারল সৈকত দিল্লি বাসী এক পাঞ্জাবী মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চলেছে, সেদিন সন্ধ্যার সময় সাগরকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছিল।

যদিও সাগর বুঝতে পেরেছিল এটা ব্যার্থ সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই নয় তবুও রত্নার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল,— 'দুর বোকা মেয়ে, যে তোকে কোনদিন ভালোবাসেনি। মিথ্যা কতগুলো কথা বলে তোর শরীরটা নিয়েই শুধু খেলা করেছে, তার জন্য তুই চোখের জল ফেলছিস কেন?'

ক্লাস নাইন পাশ রত্না, নিজের আর বিধবা মায়ের দুবেলা পেট ভরানোর জন্য নানা রকমের চেষ্টা করে, বহু লোকের দরজায় ঘুরে ঘুরে কিছু করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত অর্পনা বৌদির মহান সাহায্যে বৌদিরই ফ্ল্যাটের পুরুষ মনোরঞ্জন করার মধুচক্রের আসরে যোগদান করেছিল।

অর্পনা বৌদির প্রচুর টাকা, স্বামীর বিরাট ব্যবসা, তা সত্ত্বেও স্বামী সকাল বেলা কাজে বেরিয়ে গেলে ফ্ল্যাটে আসর বসতো একটাই কারণে, সেটা হচ্ছে, বৌদির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আর স্বামীর কাছে টাকার জন্য হাত পাততে সম্মানে বাধে। তাছাড়া ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপের থেকে স্বামীকে রেহাই দেওয়াটাও তো স্ত্রীর একটা পবিত্র কর্তব্য। অর্পনা বৌদির স্বামী ব্যবসার কাজে কয়েকদিনের জন্য বাইরে গেলে রাতেও আসর বসতো ফ্ল্যাটে।

সাগর একদিন রত্নাকে জিজ্ঞাসা করেছিল,— তোর মা বুঝতে পারে না?
রত্না উদাসী চোখের দৃষ্টি নিয়ে বলেছিল,— 'আন্দাজ করে, তবে এনিয়ে মা কোনদিন কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। আমার মনে হয় মা সব বোঝে। মা তো, তাই ফাঁকি দেওয়া মুশকিল।'
সাগর মনে মনে ভেবেছিল,— 'রত্নার মায়ের বুকের ভিতরটা দেখতে পারলে একবার ভালো হত। একটা মা কত আশা, স্বপ্নের জাল রচনা করে তিল তিল করে বড় করে তোলে তার সন্তানকে। কিন্তু একদিন সে যখন বোঝে তার আদরের কলজের টুকরোটা জীবনের সমস্ত বন্ধ দরজায় করাঘাত করে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে পতিতালয়ের অবাধ প্রবেশের খোলা দরজা দিয়ে, তখন সেই মায়ের বুকের ভিতরটা কেমন হয়?'

রত্নার আলাপ হয়েছিল বিপত্নীক ব্যবসায়ী বসন্ত চৌধুরীর সাথে। টাকার বিনিময়ে প্রায় দিনই রত্নাকে নিজের বীড়তে রাত কাটাতে ডাকতো বসন্ত চৌধুরী।

দু বছরের মা হারা মিষ্টি মেয়ে বিদিশার প্রতি কেমন যেন টান এসে গিয়েছিল রত্নার। রত্নাকে দেখলেই বৃদ্ধা আয়ার কোল থেকে রত্নার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আধো আধো

গলায় মা মা বলে ডাকতো আর রত্নার ব্লাউজের ভিতরে কচি হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে কিছু খোঁজার চেষ্টা করতো।

রত্নারও কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল ছোট্ট শিশুটার ওপর। রত্না আগে বিদিশাকে কোলে ফেলে ঘুম পাড়িয়ে আয়ার কোলে দিয়ে দিত, তারপর চলে যেত বসন্ত বাবুর শয্যাসঙ্গিনী হতে। বসন্ত বাবু মুখে কিছু না বললেও হাবে ভাবে প্রকাশ করে দিতেন যে একজন পতিতার এবং নিজের মেয়ের পরস্পরের প্রতি এতটা টান তিনি পছন্দ করছেন না।

বৃদ্ধা আয়ার সাথেও খুব ভালো আলাপ হয়ে গিয়েছিল রত্নার। একদিন বৃদ্ধাকে নিজের জীবনের সব কথা খুলে বলেছিল।

সকাল বেলা যখন রত্না ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীর মন নিয়ে বাড়ি চলে আসতো, বিদিশার জন্য কেমন যেন একটা টান অনুভব করতো, বুকের ভিতর কেমন যেন একটা চাপা কষ্ট হত। রত্না শরীর মনের অবসন্নতা উপেক্ষা করেও বেলার দিকে বসন্ত বাবুর অগোচরে আবার ছুটতো বিদিশাকে একবার দেখে আসার জন্য। রত্না জানতো, এই সময় বসন্ত বাবু বাড়ি থাকে না, কাজে বেরিয়ে যায়। বিদিশাকে কোলে নিয়ে শিশির ভেজা গোলাপ ফুলের পাপড়ি মেলা পবিত্র হাসিটা প্রাণ ভরে উপভোগ করে শরীর মনের অবসন্নতা দুর করতো।

একদিন এরকমই বেলার দিকে রত্না বিদিশাকে কোলে নিয়ে আদর করছে এমন সময় বসন্ত বাবু অফিসের কি একটা কাগজ নিতে ভুলে গিয়ে আবার ফিরে এসে রত্নাকে দেখে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছিল,— 'কি ব্যাপার, তুমি এসময়ে আমার বাড়িতে?'
রত্না আমতা আমতা করে বলেছিল,— 'না মানে, হঠাৎ বিদিশাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছিল তাই।'
বসন্ত বাবু খুব বিশ্রীভাবে বলেছিল,— 'তোমাকে অনুমতি দেওয়া আছে টাকার বিনিময়ে রাতটুকু এ বাড়িতে কাটানোর জন্য, তাও যদি আমার ইচ্ছা হয়, তবেই। তার বেশী কিছু আশা কোর না। আমি চাই না তোমার মতো কোন মেয়ের কোলে আমার মেয়েকে দেখতে।'
সেদিন রত্না শঙ্খচুড়ের ফণা তুলে হিসহিসে গলায় বলেছিল,— 'বেশী কমের কোন ব্যাপার নেই চৌধুরী বাবু। আমি আপনার কাছে কোন কিছুই আশা করি না। কতটুকু দেওয়ার ক্ষমতা আছে আপনার? আপনিতো আমার থেকেও গরিব। যে পয়সাটুকু আমি আপনার থেকে নিই, সেটা আপনাকে খুশী করে আমার শরীরটা বিক্রী করার বদলে, আপনার মতো লোকের কাছে আমার শরীরটা নোংরা করার বদলে। বরং আপনি ভেবে দেখুন আপনি আমার থেকে কি নিয়েছেন আর কতটা নিয়েছেন।'

সেদিন রত্না এই সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণায়, মনের মধ্যে জমে থাকা সমস্ত বিদ্বেষ, ঘৃণা, রাগ, অভিমান বিষের মতো উগরে দিয়েছিল। বলেছিল,— চৌধুরী বাবু, যে ভ্রমর দিনের বেলা সবার সামনে ফুলের মধু খায়, তাদের কথা লেখা থাকে বইয়ের পাতায়, কিন্তু যারা অন্ধকারে, সবার অলক্ষে, পাপ মনে, চোরের মতো নিশি পুষ্পের মধু খেয়ে সকাল বেলা ভুলে যায়, — ওটা আপনার মেয়ের বৃদ্ধা আয়ার সামনে বলে আপনাকে আর ছোট করলাম না।'
আর একমুহূর্তও না দাঁড়িয়ে রত্না চলে এসেছিল সেদিন, আর কোনদিন যায়নি। খুব কষ্ট হতো বিদিশার জন্য। কতদিন ভেবেছে সবকিছু ভুলে একটিবার গিয়ে দেখে আসে। কিন্তু পরক্ষণেই

নিজেকে এই বলেই সান্ত্বনা দিয়েছে যে,— 'এর পবে দুজনেরই টান বেড়ে গেলে বিদিশারই ক্ষতি হবে। শিশুটাকে পেটে ধরিনি ঠিকই, কিন্তু ও যে আমার মেয়ে আর আমি মা। মা হয়ে কি মেয়ের এত বড়ো সর্বনাশ করতে পারি?'
সাগরের কাছে এসে কাঁদতো রত্না। সাগর শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলতো,— 'মধুসূদনকে ডাক সব ঠিক হয়ে যাবে। তুইতো সমাজের নীলকণ্ঠ রে, তোর আবার ভয় কিসের?'

সাগরের হঠাৎ কেমন যেন ভয় ভয় করে। একটা কালো অন্ধকার চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। মনে মনে ভাবে,— 'কাল থেকে কি হবে? তার ওপর বাড়ি ভাড়ার টাকা।'

হঠাৎ বাড়ির বাইরে একটা চাপা কথাবার্তার আওয়াজ শুনে সাগর খাট থেকে নেমে জানালার পাল্লাটা অল্প ফাঁক করে দেখে, বাইরে বাড়িওয়ালার ছেলে অনিল আর তার তিন সঙ্গী টলতে টলতে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথাবার্তা বলছে। সাগরের গলা বুক শুকিয়ে যায়। জানালার সামনে থেকে সরে এসে মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। কি করবে ভেবে পায় না সাগর। একবার ভাবে চেঁচিয়ে লোক ডাকার চেষ্টা করবে কিনা।

আবার জানালার কাছে এসে উঁকি মেরে দেখে, অনিলের তিন সঙ্গী একটা সরু গাছের গুঁড়ির মতো কিছুর মাথায় থলে জাতীয় একটা কিছু বাঁধছে। সাগর মনে মনে বিপদের গুরুত্ব আন্দাজ করে তৈরী হয় পালানোর জন্য।

বাইরে অনিলদের বাঁধার কাজ শেষ হয়ে যায়। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে। কাল বিলম্ব না করে পিছনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরোনোর সময় বাইরের দরজায় ধপ্ ধপ্ করে কয়েকটা শব্দ শুনতে পায় সাগর, তারপরেই দরজা খোলার আওয়াজ।

বাড়ির পিছনে কলতলার দরজার কাছে এসে পিছন থেকে অনিলের কথাটা কানে ভেসে আসে,— শালী পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে। তাড়াতাড়ি চল।

কলতলার দরজার খিল খুলে দৌড়ে বেরিয়ে যায় সাগর।

(৭৩)

সাগর চুপ করে গিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশ সাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,— তারপর?
সাগর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করে,— পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে অন্ধকারে পুকুর পাড় দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগলাম আমি। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছি দেখার জন্য কেউ আসছে কিনা। পালানোর সময় মার ছবিটাও নিতে পারিনি। একবার মনে ভাবলাম,— 'ওরা তো আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে, এই ফাঁকে অন্যদিক দিয়ে ফিরে গিয়ে মায়ের ছবিটা নিয়ে আসব কিনা।'
কিন্তু সাহস হল না। ভাবলাম,— 'যদি ধরা পড়ে যাই?'
দৌড়ানোর আর ক্ষমতা নেই। মাটির এবরো খেবরো রাস্তা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাঁটতে লাগলাম। নিজের হৃদপিণ্ডের আওয়াজটা ধপ্ ধপ্ করে কানে আসছিল। কোথায় যাব জানি

না। শুধু জানি এখান থেকে পালাতে হবে। এই আশ্রয় আমার গেল। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা গাছের সামনে এসে হাঁপাতে লাগলাম। কতক্ষণ পথ চলেছি, কোথায় এসেছি জানি না। পা আর চলছে না। আগের দিন রাত থেকে পেটে কিছু পড়েনি, জল ছাড়া। আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে গাছের তলায় বসে পড়লাম আমি। কাঁদার শক্তি টুকু নেই আমার। মনে হচ্ছিল এই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাব। মন থেকে ভয় যায়নি তখনও। বসে বসে এদিক ওদিক দেখছি। যদি হঠাৎ পিছন থেকে এসে চেপে ধরে। হঠাৎ মনে পড়ল সঞ্জয়ের কথা। সঞ্জয়ের সাথে আলাপ খুব বেশী দিন নয়, কিন্তু ভালো লাগতো সঞ্জয়ের কথাবার্তা। বাবা মা নেই, একা থাকে। মনে মনে পছন্দ করতাম সঞ্জয়কে। কয়েকবার বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিল আমায়, কিন্তু আমি হ্যাঁ বা না কিছুই না বলে এড়িয়ে গিয়েছিলাম। সঞ্জয় আমাকে প্রায়ই বলতো, যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তাহলে ওকে নির্দ্বিধায় জানাতে। কিন্তু এত অভাবের মাঝেও কোনদিন সঞ্জয়ের কাছে কোন রকম সাহায্য নিইনি আমি। সঞ্জয় আরো একটা কথা আমাকে অনেকবার বলেছিল যে, আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে ও আমাকে কি একটা ব্যবসা করিয়ে দেবে যাতে অনেক টাকা রোজগার হয়। আমি বলেছিলাম পরে দেখা যাবে। আগে তো বি.এস.সি. টা পাশ করি। সঞ্জয় বলেছিল, পড়াশোনা করতে করতেও নাকি এই ব্যবসাটা করা যায়। কিন্তু আমি না করে দিয়েছিলাম, কারণ আমি চেয়েছিলাম আমি নিজে কিছু করব। সঞ্জয়কে ছাড়া ওই মুহূর্তে কাউকে আর মনে পড়ছিল না। মনে মনে ভাবলাম,-- এই বিপদের সময় একমাত্র সঞ্জয়ই পারে আমাকে আশ্রয় দিতে, আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাতে।
শরীরে শক্তি এনে গাছটাকে ধরে ধরে কোন রকমে উঠে দাঁড়ালাম। টলতে টলতে শুরু হল আবার পথচলা।

(৭৪)

সাগর কোন রকমে হাঁটতে হাঁটতে সঞ্জয়ের বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। দূর থেকে তাকিয়ে দেখে, বাড়ির ভিতর থেকে বন্ধ জানালা দিয়ে আলোর রেশ বাইরে আসছে। ক্লান্ত পায় এগিয়ে গিয়ে বাড়ির কাছে এসে দালানের সিঁড়িতে বসে পড়ে। ঘরের ভিতর থেকে অত রাতে ভেসে আসা মহিলা পুরুষের কণ্ঠস্বর আর হাসির আওয়াজে সাগর একটু অবাক হয়। কি করা উচিৎ বুঝতে পারে না। একবার ভাবে, চলে যাবে কিনা। আবার ভাবে, কোথায়ই বা যাবে, কার কাছেই বা যাবে।

সাগর উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে এসে ভয়ে ভয়ে কড়া নেড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সাগর খেয়াল করে ঘরের ভিতরের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর দরজাটা খুলে যায়। সঞ্জয় মুখ বাড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে যেন ভূত দেখে। কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে।

কয়েক মুহূর্ত পর চোখের বিস্ময় কাটিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করে,— তুমি! এতো রাতে?
সাগর উদ্বিগ্ন মুখে বলে,— আমার খুব বিপদ সঞ্জয়। তোমার কথা মনে পড়ল, তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম।
সঞ্জয় একটু ইতস্তত করে বলে,— কিন্তু —

সাগর মনে মনে একটু অবাক হয়। বলে,— অসুবিধা করলাম? চলে যাব?
সঞ্জয় তাড়াতাড়ি করে বলে না না যাবে কেন? ভিতরে এসো। কি চেহারা হয়েছে তোমার?
সাগর জিজ্ঞাসা করে,— ভিতরে কারা আছেন?
সঞ্জয় হেসে বলে,— আমরা দুই বন্ধু আর ওদের স্ত্রী। ওরা কোন ব্যাপার না, আমার খুব ভালো বন্ধু। এসো, ভিতরে এসো। সাগর শাড়ীর আঁচল দিয়ে শরীরটাকে ভালো করে ঢেকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। সঞ্জয় দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

(৭৫)

সাগর ঘরে ঢুকে দেখে একটা সোফায় একজন লোক আর তার স্ত্রী গা ঘেসে বসে আছে। মহিলার শাড়ীর আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। আর একটা সোফায় আরেকজন লোক ও তার স্ত্রী বসে। সামনে রাখা ছোট টেবিলে একটা অর্ধেক ভর্ত্তি মদের বোতল, পাশে খালি আর একটা ছোট মদের বোতল। পাঁচটা কম বেশী ভর্ত্তি মদের গ্লাস।

সাগরকে দেখে সবাই একবার সাগরকে আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে তারপর আবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সঞ্জয়ের দিকে। সাগর শাড়ীর আঁচলটা আর একবার ঠিক করে নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে সঞ্জয়ের দিকে তাকায়।

দ্বিতীয় সোফায় বসা লোকটা স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে। সঞ্জয়কে জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করে,— কি গুরু, আলাপ করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে নেই নাকি?
সঞ্জয় তাড়াতাড়ি করে জড়ানো গলায় হেসে বলে,— আরে না না।
সাগরকে দেখিয়ে সবাইকে বলে,— এই হচ্ছে সাগর, আমার বান্ধবী। ওর কথাতো তোদের আগেই বলেছি।
সাগর হাত তুলে সবাইকে নমস্কার জানায়। সাগর খেয়াল করে ওকে কেউ প্রতি নমস্কার জানালো না।
সাগরের দিকে ফিরে সঞ্জয় বলে,— সাগর, এরা হচ্ছে আমার খুব ক্লোজ ফ্রেণ্ড আর ওদের স্ত্রী। প্রথম সোফায় বসা বন্ধুকে দেখিয়ে সঞ্জয় আবার বলে,— আজ ওদের বিবাহ বার্ষিকী। এখানেই সেলিব্রেট করবে বললো, তাই আজ একটু আসরের আয়োজন হয়েছে।
সাগরের কেমন যেন একটা অস্বস্তি হয়। মন বলে,— 'কোথাও কিছু একটা গোলমাল লাগছে।'
যার আজ বিবাহ বার্ষিকী, সেই বন্ধু সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন!
সাগর হেসে উত্তর দেয়,— না, আমার শরীরটা ভালো নেই, আমি একটু বিশ্রাম নেব।
কথাটা বলে সাগর সঞ্জয়ের দিকে তাকায়।
সঞ্জয় তাড়াতাড়ি করে সাগরকে বলে,— তোমাকে দেখে অবশ্য খুব ক্লান্ত লাগছে। তুমি ভিতরের ঘরে চলো।
সঞ্জয় যাওয়ার সময় সাগরকে ধরার জন্য গায়ে হাত দিলে, সাগর হাতটা আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে সঞ্জয়ের সাথে ভিতরের ঘরে চলে যায়।

(৭৬)

ভিতরের ঘরে ঢুকে সাগর সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করে,— তুমি ড্রিঙ্ক করো?
সঞ্জয় হেসে বলে,— খুব রেয়ার। আজ ওরা খুব জোর করল তাই। যাই হোক তুমি শুয়ে পড়ো।
সাগরের সন্দেহ যায় না মন থেকে। সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,— মেয়ে গুলো ওরকম বিশ্রী ভাবে বসে আছে কেন?
সঞ্জয় হেসে উত্তর দেয়,— বারে, স্বামী স্ত্রী একসাথে বসে আছে, তাতে বিশ্রীর কি আছে?
সাগর চুপ করে যায়। মনে মনে বলে,— 'এই লোক গুলো আর মেয়ে গুলো ভালো নয়, হয়তো ওরা স্বামী স্ত্রীও নয়।'
সাগর সঞ্জয়কে বলে,— আমি ভীষন ক্লান্ত সঞ্জয়, আমি একটু ঘুমোব।
সঞ্জয় খাটের দিকে হাত দেখিয়ে বলে,— হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি শোও। কিন্তু কিছু খাবে না?
সাগর খাটের দিকে যেতে যেতে বলে,— না, আমার খিদে নেই। আমার ভীষন ঘুম পাচ্ছে।
খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ে সাগর বলে,— যাওয়ার সময় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যেও।
সাগরকে চোখ বুজতে দেখে সঞ্জয় কিছুক্ষণ সাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আলোটা নিভিয়ে, ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেয়।

ঘুম আসে না সাগরের। কেমন যেন একটা ভয় ভয় করতে থাকে। চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে সাগর ভয়ের কারণটা বোঝার চেষ্টা করে। সাগরের মনে হয়, কোথাও একটা খারাপ কিছু ঘটছে বা ঘটবে, কিন্তু সেটা কি বুঝতে পারে না। বাইরের ঘরে মহিলা পুরুষদের বসে থাকার ধরণটা চোখের ওপর ভেসে ওঠে।

হঠাৎ রত্নার কথা মনে পড়তেই, অর্পনা বৌদির আসরের কথা মনে আসে সাগরের। ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে।

দরজা খোলার আওয়াজে সাগর চুপ করে চোখ দুটোকে আধবোজা করে চেয়ে থাকে। সঞ্জয় এগিয়ে এসে সাগরের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর সাগরকে ডাকে,— সাগর — সাগর!
সাড়া না দিয়ে সাগর ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকে। সাড়া না পেয়ে সাগর ঘুমিয়ে গেছে ভেবে সঞ্জয় আবার চলে যায় দরজা বন্ধ করে দিয়ে।

সঞ্জয় চলে যেতেই সাগর খাট থেকে নেমে পড়ে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা অল্প ফাঁক করে দেখার চেষ্টা করে। ওদের সবার কথা গুলো কানে আসে সাগরের।

(৭৭)

সঞ্জয়ের বন্ধু দুজন তাদের স্ত্রীদের জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে অশালীন আচরন করতে দেখে সঞ্জয় হাসতে হাসতে বলে,— নাইট ইজ স্টিল ইয়ং মাই ফ্রেণ্ডস, এতো তাড়াহুড়োর কি আছে। আমার কথাটা তাহলে একবার ভাবো।
সঞ্জয়ের সামনের সোফায় বসা বন্ধু সঞ্জয়ের দিকে ঘুম ঘুম চোখে বলে,— কেন গুরু, তোমার তো ব্যবস্থা হয়েই গেল। ওই যে ওই ঘরে।

কথাটা বলে সঞ্জয়ের বন্ধু সাগরের ঘরের দিকে আঙুল দেখায়। সঞ্জয়, ঘরের দিকে একবার দেখে নিয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে, আস্তে কথা বলার জন্য। তারপর নীচু গলায় হেসে বলে,— আজকে তো আর হচ্ছে না। একটু সময় লাগবে।

সঞ্জয়ের পাশের সোফায় বসা বন্ধু পাশে বসা স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে সোফায় শুয়ে পড়ে বলে,— এতো ফার্স্ট ক্লাস মাল গুরু!

কথাটা বলে সঞ্জয়ের বন্ধু স্ত্রীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে টেনে নেয় মুখের ওপর।

সঞ্জয়ের সামনে বসা বন্ধু এবার জিজ্ঞাসা করে,— এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে গুরু?

সঞ্জয় মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে গ্লাসটা রেখে বলে,— অনেকদিন আগে ছিপ ফেলেছিলাম, এতদিনে টোপ গিলেছে মনে হয়।

কথাটা বলে সঞ্জয় পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে সামনের টেবিলে রাখে।

সামনে বসা বন্ধুর স্ত্রী এবার হেসে বলে,-- কিন্তু এর যা রূপের আগুন দেখছি, আমাদের বাজার না মেরে দেয়। কবে নামাচ্ছো লাইনে?

সঞ্জয় পকেট থেকে লাইটার বার করে মুখের সিগারেটটা ধরিয়ে লাইটারটা সিগারেটের প্যাকেটের ওপর রাখে। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়ার কতগুলো রিং ছেড়ে রহস্যময় হাসি হেসে বলে,— আর একটু অপেক্ষা করো। একটু খেলাতে হবে।

সঞ্জয়ের পাশের সোফায় স্ত্রীর কোলে মাথা রাখা বন্ধু স্ত্রীকে ছেড়ে সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে বলে,— আমি কিন্তু লাইনে প্রথম রইলাম।

সঞ্জয় হাসতে হাসতে বলে,— আরে দাঁড়াও, আগে আমি, তারপর তুমি।

তোমার মাল, তুমিতো আগে খাবেই। তারপরে কিন্তু আমি আছি।

স্ত্রীর বুকে হাত রেখে একটু জোরেই কথাটা বলে বন্ধুটা আবার।

সঞ্জয় ভিতরের ঘরের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলে,— আস্তে কথা বলো।

একটু থেমে আবার বলে,— দামটা কিন্তু একটু বেশীই লাগবে।

সামনে বসা বন্ধুটা এবার স্ত্রীর বুকে মুখ গুঁজে দিয়ে বলে,— দামের জন্য চিন্তা কোর না গুরু, যা চাইবে পেয়ে যাবে।

পাশের সোফায় বসা বন্ধুর স্ত্রী মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে বলে,— একটা সিগারেট ধরিয়ে দাওনা গো।

(৭৮)

সাগর এক নাগাড়ে বলে যেতে থাকে,— ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল। চোখ বড় বড় করে দরজার ফাঁক দিয়ে শুধু ওদের দেখে যাচ্ছিলাম আর বুকের ভিতরের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। বুঝতে পারলাম এটা আর একটা অর্পনা বৌদির মতো মধুচক্রের আসর। সঞ্জয়ের আসল রূপ অনেক দেরীতে বুঝতে পারলাম। নিজের ভুলের জন্য নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল। কি করে এখান থেকে পালানো যায় তাই শুধু চিন্তা করছিলাম। সঞ্জয়ের প্রতি ঘৃণায় মন ভরে গিয়েছিল। ভাবছিলাম, ভালোবাসা নিয়ে মানুষ এমন প্রতারণাও করতে পারে? এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে? এখান থেকে পালানোর কথা ভাবতে লাগলাম। ভোর রাত্রে সবাই যখন শুয়ে পড়েছে, আমি ওখান থেকে পালালাম। কিন্তু কোথায় যাব? আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই আমার। আমি একদম একা। উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললাম। বুক ফেটে কান্না আসছিল।

কি করব আমি, কোথায় আশ্রয় পাবো? চারদিকে হায়না আর নেকড়ের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বাঁচব কি করে এদের মধ্যে? শরীর আর দিচ্ছে না। মনে মনে শুধু মধুসূদনকে ডাকছিলাম। পা আর চলছিল না। পিচের রাস্তার ওপর হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম আমি। ওঠার আর ক্ষমতা নেই। কিছুক্ষণ ওই ভাবেই পড়ে রইলাম। তারপর আবার উঠে দাঁড়ালাম কোন রকমে। আবার চলতে শুরু করলাম। অনুশোচনা, ঘৃণা, ভয় আর হতাশায় নিজের প্রতি বিতৃষ্ণায় মনটা হঠাৎ ভরে গেল। মনে মনে ভাবলাম এভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, আর বেঁচে থাকার কোন মানেও হয় না। কতদিন নিজেকে রক্ষা করতে পারব? বেঁচে থাকা মানেই একসময় না একসময় কোন নরখাদকের হাতে শিকার হয়ে যাওয়া। মনে মনে ভাবলাম, আমি মায়ের কাছে চলে যাব। ঠিক করলাম আত্মহত্যাই একমাত্র পথ। মনে মনে মধুসূদনকে স্মরণ করে তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। দূর থেকে গঙ্গার ওপর দিয়ে বয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাস অনুভব করে বুঝলাম আর কিছুদূর এগোলেই গঙ্গা। সেদিকে পাগলের মতো দৌড়তে লাগলাম।

একনাগাড়ে বলে গিয়ে সাগর একটু চুপ করে দম নেওয়ার জন্য। আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— থাক আর শুনব না।

সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— না ঠাকুর, শুরু যখন করেছি তখন শেষ করতে দাও। এতদিন শুরুটাই শুধু দেখে এসেছি, শেষটা কোনদিন দেখতে পাইনি। আজ আমার জীবনের গল্পটা অন্তত তোমার কাছে শেষ করতে দাও।

আকাশ চুপ করে থাকে, সাগর আবার বলতে শুরু করে,— গঙ্গার ঘাটের কাছে এসে আর দৌড়নোর ক্ষমতা নেই আমার। ক্লান্ত পায়ে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। হঠাৎ পিছন থেকে একটা ডাক শুনতে পেলাম,— কে যাও?

আমি কোনদিকে না তাকিয়ে জলের দিকে এগোতে লাগলাম। আবার পিছন থেকে ডাকটা ভেসে এলো,— কে যাও?

আমার মনে হল যেন কোন অসহায় মানুষের করুন ডাক। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম, না আমায় কেউ দাঁড় করিয়ে দিল, বুঝতে পারলাম না। পিছন ফিরে দেখার চেষ্টা করলাম। দেখি, একটু দূরে অন্ধকারে কে একজন বসে আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমার একটুও ভয় করল না। লোকটা আবার বলে উঠল,— কে যাও? একটু এদিকে এসো না! আমি একজন অন্ধ মানুষ।

লোকটার ডাকে এমন কিছু ছিল, যে, মুহূর্তের মধ্যে আমার মনটা কেমন যেন পাল্টে গেল। নিজের আত্মহত্যার চিন্তার বদলে লোকটার জন্য খুব মায়া হল। আস্তে আস্তে লেকটার কাছে গিয়ে দেখি, একজন বৃদ্ধ লাঠিটা হাতে ধরে বসে আছে। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, কে আপনি? এত রাতে এখানে কি করছেন?

বৃদ্ধ আমাকে বললেন,— আমি একজন অন্ধ — মা। ছেলের খবর নিতে যাচ্ছিলাম রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। কাল রাত থেকে এখানে বসে আছি, ভোর হওয়ার অপেক্ষায়। সকাল বেলা আবার বেরোব। এখন কত রাত মা?

আমি বললাম,— একটু পরেই ভোর হবে। আপনার ছেলে কোথায় থাকে?

বৃদ্ধ আমায় বললেন,— আমার ছেলে বিদেশে চাকরী করে, এখানেও একটা অফিস আছে। আজ সকালে একটা চিঠি এসেছে। সবাই বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অফিসে গিয়ে দেখা করার জন্য। খুব জরুরী। কিন্তু কি লেখা আছে বলল না। বললাম, আমার সঙ্গে কাউকে আসার

জন্য। আমি একজন অন্ধমানুষ তার ওপর রাস্তাঘাট চিনি না। কিন্তু কেউ এলো না আমার সাথে।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম,— আপনার কাছে চিঠিটা আছে?
উনি বললেন,— হ্যাঁ মা, আছে।
বলে পকেট থেকে চিঠিটা বার করে দিলেন। আমি চিঠিটা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে ল্যাম্প পোষ্টের আলোয় চিঠিটা পড়ে চমকে উঠলাম। ফিরে এসে আবার ওনার হাতে চিঠিটা ধরিয়ে বললাম,— এই নিন।
উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,— কি লেখা আছে মা?
কিন্তু কি করে বলবো এই নির্মম সত্যিটা? চিঠিতে লেখা আছে, ওনার ছেলে কয়েকদিন আগে একটা পথ দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। লোকাল অফিসে বাড়ির লোককে যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু পুত্রহারা অন্ধ বৃদ্ধকে তার একমাত্র সন্তান হারানোর কথা বলতে গিয়েও পারলাম না। মনে ভাবলাম, 'কদিনই বা বাঁচবে, এই বয়সে পুত্র শোক! সন্তান হারানোর শোক যদি সহ্য করতে না পারে? আ-হারে, কত আশা নিয়ে ছেলের খবর নিতে এসেছে। ওনার প্রতি কেমন যেন একটা করুনা হল। বুঝলাম আমার থেকেও অসহায় এই পৃথিবীতে আছে।
আমি চুপ করে আছি দেখে বৃদ্ধ আমায় আবার জিজ্ঞাসা করলেন,— কই বললে নাতো মা?
মধুসূদনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমি ওনাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,— সে রকম কিছু নয়। লেখা আছে, আপনার ছেলের ফিরতে দুবছর সময় লাগবে। কারণ, কি একটা ট্রেনিং নেওয়ার জন্য কোম্পানী থেকে আপনার ছেলেকে অন্য দেশে পাঠিয়েছে। যদি আপনি খোঁজ করতে চান তাহলে এই অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
বৃদ্ধ মুখের উৎকণ্ঠা সরিয়ে হাসি এনে বললেন,— এই খবর! আমি ভয় পাচ্ছিলাম কোন খারাপ খবর বুঝি। আসলে বাপের মনতো মা। একটা মাত্র ছেলে। ওছাড়া আমার যে আর কেউ নেই। আমাকে ছেড়ে বিদেশে যেতে চায়নি। আমিই জোর করে পাঠিয়েছিলাম।
আমি চুপ করে রইলাম। বৃদ্ধ বাবার মন থেকে তখনো বোধহয় ভয়টা পুরোপুরি যায়নি। চিন্তিত ভাবে আবার বললেন,— কিন্তু আমার ছেলেতো আমায় কিছু জানালো না। দুমাস হয়ে গেল টাকাটাও আসছে না।
আমি আবার মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,— মাঝখানে অনেকদিন পোষ্ট অফিসের গণ্ডোগোল চলছিল এবার হয়তো এসে যাবে।
উনি চুপ করে গেলেন। আমিও মনে মনে ভাবলাম,— 'এবার উঠে পড়ি, ভোর হয়ে আসছে। আমার অন্ধকার ভাগ্যের সমাপ্তিটা এই অন্ধকারেই হোক।'
আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। এগোতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, আমিতো মুক্তি পেয়ে যাব, কিন্তু এই অন্ধ, সন্তান হারা অসহায় বাপটা কি করবে? একদিন না একদিন তো জানতে পারবেই ছেলের মৃত্যুর খবর, তখন কি হবে এই মানুষটার? বৃদ্ধর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে ভাবলাম,— 'আমি বাঁচার জন্য মরতে চলেছি আর এই মানুষটা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মরার জন্য বাঁচতে চাইছে। নিজের মনেই হেসে ফেললাম। মধুসূদনকে স্মরণ করে বললাম, ঠাকুর তোমার খেলা তুমিই জানো, কিন্তু আমাকে শুধু এইটুকু বলো, শান্ত মনে মরার অধিকারও কি আমার নেই?'
মনকে শক্ত করে এগোনর জন্য তৈরী হলাম। কিন্তু কে যেন আমাকে আমার মনের ভিতর

থেকে প্রশ্ন করল,— 'সব জেনেও এই বৃদ্ধকে একলা ফেলে রেখে চলে যাবি তুই? মরার আগে কিছুই কি করতে পারিস না তুই এই বৃদ্ধর জন্য? মরার সময়তো পড়েই আছে। হয়তো তোর মধুসূদনই অন্যরূপে তোর কাছে এসেছে সেবা নেওয়ার জন্য।'
মনের ভিতর একটা দ্বন্দের সৃষ্টি হল। কি করব যখন ভাবছি এমন সময় বৃদ্ধ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন,— তুমি কে মা? এতো রাতে তুমি এখানে কি করছ?
জানো ঠাকুর, সেদিন বৃদ্ধর করা প্রশ্নটা ছিল খুব সাধারণ, খুব সরল, কিন্তু আমার সেই মুহূর্তে কেন জানি না মনে হল, কত যুগ পরে কেউ আমাকে কত আদর করে, স্নেহ ভরে আমার কথা জানতে চাইছে। প্রশ্নটা সরাসরি আমার বুকের মাঝে গিয়ে পৌছল। আমি আস্তে আস্তে আবার বসে পড়লাম বৃদ্ধর পাশে। বললাম,— আমি? আমি একজন অসহায় একা একটা মেয়ে বাবা। এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই এক মধুসূদন ছাড়া।
আমার কথা শুনে বৃদ্ধ বললেন,— সেকি মা! তুমি অসহায় কেন হতে যাবে? আর একাই বা ভাবছ কেন?
আমি অবাক চোখে তাকালাম বৃদ্ধর দিকে। বৃদ্ধ হাতটা দিয়ে আমাকে খোঁজার চেষ্টা করতে আমি হাতটা এগিয়ে দিলাম। আমার হাতটা ধরে বললেন,— কোন মানুষই অসহায় নয়। ঈশ্বর সদা সর্বদা তার পাশে পাশে আছে। শুধু একটু খুঁজে নিতে হয়। তুমিতো বলছো তোমার মধুসূদন আছে। তাহলে তোমার চিন্তা কিসের মা?
একটু থেমে আবার বললেন,— তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমায় বলো না তোমার কথা!
চোখ থেকে জলের ধারা নামলো। আমি বৃদ্ধর হাত দুটো ধরে সবকথা খুলে বললাম। কথা বলতে বলতে কখন যে ওনার কোলে মাথা রেখেছি আমার খেয়াল নেই। আমার সব কথা শুনে পরম স্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,— ছিঃ মা, জীবন অমূল্য। ঈশ্বরের দান। একে নষ্ট করার অধিকার তোমার নেই। আত্মহত্যা করা যে মহা পাপ। তুমি না একটু আগে বললে, মধুসূদন তোমার বন্ধু! তাকে তুমি অবমানা করবে?
একটু থেমে আবার বললেন,— আমার কোন মেয়ে নেই। আজ থেকে তুমি আমার মেয়ে, আর আমি তোমার বাবা। আমার সাথে চলো তুমি।
আমি মুখ তুলে বৃদ্ধর দিকে তাকিয়ে রইলাম। অবাক হয়ে ভাবলাম,— 'আমার মধুসূদন আবার নতুন করে কি খেলা খেলছে আমার সাথে!'
এই সরল প্রাণ মহান হৃদয় বৃদ্ধর পিতৃ স্নেহ আমাকে মুহূর্তের মধ্যে হতাশা সরিয়ে সব দুঃখ কষ্ট যেন ভুলিয়ে দিল। মনে ভাবলাম,— 'আমি তো মরতেই পারি, কিন্তু এই সন্তানহারা অন্ধ অসহায় মানুষটার কি হবে? আমিতো পরেও মরতে পারি। যে মানুষটা এক মুহূর্তে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে পিতৃস্নেহ দিতে চাইছে, কিছুদিন তার মেয়ে হয়ে না হয় তার সেবাই করলাম। হয়তো আমার মধুসূদন তাই চাইছে। না হলে, মরতে এসে এই বৃদ্ধর সাথে দেখাই বা হবে কেন? আটকেই বা গেলাম কেন?'
আমার কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন,— কি মা, যাবে না আমার সাথে?
আমি ওনার কোলে মাথা রেখে বললাম,— যাব বাবা, নিশ্চই যাব।
উনি পরম স্নেহে আমার মাথায় হাত বোলাতে থাকলেন।
লোভী, স্বার্থপরদের ভীড়ে এই অনন্য বৃদ্ধর পিতৃত্বের আন্তরিক ডাকে আমি নিজেকে সঁপে

দিলাম। মরা আমার হল না ঠাকুর। আমার মধুসূদন আমার মনের ভিতর ঢুকে আমায় অন্যদিকে চালনা করল। আমি যেন বাঁচার ক্ষীন আলো দেখতে পেলাম। বৃদ্ধর মুখটা যেন আগেব থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পূব আকাশে তাকিয়ে দেখি কে যেন লাল রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে। বুঝলাম একটু পরেই সূর্য্য উঠবে। দূরে মাঝগঙ্গায় ভেসে যাওয়া নৌকা থেকে মাঝিদের গাওয়া ভোরের গান কানে ভেসে এসে আমার মনটাকেও যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কোন এক অচিন দেশের ঠিকানায়। খুব ভালো লাগছিল আমার। কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলাম মাঝগঙ্গায় ভেসে যাওয়া নৌকার দিকে। তারপর একসময় বৃদ্ধ মানুষটাকে ধরে ধরে বেরিয়ে গেলাম গঙ্গার ঘাট থেকে। মাটির রাস্তা হয়ে পিচ ঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে ট্রেনে ওঠার জন্য গিয়ে পৌছলাম ষ্টেশনে।

আকাশ দালানের খুঁটিটা ধরে ওঠার চেষ্টা করতে সাগর জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছ?
— পা দুটো কেমন যেন অবশ লাগছে। উঠোনে একটু পায়চারী করব। — উঠতে উঠতে আকাশ উত্তর দেয়।
সাগর উঠে দাঁড়িয়ে আকাশকে ধরে ধরে সিঁড়ি থেকে উঠোনে নামিয়ে আকাশের সাথে সাথে হাঁটতে থাকে। আকাশ এক হাত দিয়ে সাগরের কাঁধটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করে,— তারপর?
সাগর মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে আবার বলা শুরু করে,— ট্রেনের কামরায় জানালার ধারে বসে, দ্রুত পিছনে সরে যাওয়া সবুজ ছবির ওপর চোখ রেখে মনকে আরো দ্রুত গতিতে ট্রেনের আগে ছুটিয়ে দিলাম অজানার উদ্দেশ্যে। আমার নতুন বৃদ্ধ বাবার সাথে তার বাড়িতে গিয়ে পৌছলাম। শুরু করলাম নতুন ভাবে বাঁচার চেষ্টা। কিন্তু সমস্যা আমার মেটেনি, বরং নতুন আর একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হল। সমস্যাটা আমার পরিচয় নিয়ে। কে আমি? তার ওপর আবার অবিবাহিতা। কোথা থেকে হঠাৎ এলাম? চাপা গুঞ্জন শুরু হল চারিদিকে। কিছু নোংবা রটনার কথা আমার কানে এলো। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পাড়ার লোকজন তাকিয়ে থাকত আমার দিকে, শুনতে পেতাম হাসাহাসি, ফিস্‌ফিসানি। মনে ভাবি মানুষের মন এত নোংবা হয় কেন? সবের মধ্যেই আগে খারাপটা চিন্তা করে কেন? আমাদের বাড়ি ওয়ালা এক মুদি। তিন সন্তানের পিতা। দোকানে মাল কিনতে গেলে নানা ছুতোয় দেরী করতো। আমার শরীরের দিকে বিশ্রী ভাবে তাকিয়ে থাকতো। এখানেও সেই একই ঘটনা। বিদেশ থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে, বেশ কয়েক মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ে গিয়েছিল। বাড়ীওয়ালা একদিন বাড়িতে এসে হাজির, অনেকদিনের বকেয়া ভাড়া আদায় করতে। বাবা কয়েকদিন সময় চেয়ে নিলো বাড়ি ওয়ালার কাছে, কিন্তু কথা রাখতে পারল না। এইভাবেই চলল কিছুদিন সময় দেওয়া নেওয়ার পালা। একদিন দুপুরে ভাড়া চাইতে এসে আমাকে বাড়িতে একা পেয়ে বাড়ি ওয়ালা সওদা করতে চাইলেন, সেই একই নোংরা কুরুচিকর প্রস্তাব দিয়ে। হয় ভাড়া দাও না হলে ঘৃণ্য প্রস্তাবে রাজী হও। বাড়ি থেকে তক্ষুণি বেরিয়ে যেতে বললাম। যাওয়ার আগে সে শাসিয়ে গেল, আগামী কালের মধ্যে তার ভাড়া চাই। একদিন পর সকালে বাড়িওয়ালা লোকজন নিয়ে উপস্থিত। ঘরের জিনিষপত্র বাইবে টেনে ফেলে দিল। চারপাশের মানুষজন যেন নীরব দর্শক। যেন কোন মজার খেলা দেখছে। বৃদ্ধ বাবাকে জড়িয়ে ধরে নীরবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে দেখা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। মনে মনে ভাবলাম, মনুষ্যত্ব, বিবেক এই কথা গুলো কি শুধু বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ? মানুষ কথাটার মানে কি?

এক অসহায় আর এক অসহায়কে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে জনতার ভীড়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। .এত তাড়াতাড়ি মজা শেষ হয়ে যাওয়ার আপশোষে, ভীড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন এই বৃদ্ধ মানুষটাকে ঘাড় ধরে ঠেলে ফেলে দিল। বিনা প্রতিবাদে বাবাকে তুলে দাঁড় করিয়ে হাতে লাঠিটা তুলে দিলাম। আবার জড়িয়ে ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। পিছন থেকে কানে ভেসে আসছে গনদেবতার উদ্দাম হাসি। মনে মনে মধুসূদনকে প্রশ্ন করলাম,— 'হে মধুসূদন, এরা কি তোমারই সৃষ্টি, নাকি সৃষ্টির ভুল?'

(৭৯)

রাতের অন্ধকার চিড়ে নিস্তব্ধতাকে ছিঁড়ে ফেলে দ্রুত গতিতে ট্রেনটা ছুটে চলেছে। মাঝ রাতের ঘুমন্ত কামরার মধ্যে জানালার পাশে বসে সাগর জানালার বাইরের অন্ধারের দিকে তাকিয়ে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে চলেছে। একহাতে ধরা পাশে বসা বৃদ্ধ বাবার হাতটা।

সাগর নতুন বৃদ্ধ বাবার দিকে তাকিয়ে ডাকে,— বাবা!

— কি মা?

— কোথায় যাচ্ছি আমরা?

— আমার ছেলেবেলার এক বন্ধুর কাছে। আমরা একসাথে বড়ো হয়েছি। দুজনে দুজনের মাকেই মা বলতাম। অনেকবার যাওয়ার জন্য লিখেছিল আমাকে। আমার বর্তমান আর্থিক অবস্থার কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। কিছুদিন আগে উত্তর এসেছে। যাওয়ার জন্য লিখেছে।
— উত্তর দেয় বৃদ্ধ।

সাগর চুপ করে বাইবের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বৃদ্ধ সাগরের কাছে মুখটা নিয়ে এসে নীচু গলায় বলে ওঠে,— একটা কথা বলব মা?

— কি কথা বাবা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বৃদ্ধ বলে,— তোমার কথাই আমাকে ভাবাচ্ছে বেশী। তোমাকে মেয়ে বলে ডেকেছি। তুমি আমার মেয়ে। তাই তোমার ভবিষ্যতের মঙ্গলের কথা ভেবেই কথা গুলো বলছি।

একটু থেমে আবার বলে,— আমি কবে আছি, কবে নেই, জানি না কতদিন বাঁচব। কিন্তু তোমাকে তো এখনও জীবনের অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে মা।

সাগর হেলান দিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে কথা গুলো শুনতে থাকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বৃদ্ধ আবার বলে,— দেখছ তো, চারপাশের মানুষের লুকিয়ে থাকা হিংস্র চেহারাটা। এর মধ্যে দিয়েই তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের সমাজে একা একটা মেয়ের বিপদ তার চারপাশে সর্বদাই ঘোরা ফেরা করে। বিশেষ করে সে যদি অবিবাহিতা হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

সাগর বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,— আমি বুঝতে পারলাম না বাবা।

বৃদ্ধ অন্ধ চোখে সাগরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে,— পৃথিবীতে অনেক প্রাণী আছে, যারা বিপদ দেখলে একটা খোলস বা শক্ত আবরনের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। আমরা মানুষরাও আত্মরক্ষার জন্য অনেক পথই অবলম্বন করি। ছদ্মবেশও এর একটা ছোট অঙ্গ বলতে পারো।

সাগর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,— ছদ্মবেশ!

বৃদ্ধ বাবা তার নতুন মেয়েকে আরো ভালো করে বোঝানোর জন্য বলে,— চারিদিকে মানুষবেশী শয়তান গুলো লুকিয়ে আছে। একা একটা কুমারী মেয়েকে দেখলেই চক্ চক্ করে ওঠে এদের চোখ গুলো।
সাগর বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধর দিকে।
বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলে,— তুমি বিবাহিতা স্ত্রী সাজো এখন থেকে, যতদিন না মনের মতো কোন মানুষ পাচ্ছ। একে আমি একজন অন্ধ, বৃদ্ধ। আমার থাকা না থাকা দুই-ই সমান। তার ওপরে আমার জীবন অনিশ্চিত। কে বাঁচাবে তোমায়?
সাগরের সমস্ত চিন্ত গুলো কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। কিছু একটা বলবার জন্য বলে,— কিন্তু বাবা —
সাগরকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বাবা হেসে বলে, সংস্কারে বাধছে মা? ন্যায় অন্যায় বোধ জাগছে? কিসের সংস্কার, কিসের অন্যায়? কার জন্য, কার কাছে? সুস্থ, ভালোভাবে এবং শান্তিতে বাঁচতে চাওয়াটা কি অপরাধ? তুমি কোন অন্যায় করছ না মা, আমি তোমায় বলছি।
সাগর বাবাকে জিজ্ঞাসা করে,— কিন্তু যেদিন লোকে জানতে পারবে বাবা?
বাবা এক হাত দিয়ে খুঁজে খুঁজে তার মেয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বলে,— তুমি আমায় বাবা ডেকেছ বলেই শুধু নয়, আমিও প্রথম দিন থেকেই তোমাকে আমার মেয়ে করে নিয়েছি। তুমি আমার জন্য যা করেছ তা নিজের মেয়েও অনেক সময় করে না। পৃথিবীতে কোন বাবা আছে বলতে পারো, যে তার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে ফেলে মেয়েকে কুমারী স্ত্রী সাজায়? অনেক যন্ত্রণায়, ভয়ে তোমাকে আমি কথা গুলো বললাম। যদি কাল না থাকি? একথা জানব শুধু আমি, তুমি আর তোমার গোপাল ঠাকুর। আর সবাই জানবে তুমি আমার ছেলের বিবাহিতা স্ত্রী। অবশ্য এতেও বিপদ কেটে গেল বলে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। কিন্তু আত্মরক্ষার চেষ্টা তো করতে হবে মা!

অন্ধকার রাতের নিস্তব্ধতাকে টুকরো টুকরো করে সিটি বাজিয়ে দূর পাল্লার ট্রেনটা ছুটে চলেছে তীব্র বেগে।

(৮০)

সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে সিঁদুরের টিপ, শাঁখা পলা পড়ে সাগর বাবাকে ধরে ধরে এসে পৌঁছয়, খড়ের ছাউনি দেওয়া একটা মাটির বাড়ির সামনে। নিজের দুহাতের শাঁখা পলা দেখে মনে মনে বলে,— 'শুরু হল আমার জীবন নাটকের নতুন পালার অভিনয়।'
বৃদ্ধ চেঁচিয়ে ডাকে,— অরবিন্দু — ও অরবিন্দু।
ভিতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। সাগর বাবাকে ধরে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পর একটা স্বাস্থ্যবান লোক ধুতির লুঙ্গি পরে, খালি গায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাগরদের দেখে রুক্ষ ভাবে জিজ্ঞাসা করে,— কি ব্যাপার?
বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে,— অরবিন্দু আছে?
লোকটা সাগরকে আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে,— কোথা থেকে আসছেন?

সাগর মনে মনে ভাবে,— লোকটা কেমন যেন কাঠখোট্টা ধরনের। কথা বলার ধরনটাও সেরকম।

বৃদ্ধ উত্তর দেয়,— আমরা দূর থেকে আসছি, বললে চিনতে পারবেন না, জায়গাটার নাম শিমূলপুর। অরবিন্দু আছে?

লোকটা কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করে,— আপনারা কে?

কথাটা বলে,— সাগরকে দেখতে থাকে লোকটা।

বৃদ্ধ হেসে বলে,— এই গ্রামেই জন্ম আমার। অরবিন্দু আমার সেই ছোট বেলার বন্ধু। আমরা আমাদের দুজনের মাকেই মা বলতাম। অরবিন্দু আমায় চিঠি লিখেছিল এখানে এসে থাকার জন্য।

সাগরের দিকে হাত দেখিয়ে বলে,— ও আমার বৌমা। আমার ছেলে বিদেশে চাকরী করে।

বৃদ্ধ এবার লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে,— আপনি কে ভাই?

মুহূর্তের মধ্যে লোকটার মুখের ছবিটা পাল্টে যায়। সাগরের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধকে নরম গলায় বলে,— আমার নাম মুকুন্দ। আপনার বন্ধুর ছেলে। বাবা গত পরশু মরে গেছে।

কথাটা বলে মুকুন্দ একবার' সাগরের, একবার বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করে।

হতাশ হয়ে সাগর মনে মনে বলে,— 'হায়রে, অভাগা যেদিকে যায়, সাগর শুকায়ে যায়।'

বৃদ্ধ নিরাশ গলায় বলে,— অরবিন্দু মারা গেছে! 'ও' —

সাগর মনে মনে চিন্তা করে,— 'দুদিন আগে বাবা মারা গেছে, অথচ লোকটাকে দেখে তো বোঝা যাচ্ছে না।'

— আচ্ছা বাবা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি অরবিন্দুর আত্মা যেন শান্তি পায়। — মুকুন্দর উদ্দেশ্যে কথা গুলো বলে, বৃদ্ধ এবার সাগরের উদ্দেশ্যে বলে,— চলো বৌমা। যার কাছে আসা, সেই যখন নেই।

সাগর মনে মনে ভয় পায়। ভাবে,— 'তাহলে? - এরপর বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে কোথায় যাব?'

মুকুন্দ হঠাৎ চোখে মুখে হাসি ভরিয়ে বলে ওঠে,— না না কাকাবাবু, যাবেন কি! বাবা নেই তো কি হয়েছে, আমি কি আপনার কেউ নই?

দালান থেকে নেমে কাছে এসে অমায়িক ভাবে বলে,— আসুবিধার তো কিছু নেই, নিজের বাড়ি মনে করে কটা দিন এখানে থেকেই যান না! আপনারা থাকলে আমারও ভালো লাগবে।

সাগর সন্দিগ্ধ মনে তাকিয়ে থাকে মুকুন্দর দিকে। মনে মনে ভাবে,— 'লোকটার ব্যবহারের সাথে, মুখের ছবিটা তো মিলছে না!'

বৃদ্ধ কথা না বলে চুপ করে থাকে। মুকুন্দ ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বলে,— আসুন।

কথাটা বলে মুকুন্দর সাগরকে সামনে হাত দেখিয়ে ইশারা করে এগোনোর জন্য।

সাগর বাবাকে ধরে মুকুন্দর সাথে ধানের গোলাটাকে পিছনে ফেলে হাঁটতে হাঁটতে সামান্য কিছুদূরে আর একটা খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়ির সামনে এসে পৌছয়।

সাগর চারিপাশে তাকিয়ে দেখে, আশে পাশে একটু দূরে দূরে আরোও কয়েকটা এরকম বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

মুকুন্দ দালানে উঠে পকেট থেকে চাবি বের করে দরজার তালা খুলে বলে,— আসুন।

কথাটা বলে মুকুন্দ ঘরে ঢুকে যায়। সাগর বাবাকে ধরে ধরে দালানে উঠে ঘরের ভিতরে ঢোকে।

(৮১)

সাগর আকাশের হাতটা ধরে পাশে হাঁটতে হাঁটতে জোৎস্না রাতের অন্ধকাবের দিকে তাকিয়ে বলে যায় অতীতের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা,— মুকুন্দ সারাক্ষণ কথা বলতে বলতে বিশ্রী ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমার অভিজ্ঞতা আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমায় বলে দিল বিপদ আমার কাটেনি। সেদিন সন্ধ্যার সময় মুকুন্দ আবার এলো। নানা ভাবে জানতে চাইলো আমরা স্বামী বিদেশে কোথায় চাকরী করে, কি চাকরী করে কতদিন আসছে না। বাবা মুকুন্দকে বিশ্বাস করে বলল,— আমরা এখানে পাকাপাকি ভাবে থাকার জন্যই এসেছি এবং এই মুহূর্তে আমাদের আর কোন থাকার জায়গা নেই। মুকুন্দর বাবার সাথে সেই রকমই কথা হয়েছিল। মুকুন্দ খুব খুশী হয়ে আমাদের নানা রকম আশ্বাস দিয়ে চলে গেল। কিন্তু আমার মন কেন জানি না বলছিল, এবার বিপদ অনেক বেশী। মুকুন্দ নানা রকম ছুতো করে মাঝে মাঝেই চলে আসতো একেবারে ঘরের ভিতর এবং যতক্ষণ থাকতো আমার দিকে বিশ্রী ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো। মুকুন্দর বৌ পদ্মর সাথে আলাপ হয়েছিল এর মধ্যে। খুব ভালো লেগেছিল মেয়েটাকে। কয়েকদিন পর একদিন দুপুরে মুকুন্দ হঠাৎ এসে হাজির। মুখ দিয়ে ভীষণ ভাবে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। বাবা তখন পাশের ঘরে বিশ্রাম করছে। আমার কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। এই কদিনে আমি অবশ্য জেনে গেছি, যে, স্থানীয় লোকেরা মুকুন্দকে খুব ভয় করে। ওর দলের প্রত্যেকটা লোক, কোন না কোন কারণে জেল খেটেছে। খারাপ কাজে লিপ্ত মুকুন্দ কয়েকদিন আগে খুনের দায়ে ধরা পড়েছিল এবং প্রমাণাভাবে ছাড়া পেয়েছে। সেদিন দুপুরে মুকুন্দর আমার কাছে সরাসরি প্রস্তাব ছিল এখানে থাকতে গেলে তাকে খুশী করতে হবে এবং এখনই। বাবার কথা মনে করে, ও আবার আশ্রয়হীন হওয়ার ভয়ে মুকুন্দকে নানা ভাবে বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলাম, যে, আমি একজনের বিবাহিতা স্ত্রী, তাছাড়া ওনারও স্ত্রী আছে এবং উনি যা বলছেন সেটা ঠিক নয়। কিন্তু মুকুন্দ নাছোড় বান্দা। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। আমি রাজী হচ্ছি না দেখে আমার ওপর রেগে গিয়ে আমার হাত দুটো চেপে ধরে আমার ওপর জোর খাটানোর চেষ্টা করতে লাগল। আর আমি বিনা চীৎকারে নিজেকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া প্রয়াস চালাতে লাগলাম। আমার মধুসূদন সেদিন ত্রাতার ভূমিকায় সেই সময় পাঠালো মুকুন্দর বউকে। পদ্মকে দেখে মুকুন্দ একটু থতমত খেয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পদ্ম আমার কাছে এগিয়ে এসে কোন কথা না বলে আমার চোখে চোখ রেখে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে গেল, কিন্তু রেখে গেল একটা আশ্বাস। সেদিন পদ্মর চোখ যেন এটাই বলে গিয়েছিল যে,— 'আমি থাকতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।' সেদিন দুপুরে আমি বেঁচে গেলাম ঠিকই, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। আবার বিপদ এলো সেদিনই সন্ধ্যার সময়। বাবা তখন পাশেই ছোটবেলার কোন এক বন্ধুর বাড়িতে গেছে।

(৮২)

সাগর বাইরের ঘরে বিছানার কাছে পিছন ফিরে কাপড় ভাঁজ করতে করতে দালানের দরজার একটা আওয়াজ শুনে চমকে ওঠে। পিছন ফিরে দরজা আগলে মুকুন্দকে দাঁড়িয়ে টলতে দেখে

ভয় পেয়ে গিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। মুকুন্দ সাগরকে কোন রকম সুযোগ না দিয়ে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে ঠেলে বিছানায় শুইয়ে দেয়। সাগর নিজেকে আপ্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করতে করতে বলে,— ছাড়ুন, ছেড়ে দিন বলছি।

মুকুন্দর চোখে মুখে একটা হিংস্র ভাব ফুটে ওঠে। সাগরের শাড়ীটা টেনে খুলে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। সাগর বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলে,— আমি চেঁচিয়ে লোক ডাকবো কিন্তু।
মুকুন্দ সাগরের মুখে হাত চাপা দিয়ে শাড়ীর কুঁচিটা একহাতে টানার চেষ্টা করতে করতে বলে,— যত পারিস চেঁচা, কেউ আসবে না।

সাগর মুকুন্দর শক্তির সাথে পেরে না উঠে একহাতে কোন রকমে শাড়ীর কুঁচিটা শক্ত করে ধরে রেখে আর একহাতে মুকুন্দর মুখে চাপা দেওয়া হাতটা ধরে জোরে কামড়ে দেয়। যন্ত্রণায় মুকুন্দর হাতটা আলগা হতেই সাগর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে মুকুন্দকে জোরে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মুকুন্দ সাগরকে জোরে একটা চড় মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে সাগরকে ধরতে যেতেই সাগর পাল্টা চড় মারে মুকুন্দকে। নেশাগ্রস্থ মুকুন্দ চড়ের ধাক্কায় নিজের শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে মাটিতে পড়ে যায়। সাগর তাড়াতাড়ি করে উঠে দাঁড়িয়ে পালানোর জন্য দরজার দিকে এগোনর চেষ্টা করে। মুকুন্দও দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে হিংস্র দৃষ্টিতে এগিয়ে আসে সাগরের দিকে।

হঠাৎ পদ্ম ঘরের ভিতর ঢুকে মুকুন্দর হাতটা চেপে ধরে বাধা দিয়ে বলে,— না, ওকে ছেড়ে দাও। মুকুন্দ হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পদ্মর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখে একটা ঘুষি মেরে ফেলে দেয় পদ্মকে। পদ্ম ছিটকে মাটিতে পড়ে গিয়ে দরজায় কপালটা ঠুকে যাওয়াতে রক্ত বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্য মাথাটা ঘুরে যায় পদ্মর।

মুকুন্দ জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে সাগরের দিকে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে। সাগর নিজেকে বাঁচানের জন্য কিছু পাওয়া যায় কিনা, দেখার জন্য এদিক ওদিক দেখতে দেখতে পিছিয়ে গিয়ে আগুন ঝড়া দৃষ্টিতে মুকুন্দকে বলে,— তুমিও কিন্তু বাঁচবে না। আমি তোমার টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে দেব।

পদ্ম কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে ঠোঁট আর কপাল থেকে রক্ত ঝড়তে থাকা অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে, পিছনে গোঁজা কাস্তেটা টেনে বার করে। তারপর দৌড়ে সাগরের সামনে এসে সাগরকে শরীর দিয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়ে কাস্তেটা তুলে ধরে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর দৃষ্টিতে মুকুন্দকে বলে,— ভালো চাওতো চলে যাও। অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছ তুমি। কিন্তু আর না। এই কাস্তে দিয়ে শেষ করে দেব আজ তোমায়।
মুকুন্দ দাঁড়িয়ে গিয়ে পদ্মর চোখে চোখ রেখে কঠিন দৃষ্টিতে বলে, পদ্ম চলে যা এখান থেকে, এর পরিণাম ভালো হবে না।
পদ্ম কাস্তেটা আরো শক্ত করে ধরে বলে,— মেরে ফেলবে আগের বৌটার মতো? আমি বেঁচে যাব রে শয়তান, কিন্তু আমি থাকতে এই মেয়েটার এত বড় সর্বনাশ কিছুতেই হতে দেব না। তুই যা পারিস করে নিস আমার।

মুকুন্দ কিছুক্ষণ পদ্মর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর একবার সাগরকে দেখে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে দরজার কাছে চলে যায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলে,—

এটাই শেষ নয়। বাকী রয়ে গেল। তোকে আমার চাই। পালানোর পথ ও সব বন্ধ করে দিয়েছি।
পদ্মকে একবার দেখে নিয়ে সাগরকে আবার বলে,— দেখি তোকে কে বাঁচায়।
কথা গুলো বলে মুকুন্দ বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। পদ্ম তাড়াতাড়ি করে দরজার কাছে এসে বাইরের মুকুন্দর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পর মুকুন্দকে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেখে পদ্ম ঘুরে দাঁড়িয়ে সাগরের মুখটাকে ভালো করে দেখতে থাকে। সাগর পদ্মর দিকে তাকিয়ে বলে,— দিদি —
পদ্ম সাগরের গালে হাত দিয়ে হাসি মুখ করে আশ্বাস দিয়ে বলে,— আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, তোমার কোন ভয় নেই বোন। একটা কথা বলতে খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু না বলেও উপায় নেই।
পদ্ম দরজার দিকে একবার দেখে নিয়ে নীচু গলায় আবার বলে,— আজ রাতেই তোমরা বাড়ি ছাড়ো।
— আজ রাতেই? কিন্তু বৃদ্ধ মানুষটাকে নিয়ে এই অন্ধকারে কোথায় যাব? বাবা চোখে দেখে না। তাছাড়া আমিও এখানকার পথঘাট চিনি না। — ভয়ে, উৎকণ্ঠায়, উদ্বিগ্ন মুখে সাগর কথা গুলো বলে পদ্মকে।
পদ্ম সাগরের হাতটা ধরে বলে,— আমি সব বুঝতে পারছি বোন। কিন্তু এছাড়া আর অন্য কোন রাস্তা নেই। নাহলে তুমি নিজেকে আর বাঁচাতে পারবে না ওই শয়তানটার হাত থেকে। আমিও জানি না, আমার ভাগ্যে কি আছে, যদি তোমাকে বাঁচাতে না পারি!
সাগর কি করবে, কি বলবে বুঝে উঠতে না পেরে তাকিয়ে থাকে পদ্মর দিকে। পদ্মর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। ধরা গলায় বলে,— একটা মেয়ে, শাঁখা সিঁদুর পরে নতুন বৌ হয়ে অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন নিয়ে স্বামীর ঘর করতে আসে। কিন্তু সে যখন দেখে তার স্বামী —
পদ্ম একটু চুপ করে গিয়ে বলে,— যাক্‌গে ওসব কথা।
ভয়ে সাগরের গলা শুকিয়ে যায়। পদ্মকে জিজ্ঞাসা করে,— কিন্তু দিদি যাব কোথায়?
পদ্ম মাথা নাড়িয়ে বলে,— এর উত্তর আমার জানা নেই বোন।, শুধু জানি যেতে তোমাদের হবেই। আমি একটা মেয়ে হয়ে তোমার অসহায়তাটা বুঝতে পারছি, কিন্তু এছাড়া যে উপায় নেই। সতীত্ব যে আরোও বড়ো, তাছাড়া প্রাণেও বাঁচবে কি না সন্দেহ! শয়তানটার চর গুলোও বোধ হয় আসে পাশেই ঘুরছে। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব, কোন দিক দিয়ে যেতে হবে বলে দেব। সামনের দরজা বন্ধ করে পিছনের দরজা দিয়ে বেরোবে, আমি দাওয়ায় সারারাত এই কাস্তে হাতে বসে থাকব।

সাগর পদ্মর দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে মধুসূদনকে স্মরণ করে।

— যাই, আমি একবার বাইরেটা দেখে আসি, তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও। — কথাটা বলে পদ্ম তাড়াতাড়ি বাইরে চলে যায়। সাগর ভয়ে ভয়ে ডাকে,— দিদি — পদ্ম বাইরে থেকে উত্তর দেয়,— ভয় নেই, আমি কাছেই আছি, এক্ষুনি আসব।
সাগর তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ধীর পায়ে খাটে এসে বসে পড়ে। দুহাতে কপালটা ধরে, কনুই দুটো পায়ের ওপর রেখে, চোখ বুজে মনে মনে বলে,— 'হে মধুসূদন, তুমি রক্ষা কোর।'

চারিদিকে ঝিঁঝির ডাক, আর নিশ্চিদ্র অন্ধকার কথাটাকে বিড়ম্বনায় ফেলা জোনাকিদের আলোর মধ্যে দিয়ে একহাতে কাস্তে নিয়ে এগিয়ে চলেছে পদ্ম। সাগর বাবাকে জড়িয়ে ধরে পদ্মর পিছনে পিছনে হেঁটে চলেছে। শুকনো পাতার ওপর খস্ খস্ আওয়াজ কালো রাত্রির নিস্তব্ধতা ও নির্জনতাকে বিব্রত করতে করতে এগিয়ে চলেছে ওদের সাথে।

বেশ কিছু দূরে এগিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ পায়ের চাপে মাটিতে কোন কিছু 'মট' করে ভাঙার আওয়াজে, শরীর মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায়, পদ্ম কাস্তেটা তুলে ধরে দাঁড়িয়ে গিয়ে নিজের শ্রবণেন্দ্রিয় শক্তিটাকে প্রখর করার চেষ্টা করে। সাগর বাবাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, পদ্মর দেওয়া কোমরে গোঁজা কাস্তেটা মুহূর্তের মধ্যে বার করে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে উঁচিয়ে ধরে ডানদিকে তাকিয়ে দেখে, একটু দূরে একটা কালো মতো কিছু দাঁড়িয়ে আছে। কাস্তেটাকে শক্ত করে ধরে, নিজের হৃদস্পন্দন অনুভব করে সাগরের মনে হয়, হৃৎপিণ্ডের আওয়াজটা বোধহয় সামনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা বস্তুটার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

পদ্ম সাগরের গায়ে হাত দিলে, চম্‌কে উঠে সাগর কাস্তে ধরা হাতে পদ্মর হাতটা চেপে ধরে ভয়ে ঘামতে থাকে। চোয়াল শক্ত করে মনে মনে ঠিক করে, সামনের বস্তুটা কাছে এলেই কাস্তে চালাবে।

হঠাৎ সবাইকে আশ্বস্ত করে কালো বস্তুটার কাছ থেকে চাপা গলায় একটা ডাক ভেসে আসে,-- পদ্মদি —।
পদ্ম কাস্তেটা নামিয়ে ডাকে,— এদিকে আয়।
সাগর কাস্তেটা কোমরে গুঁজে রাখতে রাখতে লক্ষ করে, কালো বস্তুটা আস্তে আস্তে খস্ খস্ আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে।

লাঠি হাতে দুটো লোক এসে দাঁড়ায় ওদের সামনে। পদ্ম সামনের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে,— শুধু একটা লাঠি নিয়ে চলে এলি?
অন্ধকারের মধ্যে লোকটা লাঠিটা তুলে ধরে বলে,— লাঠি কোথায়, এটা বর্শা, কোমরেও আর একটা জিনিস আছে।
— আবুল, তুই ওদের তোর বাড়ি নিয়ে যা, সুজান মিঞাকে বলা আছে ঘাটে অপেক্ষা করতে। তুই ওদের ভোর রাতে নদীর ঘাটে পৌঁছে দিবি, তার আগে নয়। — চাপা গলায় পদ্ম কথা গুলো বলে।
— আচ্ছা দিদি। — বাধ্য ছেলের মতো উত্তর দেয় আবুল।
পদ্ম কঠিন গলায় দ্বিতীয় জনকে বলে,— শোন জাহির, কাল সকালে আমি যেন কোন খারাপ খবর না পাই, তাহলে কিন্তু —
একটু চুপ করে গিয়ে আবার বলে,— দরকার হলে সবকটাকে শেষ করে দিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিবি। বাকীটা আমি সামলাব।
জাহির পদ্মকে আশ্বস্ত করে বলে,— তুমি অত ভাবছ কেন গো? আমাদের শরীরে জান থাকতে কোন বেটার হিম্মত আছে এনাদের ছোঁয়ার? আমরা এক একজন দশজনের মহড়া নেওয়ার ক্ষেমতা রাখি।

— আমি জানি, তাই তোদেরকেই ডেকেছি। — নীচু গলায় বলে পদ্ম।

পদ্ম আঁচল খুলে কতগুলো টাকা বার করে সাগরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে,— এটা রাখো বোন, রাস্তায় দরকার পড়বে।
সাগর টাকা নিতে অস্বীকার করে বলে,— না না, এর দরকার নেই দিদি।
— পদ্ম সাগরের হাত চেপে ধরে বলে,— যা বলছি শোন। হাতে সময় কম।
সাগর টাকাটা মুঠো করে ধরে, নীচু হয়ে পদ্মকে প্রণাম করতে গেলে পদ্ম বাধা দিয়ে সাগরের হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়। দুহাতে সাগরের মুখটা ধরে বলে,— আর হয়তো কোন দিন দেখা হবে না বোন, ভগবানের কাছে এই কামনাই করি, যে, তুমি যেন স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে ঘর করতে পারো।
কথাটা বলতে বলতে পদ্ম কেঁদে ফেলে। সাগরেরও চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। পদ্মকে জড়িয়ে ধরে বলে,— দিদি, তোমার কথা আমি কোন দিন ভুলব না।
আবুল অন্ধকারের মধ্যে বলে,— পদ্মদি, এবার তুমি চলে যাও।
— হ্যাঁ, কথাটা বলে সাগরকে ছেড়ে বৃদ্ধকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে,— আমায় ক্ষমা করে দেবেন বাবা। এছাড়া আপনাদের বাঁচানোর আর কোন উপায় ছিল না।
বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি করে বলে,— থাক্ মা থাক্। তুমি সুখী হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুক।
পদ্ম সাগরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে,— ও হ্যাঁ, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি।
সাগর তাকিয়ে থাকে পদ্মর দিকে। পদ্ম তাড়াতাড়ি করে ব্লাউজের ভিতর থেকে একটা কাগজ বের করে সাগরের হাতে দিয়ে বলে,— নদীর ওপারে কয়েকটা গ্রামের পর পদ্মদিঘী বলে একটা গ্রাম আছে। ওখানকার ইস্কুলের হেড মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি গিয়ে এই চিঠিটা দেবে। খুব দয়ালু মানুষ, সাক্ষাত ভগবান। ওনার বৌও খুব ভালো মানুষ। বিয়ের অনেকদিন আগে ওই গ্রামে কয়েক বছব ছিলাম আমি। মাস্টার মশাই কখনো সখনো এখানকার ইস্কুলে এলে দেখা করে যেত আমার সাথে। আমার শ্বশুর মশাইয়ের সাথেও আলাপ ছিল। প্রায় বছর খানেক হলো দেখা হয় না। ঠাকুর করুক, যদি বেঁচে থাকেন মাস্টার মশাই, তাহলে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়তো হয়ে যাবে।
সাগর চিঠিটা আর টাকা গুলো তাড়াতাড়ি করে আঁচলে বেঁধে রাখে।

জাহির পদ্মকে বলে,— দিদি, দেরী হয়ে যাচ্ছে।
পদ্ম তাড়াতাড়ি করে বৃদ্ধর উদ্দেশ্যে বলে,— আমি যাই বাবা।
সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— যাই বোন, শয়তানটা আবার এসে পড়বে। আমি দাওয়ায় গিয়ে বসি। শয়তানটা এসে ভাববে তোমরা ভিতরে আছো, আমি পাহারা দিচ্ছি।
সাগর পদ্মর হাত দুটো ধরে উদ্বিগ্ন মুখে বলে,— কিন্তু দিদি, তোমার যদি কিছু হয়!
— আমি এখনো কি বেঁচে আছি ভাই? আর যতক্ষণে ওরা জানতে পারবে তার মধ্যে তোমরা নদীর ওপারে পৌছে গেছ। নাও আর দেরী কোর না। — দুঃখের হাসি হেসে কথা গুলো বলে পদ্ম।
আবুল এগিয়ে যায়। তার পিছনে সাগর আর জাহির বৃদ্ধকে ধরে হাঁটতে হাঁটতে দূরে অন্ধকারে মিশে যায়।

ঠাকুর, তুমি ওদের রক্ষা কোরো। --- পদ্ম দুহাত কপালে ঠেকিয়ে নীচু গলায় কথাটা বলে কিছুক্ষণ

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ফেরার রাস্তা ধরে।

(৮৪)

বলা থামিয়ে সাগর আকাশকে বলে,— অনেকক্ষণ হাঁটছ, এবার বসবে চলো।
— চলো। — মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে বলে আকাশ।
সাগর আকাশকে ধরে ধরে সিঁড়িতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশ সাগরকে জিজ্ঞাসা করে,— তুমি বসবে না?
— একটু পরে বসছি। — চাঁদের দিকে তাকিয়েই উত্তর দেয় সাগর।
আকাশ জিজ্ঞাসা করে,— তারপর?
সাগর একই ভাবে ওপরের দিকে তাকিয়ে বলে,— তারপর আর কি, আবার পাড়ি দিলাম অজানার উদ্দেশ্যে। আমার মধুসূদনের ইচ্ছাটা কি বুঝতে পারছিলাম না। মনে মনে সংশয় হচ্ছিল, তবে কি আমার এতদিনের বিশ্বাস, পূজো সব মিথ্যে?
সবাই মিলে আবুলের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। গিয়ে জানতে পারলাম, আবুল আর জাহির দুইভাই। এতরাতে ওদের অসুবিধার কথা ভেবে বলেছিলাম খাবো না। তাছাড়া তখন মনে হচ্ছিল, কতক্ষণে নদীর ওপারে পৌঁছব। সত্যি কথা বলতে কি, বাবার জন্যই ভয় হচ্ছিল বেশী। নিজের জন্য চিন্তা করিনি। কারণ কাস্তেটা কাছেই ছিল। সেরকম বুঝলে নিজেকেই শেষ করে দিতাম। যাইহোক্, অবুল আর জাহিরের বৌ ফতেমা আর সুরমা আমাদের কোন কথাই শুনল না। বলল, আগে থেকে খাবারের ব্যবস্থা করা আছে। বাইরে কোন রকম আওয়াজ হলেই বার বার চম্‌কে উঠছিলাম আমি। জাহির আর আবুল বাড়ির বাইরে পাহারা দেওযার মধ্যেই আমরা ভিতরে বাপ মেয়েতে রাতের খাওয়া সারলাম। ফতেমা আর সুরমা আমাদের সাথে না খেয়ে আমাদের সামনে বসে রইল। খাবে না কেন জিজ্ঞাসা করাতে বলল, আমরা ওদের অতিথি। অতিথিকে আগে খাইয়ে তবেই ওরা খাবে, নাহলে ধর্মের তোহীন্ করা হবে। আবুল, জাহির আর ওদের বৌদের যত্ন আর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে মনে মনে মধুসূদনকে বললাম, মধুসূদন, এই গরীব মানুষ গুলোর মঙ্গল কোরো তুমি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ভোর হওয়ার আগে আবার বেরিয়ে পড়লাম আবুলদের বাড়ি থেকে নদীঘাটের উদ্দেশ্যে। আবুল সামনে, পিছনে বাবাকে জড়িয়ে ধরে আমি, আর আমাদের পিছনে জাহির। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম আমরা। আমি হাঁটতে হাঁটতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম, কোন শব্দ হলেই চম্‌কে উঠছিলাম বার বার। প্রতিবারই দুই ভাই আমাকে সাহস যুগিয়ে বলছিল,— 'আমরা যতক্ষণ আছি তোমাদের কোন ভয় নেই দিদিমণি, বাঘেও ছুঁতে পারবে না।'
অনেকটা রাস্তা হেঁটে অনেকক্ষণ পর আমরা নদীঘাটে পৌঁছলাম। দূর থেকে নদীটা দেখা যাচ্ছে। আরোও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, বেশ কয়েকটা নৌকা বাঁধা রয়েছে ঘাটে। ঘাটের কাছাকাছি গিয়ে দেখতে পেলাম, দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে একটা নৌকার কাছে। আমি আর জাহির বাবাকে ধরে কাদার ওপর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে গেলাম নৌকার কাছে। আবুল নৌকার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একজনের উদ্দেশ্যে বলল, সুজান, বাবুকে ভালো করে ধরে নৌকায় তোল। সবাই মিলে বাবাকে ধরে নৌকায় তুলে দিল। আমি নৌকায় ওঠার আগে পদ্মর দেওয়া টাকা গুলো আবুল আর জাহিরকে দিতে গেলাম, কিন্তু ওরা নিল না। বলল,— 'আজ যদি ওরা টাকা নেয়, তাহলে আল্লাহ্ ওদের কোনদিন মাফ করবে না।'

ওদের সামনেই কেঁদে ফেললাম আমি। কাঁদতে কাঁদতে আমি বললাম,— আর হয়তো কোনদিনই তোমাদের সাথে দেখা হবে না, কিন্তু আজ থেকে আমি জানব আমার দুটো ভাই আছে, আবুল আর জাহির। তোমাদের আমি সারা জীবন মনে রাখব। আর পদ্মদিকেও বোল ও আমার দিদি হয়েই থাকবে। আমার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তোমাদের আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারব না। আমার মুখে ভাই ডাক শুনে জাহির আর আবুলের চোখেও জল এসে গিয়েছিল, বলল, ওদের কোন দিদি বা বোন নেই। আমিও ওদের কাছে সারা জীবন দিদি হয়েই থাকব। ওদের দুজনকে ধরে আমি নৌকায় উঠে গিয়ে ওদেরকে বললাম তাড়াতাড়ি করে পদ্মদির কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য। নৌকায় উঠে লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম ছাউনির ভিতরে বাবার পাশে আর একজন চশমা পড়া বয়স্ক লোক বসে আছেন। মাথার সমস্ত চুল সাদা বলে মনে হল। জাহির আর আবুল নৌকা ঠেলতে শুরু করল। নৌকা একটু এগোতেই সুজানরা দাঁড় বাইতে শুরু করে দিল। শুরু হল নৌকা চলা। জাহির পাড় থেকে সুজানকে চেঁচিয়ে বলল,— 'সুজান, সাবধানে নিয়ে যাবি।'

সুজান নৌকা থেকে জবাব দিল,— 'কোন চিন্তা কোর না জাহির ভাই।'

একটু একটু করে অন্ধকার কাটতে শুরু করেছে। যতক্ষণ ওদের দেখা গেল, দেখলাম, ওরা পাড়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এক সময় দূরত্ব আর আবছা আলো ওদের অদৃশ্য করে দিল। একটু একটু করে আলো ফুটতে শুরু করেছে। ভরা নদীর দাঁড়ের ঢেউ তোলা টল্‌মলে জলের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলাম,— 'এখনি একবার ঝাঁপ দিতে পারলেই আমি মুক্তি পেয়ে যাবো, কিন্তু বাবার কি হবে?'

হঠাৎ পদ্মদির কথা মনে পড়তে খুব ভয় হতে লাগল ওর জন্য। যদি কিছু হয়ে যায় ওর? নদীর জলের দিকে তাকিয়ে পদ্মদির কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

(৮৫)

নৌকা মাঝনদী দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

ছাউনির সামনে বসে সাগর দুপাড়ের দিকেই তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করে। আবছা আলোয় যতদূর দেখা যায়, শুধুই জল আর দূরে দুপাড়েই সারিবদ্ধ কালো হয়ে থাকা সবুজ বনবিথী।

সুজানদের দাঁড় বওয়ার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে শুনতে দাঁড়ের দিকে তাকিয়ে সাগর মনে মনে ভাবে,— 'পদ্মদি না থাকলে এর পরিণাম কি হতো শেষ পর্যন্ত।'

পদ্মর মুখটা ভেসে ওঠে সাগরের চোখের সামনে। পদ্ম নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেও যেভাবে সাগর আর বৃদ্ধ বাবাকে বাঁচিয়েছে সে কথা মনে করে সাগরের খুব খারাপ লাগে এভাবে পদ্মকে একলা বিপদের মাঝে ফেলে রেখে চলে আসাটা। সাগরের নিজেকে খুব ছোট মনে হয়, নিজেকে কেমন যেন একটা অপরাধী বলে মনে হয়। মনে মনে পদ্মর কাছে ক্ষমা চায় সাগর। বলে,— 'আমি একা হলে কখনোই তোমাকে এভাবে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে আসতাম না। আমার নিজের জন্য আমি ভাবিনা কারণ, আমার শেষ রাস্তা জানা আছে। কিন্তু আমার কিছু হয়ে গেলে এই অন্ধ মানুষটাকে দেখার আর যে কেউ নেই। আমায় তুমি ক্ষমা কোর পদ্মদি।' সাগর মনে মনে মধুসূদনের উদ্দেশ্যে বলে,— 'হে মধুসূদন আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আমায় ক্ষমা কোর তুমি।'

নদীর জলে ছোট ছোট ঢেউ গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সাগরের চোখের সামনে হঠাৎ একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে।

ঘরের দাওয়ায় পদ্মদির নিস্প্রাণ দেহটা পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাওয়া জায়গাটায় রক্ত মাখা কাস্তে হাতে মুকুন্দ পদ্মদির মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিহিংসা পরায়ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

চমকে ওঠে সাগর। পরক্ষণেই আড় চোখে একবার ছাউনির ভিতর বসে থাকা বয়স্ক লোকের দিকে দেখে নিয়ে মনে মনে মধুসূদনকে বলে,— 'পদ্মদিকে তুমি রক্ষা কোর।'

সাগরের বাবার পাশে বসা বয়স্ক ভদ্রলোক সাগরকে একদৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করতে লক্ষ করছিল। সাগরের চোখে মুখে যে একটা গভীর সমস্যার ছাপ ফুটে উঠেছে, সেটা ভদ্রলোকের নজর এড়াতে পারেনি। সাগরকে চমকে উঠতে দেখে ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে। তারপর ছৌয়ের ভিতর থেকে বাইরে এসে সাগরের পাশে বসে। সাগর ওনার উপস্থিতি খেয়াল না করে একই ভাবে তাকিয়ে থাকে জলের দিকে।

বয়স্ক ভদ্রলোক সাগরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করে,— আপনারা কোথায় যাবেন?

চিন্তা মগ্ন সাগর কথাটা শুনতে না পেয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে মাথা নীচু করে। ভদ্রলোক সাগরের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে বুঝতে পারে, সাগর কথাটা শুনতে পায়নি। আবার বলে,— আপনাকে বলছি মা।

সাগর এবার চমকে উঠে কিছু বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে ভদ্রলোকের দিকে। ছৌয়ের ভিতর থেকে সাগরের বাবা বলে ওঠে,— জানি না, ঈশ্বর যেখানে নিয়ে যাবেন।

সাগরের সম্বিত ফিরে আসে। একটু অপ্রস্তুত হয়ে তাকিয়ে থাকে পাশে বাসা বয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোক একবার সাগরের বাবাকে দেখে নিয়ে সাগরকে আবার জিজ্ঞাসা করে,— বাড়ি কোথায় মা?

সাগর কিছু বলার অগেই সাগরের বাবা আবার বিরক্তি মেশানো গলায় উত্তর দেয়,— নেই। আমরা নিরাশ্রয়। এখানে এসেছিলাম আশ্রয়ের খোঁজে।

ভদ্রলোক সাগরের বাবার উত্তর দেওয়ার ধরণ দেখে একটু অবাক হয়ে মনে মনে বলে,— 'সমস্যাটা গুরুতর বলে মনে হচ্ছে।'

সাগর মুখটা কাছে এনে খুব নীচু গলায় বলে,— আপনি কিছু মনে করবেন না। এই মুহূর্তে ওনার মনের অবস্থাটা ভালো না।

— আপনার বাবা?

— না, আমার শ্বশুর মশাই। — কথাটা বলে সাগর চুপ করে যায়।

সাগরের বাবা একটু আগে বলা 'নিরাশ্রয়' কথাটা ভদ্রলোকের মাথায় ঘুরতে থাকে। সাগরকে জিজ্ঞাসা করে,— আপনার স্বামী?

— বিদেশে চাকরী করেন। — অন্যদিকে তাকিয়ে সাগর উত্তর দেয়।

চুপ করে যায় ভদ্রলোক। মনে মনে ভাবে,— 'একজন অপরিচিত হয়ে এর বেশী প্রশ্ন করাটা ঠিক নয়। তাছাড়া দেখে মনে হচ্ছে কোন একটা গভীর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যদি নিরাশ্রয় হয়েই থাকে, তাহলে মেয়েটা বৃদ্ধ শ্বশুরকে নিয়ে যাচ্ছেই বা কোথায়!'

ওদের কে দেখে ভদ্রলোকের কেমন যেন মায়া হয়। অন্যদিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

গোলাপী হতে থাকা পূব আকাশের নীচে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে দিয়ে নদীর জলে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ছোট ছোট ঢেউ তুলে এগিয়ে চলে নৌকাটা।

(৮৬)

কিছুদূরে পাড় দেখতে পেয়ে সাগর তাকিয়ে থেকে মনে মনে ভাবে,— 'এপারে তো পৌঁছলাম, কিন্তু এরপর কি হবে? আবার নতুন কি বিপদ ওত পেতে রয়েছে কে জানে। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা পরিবেশে কোথায় এতটুকু আশ্রয় পাবে? তার ওপর আবার পেটের চিন্তা।'
আর ভাবতে পারেনা। মনে মনে মধুসূদনকে বলে,— 'এত কষ্ট আমায় কেন দিচ্ছ ঠাকুর?'

নৌকা পাড়ে এসে ঠেকলে, সুজান আর তার সঙ্গী দাঁড় রেখে তাড়াতাড়ি করে নৌকা থেকে নেমে এসে সাগরের বাবাকে ধরে ধরে নামিয়ে দেয়।

সাগর সুজান মিঞাকে ধরে মাটিতে নেমে এসে, আঁচল থেকে টাকা বার করে দিতে যায়। সুজান হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে বলে,— আজ আমি টাকা নিতে পারব না দিদি। আমি সব শুনেছি পদ্মাদির কাছে। আজ আমি আপনাদের নদী পার করিনি, আমি আপনাদের বিপদ পার করেছি। আজ যদি আমি পার করার টাকা নিই, তাহলে আমার জীবনের শেষ সময়ে, আল্লাহ্ আমায় পার করবে না।

নৌকা থেকে মাটিতে নামতে নামতে বয়স্ক ভদ্রলোক সুজানের কথা গুলো শুনে সাগরের দিকে তাকাতে, সাগর একটু অপ্রস্তুত হয়ে আঁচলে গিঁট দিতে দিতে ভদ্রলোককে একবার দেখে নিয়ে বাবাকে বলে,— চলো বাবা।
বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে,— হ্যাঁ মা, চলো।
সাগর বাবাকে ধরে ধরে কর্দমক্ত ঢালু জায়গা দিয়ে উঠতে থাকে। বয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গিয়ে, সাগরদের দেখিয়ে সুজানকে জিজ্ঞাসা করে,— কি হয়েছে রে সুজান?

(৮৭)

সাগর ওপরের জমিতে উঠে একটা বড়ো অশ্বত্থ গাছের কাছে এসে বাবাকে বলে,— এখানে একটু বসো বাবা।
— হ্যাঁ মা, শরীর আর দিচ্ছে না। বয়েস হয়েছে তো, একটু বসে যাই চলো। — ক্লান্ত স্বরে বৃদ্ধ বলে।
সাগর বাবাকে গাছতলায় বসিয়ে দিয়ে, নিজে পাশে বসে। কিছুক্ষণ চারিদিকে দেখে নিয়ে, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব কষ্ট হয়। বলে,— আমার কোলে মাথা রেখে একটু শোবে বাবা?
— না মা, আমি ঠিক আছি। একটু বসে নিলেই হবে। — বৃদ্ধ সাগরকে আশ্বাস দিয়ে বলে।
সাগর তবু বলে,— শোওনা বাবা। একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও। আবার তো পথ চলতে হবে। কিন্তু কোথায় যাব বাবা?
বৃদ্ধ বলে,— চলো মা, ঠাকুরকে স্মরণ করে, একবার ওই মাস্টার মশাইয়ের কাছে গিয়ে দেখি।
সাগরের এতক্ষণ মনেই ছিল মাস্টার মশাইয়ের কথা। তাড়াতাড়ি করে আঁচল খুলে চিঠিটা বার করে।

বয়স্ক ভদ্রলোক ততক্ষণে উঠে এসেছে সাগরদের কাছে। বৃদ্ধর বলা কথা গুলো কানে গেছে। সাগর সামনে এসে বলে,— বৃদ্ধ মানুষটাকে নিয়ে এখানে এভাবে বসে থাকাটা ঠিক নয় মা।
সাগর মুখ তুলে ভদ্রলোককে দেখতে পেয়ে বলে,— কোথায়ই বা যাব? আমাদের এই মুহূর্তে যাওয়ার কোন জায়গা নেই।
ভদ্রলোক পিতৃসুলভ গলায় বলে,— তাই বলে এখানে বসে থাকলে সমস্যার সমাধান হবে মা? তাছাড়া আমি আসতে আসতে শুনলাম, কোন এক মাস্টার মশাইয়ের কাছে যাওয়ার কথা বলেছিলেন আপনার শ্বশুরমশাই!
সাগর বলে,— এখানে পদ্মদিঘী গ্রামের স্কুলের হেড মাস্টার মশাইয়ের কাছে একবার যাব আমরা।
ভদ্রলোক সাগরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলে,— পদ্মদিঘীর হেড মাস্টার মশাই! আপনারা চেনেন ওনাকে?
— নাহ্, একবার দেখা করতাম। — মাথা নাড়িয়ে বলে সাগর।
সাগরকে অবাক করে ভদ্রলোক বলে,— তোমাকে তুমিই করে বলছি। আমিই সেই হেড মাস্টার মশাই। তোমরা পদ্মর কাছ থেকে আসছ তো?
সাগর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,— আপনি জানলেন কি করে?
বৃদ্ধ কথার আওয়াজ অনুভব করে মাস্টার মশাইয়ের দিকে মুখ ফেরায়। মাস্টার মশাই হেসে উত্তর দেয়,— সুজান, মানে যে তোমাদের নিয়ে এসেছে নৌকায় করে, আমি সব শুনেছি ওর কাছ থেকে। আমি নৌকায় বসে তোমাকে সারাক্ষণ লক্ষ করছিলাম। আমার মন বলছিল, তোমাদের খুব বিপদ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না। একবার তুমি চমকে উঠলে, তাও আমি লক্ষ করেছি। বোধ হয় গতকালের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল।
— না, পদ্মদির জন্য খুব ভয় হচ্ছিল। — মাথা নীচু করে উত্তর দেয় সাগর।
মাস্টার মশাই বলে,— আমি গতকাল পাশের গ্রামের স্কুলে গিয়েছিলাম। একটা বিশেষ কাজে। আজ আমাদের স্কুলের পরীক্ষা শুরু, তাই তাড়াতাড়ি করে ফিরছি। তোমরা না এলে, এত তাড়াতাড়ি নৌকা ছাড়তো না। সুজানকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি।
বৃদ্ধ চুপ করে ওদের কথা শোনে।
— পদ্মদি আপনাকে একটা চিঠি দিতে বলেছে। — কথাটা বলে সাগর চিঠিটা এগিয়ে দেয় মাস্টার মশাইকে।
মাস্টার মশাই চিঠিটা নিয়ে খুলে পড়ে। তারপর ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বলে,— চিঠিটা তুমি পড়েছ?
সাগর মাথা নাড়িয়ে বলে,— না।
মাস্টার মশাই আবার চিঠিটা পকেট থেকে বের করে সাগরের হাতে দিয়ে বলে,— তুমি নিজেই পড়ে দেখো।
সাগর চিঠিটা নিয়ে খুলে নিজেই মনে মনে পড়তে থাকে।

শ্রীচরণেষু মাস্টার মশাই,

আমি কোনদিন কিছু চাইনি আপনার কাছে। আজ একটা ভিক্ষা চাইছি। আমার বোন আর তার বৃদ্ধ শ্বশুর এই মুহূর্তে খুবই অসহায় এবং নিরাশ্রয়। আপনি যেভাবেই হোক, ওদের একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনাকে জানি এবং বিশ্বাস করি বলেই, অনেক আশা

নিয়ে আপনার কাছে ওদের পাঠালাম। সময় কম এবং চারিদিকে বিপদ, তাই আর বেশী কিছু লিখলাম না। বাকী কথা ওদের থেকে শুনে নেবেন। আমি জানি, এই চিঠি পড়ার পর আপনি কিছু না কিছু ব্যবস্থা ওদের জন্য করে দেবেনই। আপনি আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি

আপনার পদ্ম

চিঠিটা পড়ে সাগরের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। সাগরের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে মাস্টার মশাই বলে,— ছিঃ মা, কাঁদতে নেই। আমার সাথেতো তোমার দেখা হয়েই গেছে। এখন আর ভয় কিসের? আমার বাড়ি চলো, কোন অসুবিধা হবে না। আমার গিন্নি খুব ভালো মানুষ। তোমাদের কাছ থেকে সব শুনে, তারপর যাহোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

সাগর মাস্টার মশাইয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। মাস্টার মশাই তাড়াতাড়ি করে বলে,— ওরকম করতে নেই মা, চলো, ওঠো দেখি, অনেকটা পথ যেতে হবে।

সাগর বাবাকে ধরে ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়।

মাস্টার মশাই বৃদ্ধর হাত ধরে বলে,— আসুন। তিনজনে মিলে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায়। পূব আকাশের নতুন সূর্য্য তার হাসি ছড়াতে শুরু করেছে সবে।

(৮৮)

সাগর কথা বলতে বলতে, আবার সিঁড়িতে আকাশের পাশে এসে বসে, আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— জানোতো ঠাকুর, সেদিন বুঝেছিলাম, আমার গোপাল আমায় দূরে সরিয়ে দেয়নি, সে আমার সাথে সাথেই আছে। নাহলে, সেদিন খেয়াঘাটে, চারিদিকে অন্ধকার আর চরম অনিশ্চয়তার মাঝে, অসহায় আমাদের বাপ মেয়ের সামনে, মাস্টার মশাইয়ের মধ্যে দিয়ে আমার মধুসূদন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত না। আমরা সাধারণ মানুষ, তাই বুঝিনা। ভগবান তারই সৃষ্টি কোন জীবের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে। আর তার জন্য চাই শুধু অন্তরের ভালোবাসা আর বিশ্বাস। সেদিন নৌকায় মাস্টার মশাইয়ের সাথে কথা বলতে বলতে, আমি কেমন যেন সাহস পাচ্ছিলাম। মন বলছিল, যতটা ভয় পাচ্ছি, ততটা ভয়ের বোধহয় কিছু নেই। ভালো একটা কিছু হবেই।

আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,— তারপর?

সাগর বাইরের গাছপালার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে,— মাস্টার মশাইয়ের সাথে ওনার বাড়ি গেলাম। আলাপ হল ওনার স্ত্রীর সাথে। এত দয়ালু, এত ভালো মহিলা, না দেখলে বলে বোঝানো যাবে না। সেদিন আর আমাদের ব্যাপার কোন কথা হল না। মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী নিশ্চই পদ্মদির বাড়ির ঘটনা এবং আমরা যে নিরাশ্রয়, সেটা শুনেছিলেন স্বামীর কাছ থেকে। তাই হয়তো আমাদের মানসিক অবস্থা আন্দাজ করে, ওনারা নতুন করে বিব্রত করতে চাননি। এর পর আরোও দুটো দিন কেটে গেল। একটা অদ্ভুত নিশ্চয়তা, শান্তি-খুঁজে পেলাম প্রথম দিন থেকেই। কেবলই মনে হতো, আমার মা-ই বুঝি অন্যরূপে ফিরে এসেছে আমার কাছে। আমাকে কোন কাজ করতে দিতেন না উনি। আমি জোর করে ওনার হাত থেকে কাজ গুলো নিয়ে করতাম। আমি বুঝতে পারতাম, যে, একটা অদ্ভুত মাতৃসুলভ দৃষ্টি নিয়ে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকতেন আমার দিকে। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর অনেক্ষণ গল্প করতে করতে

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজে বেড়াতেন। নিজে থেকে চিরুনী নিয়ে এসে আমার চুল আঁচড়ে, বেঁধে দিতেন। একদিন দুপুর বেলা, আমি বিছানায় শুয়ে নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করছিলাম। আমার অজান্তেই চোখ থেকে জল বেরিয়ে গিয়েছিল। মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী কখন পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিলেন, জানতেও পারিনি। খেয়াল হল, যখন উনি আমার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। চোখের জল আর বাঁধ মানলো না। ওনার কোলে মুখ গুঁজে আঝোরে কাঁদতে লাগলাম আমি। আমার কান্নার আওয়াজে মাস্টার মশাই পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি করে এঘরে এলেন। মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী আমাকে মায়ের মতো তুই বলে সম্বোধন করে, ধমক্ দিয়ে বললেন,— বল্ কি হয়েছে?
তবুও আমি বলতে পারছিলাম না। কিন্তু উনি যখন আমায় বললেন,— আমায় বলবি না মা? আমার তমালী যদি আজ বেঁচে থাকতো, তাহলে তোর বয়সীই হতো, তোরই মতো গায়ের রঙ, মুখের গড়ন ছিল ওর। ও কিন্তু আমাকে তোর মতো করে এভাবে 'না' বলতো না।
কথা গুলো বলার সময়, শেষের দিকে ওনার গলা ধরে এসেছিল। হঠাৎ আমার মনে হল, আমার মা যেন এভাবে কথা গুলো বলছে আমায়। ধরে রাখতে পারলাম না আর নিজেকে। এতদিনের জমে থাকা সমস্ত ব্যথা, যন্ত্রণা চোখের জল মিশিয়ে বাঁধ ভাঙা সীমাহীন উচ্ছ্বাসের আবেগে ভাসিয়ে দিলাম মাসীমার কোলে।

(৮৯)

কোলে মাথা রেখে সাগরকে কাঁদতে দেখে চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রীর। সাগরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে,— কাঁদ হতভাগী কাঁদ। মনকে হালকা কর। আর শোন, দুফোঁটা চোখের জল, তোর ওই পাষাণ মধুসূদনের পায়ে দিয়ে দিস। এই চোখের জলের ছোঁয়ায় যদি ওর হৃদয় গলে।

মাস্টার মশাই এগিয়ে এসে সাগরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে,— চুপ করো মা। শান্ত হও। যে ত্যাগ স্বীকার তুমি করেছ, যে ধৈর্য্যের পরিচয় তুমি দিয়েছ, জীবনের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি প্রাপ্ত একজন সন্ন্যাসীও বোধহয় তোমাকে দেখে ঈর্ষা করত। তুমি যদি আমার বয়েসে বড়ো হতে, তাহলে এই বুড়ো হেড মাস্টারটা তোমাকে আজ —
কথা শেষ না করে চুপ করে যায় মাস্টার মশাই। চোখ থেকে চশমার তলা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।
একটু থেকে আবার বলে,— কোন ভয় নেই তোমার। আমরা তো আছি। আমাদেরও একটা মাত্র মেয়ে ছিল। আজ বেঁচে থাকলে তোমার বয়সীই হতো। মুখের প্রতিচ্ছবিটা অনেকটা ঠিক তোমারই মতো ছিল। মাত্র দশ বছর বয়েসে আমাদের ছেড়ে চলে গেল।
কথাটা বলে মাস্টার মশাই চশমা খুলে ধুতির খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলে,— চিন্তা কোর না মা, ভগবানের দয়ায় কিছু একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।
সাগর উঠে বসে মুখে হাত চাপা দিয়ে ফোঁপাতে থাকে। মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সাগরের হাত দুটো মুখের সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজের আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয়। সাগর জলভরা চোখে তাকিয়ে বুকে মাথা রেখে বলে ওঠে,— মা।
মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী ধরা গলায় বলে,— আজ থেকে এই গ্রামেই থাকবি তোর বাবাকে নিয়ে। সব ব্যবস্থা করে দেব আমি। কোথাও যেতে হবে না তোদের বাপ বেটিকে, কারুর কাছে হাত

পাততে হবে না তোকে, এমনকি আমাদের কাছেও না।
একটু থেমে আবার বলে,— একটা জিনিসই চাইব শুধু তোর কাছে। আমায় আজ থেকে মা বলে ডাকবি।

(৯০)

সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— এই হল আমার অতীত জীবনের গল্প।

পূর্ণ শশীর আলোর বন্যায় স্বপ্ন জাগানো জোৎস্না রাতের মাধুরী ছড়ানো পরিবেশে, বকুল ফুলের গন্ধকে ম্লান করে, গন্ধরাজ আর হাসনুহানার গন্ধ যেন আরোও বেশী করে অনুভূত হয় আকাশের। মনে হয়,— 'ঝিঁঝি পোকার ডাক গুলো কেমন যেন থম্‌কে গেছে। চারিদিকে স্নিগ্ধ আলোয় মোড়া অদ্ভুত এক কোমল নিস্তব্ধতা। একটা সাধারণ মেয়েব অসাধারণ জীবন কাহিনী, অবিশ্বাস্য লড়াইয়ের কথা শুনে চারপাশের সবকিছু কেমন যেন চুপ করে তাকিয়ে রয়েছে সাগরের দিকে।'
সাগরকে দেখে আকাশের মনে হয়, যে সাগরকে ও চেনে, এ-সে নয়, যেন কোন এক মমতাময়ী, স্নেহময়ী দেবী সিঁদুরের টিপ আর লালপাড় হলুদ শাড়ী পরে আকাশের দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলে আকাশ। একটা অদ্ভুত ভালো লাগা বোধ আকাশের মনের মধ্যে ঝড় তোলে। রক্তিমের মুখটা একবার উঁকি দিয়ে যায় মনের জানালা দিয়ে।

আকাশকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে সাগর জিজ্ঞাসা করে,— অমন করে আমার দিকে কি দেখছ ঠাকুর?
— তোমাকেই দেখছি। আমার সেই বন্ধুটা, যার লেখা কবিতা তোমাকে শুনিয়েছি, আমাকে প্রায়ই বলতো, এমন একটা মেয়ে ওর চোখে পড়ছে না, যাকে দেখে একটা গল্প লেখা যায়। রক্তিম চেয়েছিল, একটা সাধারণ মেয়ের অসাধারণ গল্প লিখতে। একটা অসম্ভব কাল্পনিক চরিত্র কে ওর কলম দিয়ে সম্ভাব্য বাস্তবে ফুটিয়ে তুলতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রক্তিম যদি তোমায় দেখতো বা তোমার কথা জানতে পারতো তাহলে, ও এক্ষুণি শুরু করে দিত ওর লেখা। ওকে আর কষ্ট করে একটা সাধারণ মেয়ের অসম্ভব কাল্পনিক চরিত্রকে অসাধারণ করে সম্ভাব্য বাস্তবে ফুটিয়ে তুলতে হতো না। এখানেই পেয়ে যেত ওর লেখার রসদ, একটা দুর্দান্ত হৃদয় স্পর্শী জীবন্ত কাহিনী। — সাগরের চোখে চোখ রেখে কথা গুলো বলে আকাশ।
সাগর আকাশকে বলে,— ঠাকুর, তোমার বন্ধুর সাথে যদি কোন দিন দেখা হয়. তবে তাকে আমার কথা বলে বোল, সে যেন এই নগন্য মেয়েটাকে নিয়ে একটা গল্প লেখে। আমি একদিন চলে যাব পৃথিবী থেকে, কিন্তু সাগর বেঁচে থাকবে এই গল্পের মধ্যে দিয়ে তোমাদের সবার মধ্যে। তুমি আজ বাদে কাল চলে যাবে, তোমার সাথে আর হয়তো দেখা হবে না কোন দিন। যদি তোমার সাথে সেই বন্ধুর দেখা না হয়, তাহলে তুমি যদি পারো, তবে তুমি লিখো। আমি আমার ঠাকুরের লেখার মধ্যে দিয়ে নতুন করে আবার বেঁচে উঠবো।
চলে যওয়ার কথাটা মনে পড়তেই মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে যায় আকাশের। সাগরের সাথে আর কোন দিন দেখা হবে না, কথাটা ভাবতেই বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে ওঠে। আকাশ তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে।

— কিছু বলছ না যে? আমায় নিয়ে গল্প লেখা যায় না? — আকাশের দিকে তাকিয়ে কথা গুলো বলে সাগর।

আকাশ হেসে বলে,— না না, তা নয়। আমি অন্য কথা ভাবছি।

একটু থেমে অন্য দিকে তাকিয়ে আবার বলে,— রক্তিম একটা কবিতা লিখে আমায় শুনিয়ে বলেছিল,— 'যদি কোন দিন সত্যিই এরকম কোন চরিত্র খুঁজে পাই, তবে আজকের এই কবিতাটা তার জন্য এবং সেই উপন্যাসের জন্য তোলা রইল।'

এবার সাগরের দিকে তাকিয়ে আবার বলে,— অথচ কি অদ্ভুত দেখ, সেদিনের সেই কবিতাটা, আজকের এই পরিবেশের সাথে কি অদ্ভুত ভাবে মিলে যাচ্ছে।

আকাশ কয়েক মুহূর্ত সাগরের চোখে চোখ রেখে বলে,— তুমি শুনবে সেই কবিতা?

সাগর মাথা নাড়িয়ে বলে,— নিশ্চই শুনব।

আকাশ কয়েক মুহূর্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলতে শুরু করে কবিতাটা,—

তোমার আমার প্রথম দেখা, বকুল ঝরা সেই রাতে,
হাসনুহানার নেশায় পাগল, সেই সুরেরই ছন্দতে।
রাতের তারা মিটি মিটি চায়, সাক্ষী থাকে ওই আকাশ,
গন্ধরাজের গন্ধে মাতাল, নেচে বেড়ায় ওই বাতাস।
লজ্জা রাঙা গোলাপ কলি, জোৎস্না রাতে মাধুরী ছড়ায়,
সন্ধ্যামালতী দুলে ওঠে ওই, রাতের আঁধার আবেশ জড়ায়।
রক্তিম প্রেমে দিশেহারা চাঁদ মেঘের কোলে মুখ লুকায়,
সিঁদুরের টিপ হলুদ শাড়ী, দোলালে আমায় কোন দোলায়।

কবিতা বলা শেষ করে, সাগরকে চোখ বুজে চুপ করে থাকতে দেখে, আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,— কেমন লাগল বললে নাতো?

— ভীষণ ভালো, অসাধারণ। — চোখ বুজে বলে সাগর।

আকাশ বলে,— রক্তিমের মনটা কিন্তু আরো একটু অসাধারণ ছিল। আজ এই মুহূর্তে ওকে ভীষণ ভাবে মনে পড়ছে আমার।

সাগর অন্যদিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করে,— আচ্ছা ঠাকুর, ভগবান এদের এতো কষ্ট দেয় কেন বলতে পারো?

আকাশ হেসে উত্তর দেয়,— কারণ তোমাদের ভগবান নেই তাই।

সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে হেসে চুপ করে যায়। আকাশ চাঁদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে সাগরের কথা চিন্তা করে। সাগর আকাশকে বলে,— আমার কথাতো শুনলে ঠাকুর, তোমার কথা আমায় বলবে না?

কয়েক মুহূর্ত চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকে আকাশ বলে,— আমার কথা খুব সামান্য। মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান। বাবা মায়ের খুব আশা ছিল, ছেলে বিলেত ফেরত ডাক্তার হবে। কলকাতায় ডাক্তারী পড়তে এসে আলাপ হলো ধনীর ঘরের উচ্চাকাঙ্খী মেয়ে সুলেখার সাথে। আগে পরে চিন্তা না করে মন দিয়ে বসলাম। মানসিকতার মিল হতো না, তবুও মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতাম। কোথায় ধনীর রাজপ্রাসাদ, আর কোথায় গরীবের খড়ের চালের মাটির ঘর। নিজের ওজন না বুঝেই এগিয়ে গিয়েছিলাম। ফল যা হওয়ার তাই হল। বিদেশ যাওয়ার আগের দিন দেশ থেকে হোস্টেলে ফিরে সুলেখার চিঠি পেলাম। ওরই মতো এক ধনীর ছেলে অঞ্জনের

সাথে ওর বিয়ে। পরদিন বিদেশ চলে গেলাম। একদিন মার চিঠি পেলাম বিদেশে বসে। বাবা আর নেই। সেদিনের কষ্টটা তোমায় আমি বোঝাতে পারব না। বুকের ভিতরটা কেমন যেন খালি হয়ে গিয়েছিল। বিলেতে ডাক্তারী পাশ করে অনেক আশা নিয়ে গ্রামে ফিরলাম এই ভেবে, যে, মাকে বলব, মা, তোমার আর বাবার আশা স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। তোমাদের ছেলে আরো বড়ো ডাক্তার হয়েছে। কিন্তু এসে শুনলাম দুদিন আগে মাও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। শুনেছিলাম, আমার বিদেশে ডাক্তারী খরচ মেটাতে গিয়ে সবকিছু বিক্রী হয়ে গেছে। থাকার মধ্যে ছিল বসত বাড়িটুকু। ওষুধের পয়সাও জোটেনি মায়ের ভাগ্যে। বাবা মায়ের স্মৃতিটুকু বয়ে বেড়াচ্ছি শুধু। মা চাঁপা ফুলের গন্ধ আর আমার বাঁশীর সুর খুব ভালোবাসতো। আজও যখন গ্রামের বাড়িতে যাই, সন্ধ্যেবেলা আমাদের উঠোনে চাঁপাগাছের সামনে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজিয়ে মাকে খুঁজি। মা বলেছিল, খোকা, আমি যখন থাকবো না, তুই যখন এখানে আসবি, সন্ধ্যেবেলা এই চাঁপাগাছের কাছে এসে আমায় বাঁশী বাজিয়ে শোনাবি। আমি চাঁপা ফুলের গন্ধে তোর বাঁশীর সুর শুনবো।

কথা শেষ করে আকাশ চুপ করে থাকে। সাগরও চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আকাশ পূর্ণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে,— আজ বোধহয় পূর্ণিমা।

— হ্যাঁ। — ছোট্ট করে জবাব দেয় সাগর।

আকাশ বলে,— কি সুন্দর লাগছে তাই না?

সাগর একই ভাবে তাকিয়ে থেকে দুঃখের হাসি হেসে বলে,— একে ধার করা, তাও আবার কলঙ্কের।

আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে,— ওতো ঈর্ষাকাতর নিন্দুকের বলে, না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে।

সাগর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— জানো ঠাকুর, তোমায় যখন প্রথম দেখলাম, আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল, তুমি আমার কতদিনের চেনা, কত আপনার।

আকাশ হেসে বলে,— মন ভোলাচ্ছ? আমি কিন্তু শরীরের ডাক্তার, শরীর তত্ত্ব বুঝি, মনস্তত্ত্ব বুঝি না।

— আমিও রাজনীতি করিনা, কিছু চাহিদাও নেই আমার, তাই রাজনীতি করা কিছু মানুষের মতো মন ভোলানোর উপায়ও জানা নেই আমার। আমি শুধু আমার মনের কথাটুকু বললাম। কথা গুলো বলে সাগর একটু চুপ করে যায়, তারপর আবার বলে,— জানো ঠাকুর, যখন খুব কষ্ট হয় মনে, তখন কতদিন ভেবেছি, বৌঠাকুরাণীর ঝিলে গিয়ে ডুবে মরি। কিন্তু পারিনি শুধু বাবার কথা ভেবে। আমি চলে গেলে বৃদ্ধ, অন্ধ মানুষটার কি হবে? আমি ছাড়া আর তো কেউ নেই বাবার।

— এর পরে কি করবে? — আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

সাগর প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলে,— চলো ঠাকুর, অনেক রাত হলো। তোমাকে চুন হলুদ লাগিয়ে দেব?

আকাশ তাড়াতাড়ি করে বলে,— না না আজ থাক। রাত হয়ে গেছে, তাছাড়া আমি ভাবছিলাম

আকাশ কথা শেষ করার আগেই সাগর ধমক্ দেওয়ার সুরে বলে,— বলেছিনা, আমার কথার ওপর কথা বলবে না।

— জীবের সেবা? — আকাশ হেসে জিজ্ঞাসা করে।

সাগর হেসে বলে,— না মনের। নাও এবার ওঠো দেখি।
— কিন্তু আমিতো ভাবছি একবার নদীর ধারে যাব।
— এই সময় নদীর ধারে যাবে! তার ওপর পায়ের এই অবস্থা, ভালো করে হাঁটতে পারছ না। তোমার কি মাথা খারাপ হলো নাকি? — অবাক হয়ে বলে সাগর।
— পূর্ণিমার রাতে নদীর ধারে বসে থাকতে দারুন লাগে। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।
— তোমার মতো পাগলেরই ভালো লাগে।
— কোন কিছু হৃদয়ে গাঁথতে গেলে, তার জন্য যে পাগল হতেই হয়! তুমি যাবে আমার সাথে, দেখবে তুমিও পাগল হয়ে গেছ।
— না বাবা না, আমাকে তো আর ভূতে ধরেনি! আমি তো যাবই না, তুমিও কি করে যাও দেখি!

জানো তো, চাঁদনী রাতে তাজমহল দেখার অভিজ্ঞতার মতোই, নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার গলি দিয়ে, রূপোলী জড়ির ওড়না গায়ে জড়িয়ে, দুধারে ধূসর প্রান্তরের ছায়া ঘোমটার আড়ালে অস্পষ্ট প্রকৃতির ফিস্‌ফিসানি উপেক্ষা করে, সারাদিনের হিসেব নিকেশ করতে করতে দূরের হাতছানির উদ্দেশ্যে, নিঃশব্দে বয়ে চলা বহু ঘটনার সাক্ষী, ইতিহাস প্রাচীন প্রাণবন্ত নদীর বুকে তোলা ছোট ছোট ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে, তার সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে, ইচ্ছা মতো আকাশ কুসুম কল্পনার ডানা মেলে হারিয়ে যাওয়াটাও কিন্তু একটা দুর্লভ অভিজ্ঞতা। দুর্লভ বলছি এই কারণেই, যে, এই উপলব্ধি করার ক্ষমতা বা বোধ, সবার থাকে না। পূর্ণিমার রাতে, চাঁদের আলোয় তাজমহলতো অনেকেই দেখে। শিল্পের নির্দশন তাজমহলের শিল্পের তারিফও করে অনেকে, মনে মনে বাহবাও দেয়। কিন্তু এর আসল সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারে কজন? কজন পারে, তাজমহলকে তাদের অন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে? কজন পারে, তাজমহলকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে? প্রেমের প্রতীক, প্রেমের সমাধি তাজমহলকে কজন তাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারে বলতে পারো? ইতিহাসের পাদ প্রদীপের আলোয় আসতে না পারা, অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাওয়া, নাম না জানা কত শিল্পীর কত দিনের রক্ত, ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের বিনিময়ে সৃষ্টি এই তাজমহল। কজন তার হিসাব জানার চেষ্টা করে? সেইসব অনামি শ্রমিক শিল্পীর দুঃখের ইতিহাস, তাদের রোজকার জীবন সংগ্রামের কথা কজন ভাবার চেষ্টা করে? তাদেরও জীবনে প্রেম ছিল, তারাও হয়তো মন প্রাণ উজার করে কাউকে ভালো বাসতো, সেই তাদের ব্যর্থ প্রেমের করুন কাহিনী কজন মনে করার বা বোঝার চেষ্টা করে? তাজমহলের সৌন্দর্য্যের কদর তো বিশ্বব্যাপী। কিন্তু এই অসাধারণ, অসামান্য, আশ্চর্য্য সৃষ্টির গুণী শিল্পী স্রষ্টাদের নাম কজন জানার চেষ্টা করে? সবকিছু পুরোপুরি না জানতে পারলে, না বুঝতে পারলে তাকে কি উপলব্ধি করা যায়, নাকি মনের মধ্যে গাঁথতে পারা যায়? শুধু দেখাটাই সার হয়। তাজমহল দেখতে দেখতে কজন ভাবতে পারে কল্পনায়, পূর্ণিমার রাতে রুপোলী জড়ির কাজ করা হাল্কা আসমান্ নীল রেশমী কাপড়ের বেশ পরিহিতা, ঢেউ খেলানো কালো চুলের বন্যায় বালিশ ঢেকে, চুম্‌কি বসানো স্পন্দিত স্বচ্ছ ওড়না অলস ভাবে, অসমান বুকের ওপর রেখে, নিদ্রারতা অপরূপ সুন্দরী সম্রাজ্ঞী মমতাজকে? দুধারে সরানো রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় দুলতে থাকা বড় পর্দা লাগানো জানালা দিয়ে আসা মুগ্ধ চাঁদের আলোর বন্যায় ভেসে যাওয়া পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে, গোলাপের সুবাস ছড়ানো আতর গায়ে মেখে, ঝিক্ মিক্ করতে থাকা শুভ্র বেশ ধারী সম্রাট শাহ্‌জাহান তার মনের আয়নায় দেখা সুন্দরী শ্রেষ্ঠা প্রিয়তমা মমতাজের স্নিগ্ধতায়, কোমলতায়,

কমনীয়তায় ভরা গোলাপী আভা ছড়ানো অবয়বে চোখের বড় বড় কালো নিথর পাতা ও মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠা রক্তিম ওষ্ঠের দিকে তাকিয়ে বলছে,— তুমি অপরূপা, তুমি সৃষ্টি কর্তার একমাত্র অপূর্ব ও আশ্চর্য্য সৃষ্টি এবং সেটা শুধুমাত্র আমারই জন্য। তোমাকে দেখে সুন্দরী চাঁদও লজ্জায় মুখ ঢাকে। তুমি আমার জন্যই সৃষ্টি হয়েছ, শুধু মাত্র আমার হবে বলেই পৃথিবীতে এসেছ। আমি মন প্রাণ দিয়ে শুধু তোমাকেই পেতে চেয়েছি, আমি শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি। তোমার জন্যই তোমাকে ভালোবেসেছি। তুমি ছাড়া সম্রাট শাহ্জাহানের কোন অস্তিত্বই নেই।'

সাগর তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। আকাশ আপন মনে বলে যায়,— এমনও তো হতে পারে, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন শাহ্জাহান প্রিয়া মমতাজের সমাধির পাশে মাটিতে বসা সম্রাট সমাধির ওপর গোলাপ ফুল রাখতে রাখতে বলছে,— 'তোমার আমার প্রেমের প্রতীক এই তাজমহলের পাথরে তোমারই রূপ ফুটিয়ে তুলেছি আমি। তোমার গোলাপ ফুলের লাল পাপড়ির মতো ঠোঁটের কারুকার্য করা হাসি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছি তাজমহলের প্রাণ, তোমার কাজল কালো সুগভীর টানা চোখের তীর্যক দৃষ্টি দিয়ে খোদাই করেছি এর শিল্প, তোমার শরীরের রঙে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে তাজমহলের শরীর, তোমার মনের থেকে রঙ নিয়ে রাঙিয়ে তুলেছি প্রতিটা মহল, তবেই না এত সুন্দর হয়েছে এই তাজমহল। এই তাজমহল আসলে তোমারই প্রতীক। তোমরা জন্যই এত সুন্দর, তোমরা জন্যই প্রাণ ফিরে পেয়েছে এই তাজমহল।'
কথা গুলো বলতে বলতে সম্রাটের চোখের জল গড়িয়ে পড়ে সমাধির বুকে, ভিজে যায় সমাধির মাটি। কিম্বা সম্রাটের প্রতি মন প্রাণ উজার করে দেওয়া ভালোবাসায় নিজেকে নিঃশেষিত করে, প্রিয়তমকে নিজের করে কাছে পাওয়ার আশায় শরীর, মনের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েও সারাটা জীবন অবহেলিত, বঞ্চিত, বুকের ভিতর জমে থাকা অসহ্য বেদনা নিয়ে নীরবে চোখের জল ফেলা প্রেমের মূর্ত প্রতীক মমতাজ বেগমের প্রতি অবিচারের, অবহেলার, অবমাননার, অসহনীয় নিষ্ঠুর আচরণের অপরাধ বোধ সম্রাট শাহ্জাহানকে আজ ঘিরে ধরেছে। আজ মমতাজ আর নেই। তাই আজ চঁদনী রাতেও একাকিত্বের, নিঃসঙ্গতার, কালো অন্ধকারের মাঝে সম্রাট শাহ্জাহান যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে কিরণ স্নাত তাজমহলের দিকে তাকিয়ে নিজেকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়াব ব্যর্থ প্রয়াসে মমতাজের উদ্দেশ্যে বলছে,— 'তুমি কোনদিনই আমায় বোঝনি। তুমিই আমার প্রেম, তুমিই আমার ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যা, সবকিছু। সারাবিশ্বেব কাছে তোমাকে অমর করে রাখার জন্য, তোমার আমার প্রেম কাহিনী চিবস্মবণীয় কবে বাখাব জন্যই তো সৃষ্টি এই তাজমহল। তুমি বিশ্বাস করো, প্রতিটা মুহূর্তে আমি শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি, আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে শুধু তুমিই আছো। তুমিই আমার অহংকার, আর এই তাজমহল তারই প্রতীক। শান্ত রাত্রির নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ন করে দূর থেকে ভেসে আসা. অশ্বক্ষুরের আওয়াজে সম্বিত ফেরে না সম্রাটের। প্রিয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা শাহ্জাহানের মানসপটে ভেসে ওঠে মমতাজের মুখ। বলে,— আমিতো তোমায় কোন দোষ দিইনি সম্রাট। তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগই নেই। আমি আজও তোমায় সেই আগের মতো করেই ভালোবাসি।
মিলিয়ে যায় মমতাজের মুখ। সম্রাটের ভিতর থেকে কে যেন বলে ওঠে,-- শাহ্জাহান, তুমি কোনদিনই ভালোবাসোনি মমতাজকে, শুধু অবহেলাই করে গেছ তাকে সারাটা জীবন ধরে। আজ তাই নিজের ভুল বুঝতে পেরে তোমার পাপ বোধে প্রলেপ লাগানোর জন্য সমগ্র বিশ্ববাসীকে তোমার অপরাধ ঢেকে ভুল বোঝানোর জন্য তৈরী করেছ এই শিল্প সৃদ্ধ তাজমহল।

এই তাজমহল শুধুমাত্র তোমার অভূতপূর্ব শিল্প সৃষ্টির অহঙ্কারেরই প্রতীক, তোমার অপারধ বোধেরই প্রতীক। ঝাপসা হয়ে যায় দৃষ্টি। আবছা, অস্পষ্ট হয়ে যায় দূরের তাজমহল। জলের ধারা নামে সম্রাটের চোখ থেকে। মনে মনে প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে বলে,— আমায় ক্ষমা কোরো তুমি।

অশ্বক্ষুরের আওয়াজ থেমে যায়, একটু দূরে। হ্রেষা ধ্বনীর মধ্যে দিয়ে সম্রাটের কাছে এগিয়ে আসে সেনাপতি, কুর্নিশ করে বলে,— জাঁহাপনা, অনেক রাত হলো যে। বিশ্রাম করবেন চলুন। কথার উত্তর না দিয়ে দূরে তাজমহলের দিকে তাকিয়ে শাহ্‌জাহান মনে মনে বলে,— 'এইতো সবে রাত জাগা শুরু।'

সাগর আকাশের মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। মনে হয়, আকাশ যেন কোন অন্য মানুষ।

পিয়ালগাছের মাথায় দূর নিলীমায় ওঠা চাঁদের দিকে তাকিয়ে আকাশ বলে,— আসলে বোঝার মতো, উপলব্ধি করার মতো, অনুভব করার মতো মন চাই, অনুভূতি চাই। এটা সবার থাকে না। একটু থেমে আকাশ আবার বলতে শুরু করে,— একটা ইতিহাসের পিছনে আর একটা ইতিহাস লুকিয়ে থাকে। যেটা সবসময় জানা যায় না। তাকে বুঝতে গেলে, অনুভব করতে গেলে, উপলব্ধি করতে গেলে, ভাবতে গেলে কল্পনার ডানা প্রসারিত করে শূন্যে ওড়ার জন্য তোমার গভীর লুকিয়ে থাকা দার্শনিক মনকে স্বাধীনতা দিতে হবে। ঠিক এইভাবেই চাঁদনী রাতের আলো গায় মেখে, খুশী মনে, উচ্ছল প্রাণে বয়ে চলা চিক্‌চিকে নদীর জলে রূপসী প্রিয়া যখন নিজের মুখ দেখে আরো সুন্দর করে সেজে নিজেকে আরো সুন্দরী করে তোলে, যখন তার রূপের ছটা লুটোপুটি খায় প্রকৃতির বুকে, নাচতে থাকে যৌবনচ্ছল নদীর ঢেউয়ের তালে তালে, তখন তার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করার, তাকে বোঝার, তাকে অনুভব করার, এক মনে ভাবার যে অনুভূতি, সেটাও কিন্তু দুর্লভ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে আকাশ। তারপর আবার বলে,— কল্পনা, কল্পনা করার ক্ষমতা থাকা চাই। শুধুমাত্র কল্পনা দিয়েই সামান্য কিছুকেও অসামান্য সুন্দর করে তোলা যায়, অসাধারণ করে ফুটিয়ে তোলা যায়, আশ্চর্য্য রূপ দেওয়া যায়, মনের মধ্যে অপূর্ব ভাবে আঁকা যায়। আর তার জন্য সেই মনটা চাই। অনুভূতি প্রবন মন, আবেগ প্রবন মন, কল্পনা প্রবন মন।

মজা করে আকাশ একটু হেসে আবার বলে,— তবে সব সময়ের জন্য কিছু নয়, তাহলে বিপদ। শুধু মাত্র বিশেষ সময়ের জন্য, বিশেষ কিছুর জন্য। তোমার কথাতেই বলি, তার জন্য বুদ্ধির দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে হেসে বলে,— খুব হয়েছে, এবার ওঠো দেখি। অনেক রাত হল।

কথাটা বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বলে,— জানো ঠাকুর, এই মুহূর্তে তোমাকে আমি আর একবার নতুন করে চিনলাম।

— তাই বুঝি! কিরকম শুনি?

— তুমি ভীষণ ভালো।

— সেতো আমিও জানি। এ আর নতুন কথা কি?

— নতুনত্ব আছে বৈকি।

— যেমন —

— ভালো তো অনেকেই হয়, কিন্তু তুমি তার থেকেও আরো অনেক - অনেক - অনেক বেশী ভালো।
— বুঝতে পারলাম, কিন্তু নদীর ধারে যাবো না?
— না।
— কেন?
— আমি যখন 'না' বলেছি তখন 'না'।
— অগত্যা। — কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে আকাশ।
আকাশ সাগরকে ধরে উঠতে উঠতে বলে,— তুমি ঠিক আমার মায়ের মতো।
সাগর আকাশকে ধরে বলে,— আমি জানি।
আকাশ সাগরকে ধরে হাঁটতে হাঁটতে সাগরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,— কি করে?
সাগর হেসে বলে,— তুমিই বলেছ আমাকে গতকাল।
আকাশ হেসে ফেলে। সাগর আকাশকে ধরে ধরে নিয়ে যায় ঘরের ভিতরে।

(৯১)

বৃদ্ধ খাটে শুয়ে নিজের মনেই আস্তে আস্তে কথা বলে,— মা, তুমি এসেছ? গুরুদেবও এসেছেন। এবার আমি যাব।
একটু থেমে সাগরকে ডাকে,— সাগর।
সাগর কাঁদতে কাঁদতে বলে,— এইতো বাবা।
বৃদ্ধ সাগরকে বলে,— এবার যে আমার সময় হয়ে গেছে মা, আমায় যেতে দাও।
— আমি কি নিয়ে থাকব বাবা? আমার তো আর কেউ নেই। — সাগর বৃদ্ধর বুকে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলে।
বৃদ্ধ সাগরের মাথায় হাত রেখে বলে,— খোকা রইল, ও তোমায় দেখবে। আর কেউ না দেখুক তোমার বধুসূদন সবসময় তোমার পাশে আছে।
একটু থেমে ছেলেকে ডাকে,— খোকা!
খাটের কাছে স্টেথো হাতে দাঁড়িয়ে থাকা আকাশ খাটে বসতে বসতে বলে,— এইতো আমি।
— সাগরকে দেখো। ওর যেন কোন কষ্ট না হয়।
— আচ্ছা বাবা।
বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ক্ষীণ গলায় বলে,— এবার আমি যাব। গুরুদেব, এবার আমায় নিয়ে চলুন। আমায় একটু ধরো না মা।
সাগর তাড়াতাড়ি করে বলে,— এইতো বাবা আমি তোমাকে ধরেই আছি।
আমি আমার মায়ের সাথে কথা বলছি মা, তুমি খাট থেকে নেমে যাও। — বৃদ্ধ কেমন যেন নিস্তেজ ভাবে কথা গুলো বলে চুপ করে গিয়ে পা দুটো ভাঁজ করে।
বৃদ্ধকে চুপ করে থাকতে দেখে সাগব খাট থেকে নেমে গিয়ে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধের দিকে।

বৃদ্ধের হাতটা বিছানায় পড়ে যায়। পা দুটো সোজা হয়ে গিয়ে মাথাটা ডানদিকে হেলে পড়ে।
সাগর বৃদ্ধের মুখটা ধরে ডাকে,— বাবা, — বাবা,— বাবা।
কোন সাড়া পাওয়া যায় না। আকাশ তাড়াতাড়ি করে ঝুঁকে পড়ে পালস্ দেখে বৃদ্ধর। হাতটা

ছেড়ে দিয়ে স্টেথোটা কানে দিয়ে বুক পরীক্ষা করতে থাকে। সাগর তাকিয়ে থাকে আকাশের মুখের দিকে।

বৃদ্ধ যে আর বেঁচে নেই বুঝতে পেরে আকাশ সোজা হয়ে বসে. কান থেকে স্টেথোটা খুলে ফেলে সাগরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়িয়ে ইঙ্গিতে 'না' জানায়।
সাগর চীৎকার করে ডাকে,— বাবা —
বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলে,— আমায় একা রেখে চলে গেলে বাবা, আমার যে আর কেউ রইল না।
কান্নায় ভেঙে পড়ে সাগর। আকাশ সাগরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মাথায় হাত রাখতে গিয়েও হাতটা সরিয়ে আনে। তারপর আবার সাগরের মাথায় হাত রাখে। সাগর মাথায় আকাশের হাতের স্পর্শ পেয়ে বৃদ্ধর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে থাকে,— তুমি তো ডাক্তার, আমার বাবাকে তুমি ফিরিয়ে দাও।
আকাশ সাগরকে ধরে তোলার চেষ্টা করলে সাগর বলে,— না, বাবাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আমার বাবাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না।
আকাশ সাগরকে ছেড়ে দিয়ে সাগরের মাথায় হাত বোলাতে থাকে। সাগরের বাঁধ না মানা কান্নার আওয়াজে ভারী হয়ে ওঠে ভোরের বাতাস।

(৯২)

সাগরকে মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে দেখে মধ্যাহ্নের সূর্য্যও বোধহয় সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে না পেয়ে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। কুসুম হাতে ফুল নিয়ে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে। মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী সাগরের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে,— আমরা তো আছি মা, বাবা মা কি কারোর চিরকাল থাকে? যে যতটুকু আয়ু নিয়ে আসে তার ততটুকুই থাকার অধিকার আছে, একমুহূর্তও বেশী নয়। সাগরকে কেঁদে যেতে দেখে কুসুম পাশে বসে হাতের ফুল গুলো দালানে রেখে হাত দিয়ে সাগরের চোখের জল মোছার চেষ্টা করে। সাগর কুসুমকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে আরো জোরে কাঁদতে থাকে।

আকাশ উত্তরীয় পড়ে উঠোনে ঢুকে ওদেরকে দেখে ধীর পায়ে এগিয়ে আসে। আকাশকে আসতে দেখে মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী মাথায় ঘোমটা দিয়ে বলে,— তুমি এসে গেছো বাবা, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। মাস্টার মশাই কোথায়?
আকাশ দালানের কাছে এসে বলে,— ওনাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে এসেছি।
— তুমি সাগরকে দেখো, আমি তাহলে এখন আসি। — মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী আকাশকে কথা গুলো বলে।
আকাশ মাথা নীচু করে বলে,— আচ্ছা।
মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী সাগরকে বলে,— আমি এখন আসিরে, বিকালে আবার আসব।
সাগর কুসুমকে ছেড়ে মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে বলে,— মা গো —
— ওরকম করতে নেই মা। সব ঠিক হয়ে যাবে। মধুসূদনকে ডাক। — সাগরের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী বলে।
সাগর আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে

বলে,— আর কাঁদিস না মা, মানুষটা ওপর থেকে কষ্ট পাবে।
সাগর ছাড়ছে না দেখে বলেন,— এরকম করে না মা, আমাকে মা ডেকেছিস না, মায়ের কথা শুনতে হয়।
কথা গুলো বলে আকাশকে চোখ দিয়ে ইশারা করে।
আকাশ সাগরের হাত দুটো ছাড়িয়ে দিয়ে বলে,— চলুন, আমি আপনাকে পৌছে দিযে আসছি।
— না না, তোমাকে আর যেতে হবে না। আমি কুসুমকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। — আকাশকে কথা গুলো বলে উঠে পড়ে, মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী।
কুসুম আবার সাগরের চোখের জল মুছিয়ে দিতে থাকে। মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোন দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে কুসুমকে বলেন,— আয় কুসুম।
কুসুম সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর পিছন ঘুরে এগিয়ে যায়।

আকাশ সিঁড়ি দিয়ে উঠে সাগরের কাছে এসে দুহাতে ধরে তুলে দাঁড় করায়। তারপর ধরে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। কুসুমের আনা বেল ফুল গুলো দালানে পড়ে থাকে।

(৯৩)

অন্ধকার নামছে চারিদিকে। বাইরের ঘরে হ্যারিকেনের আলোটা জোর করতে করতে সাগর আকাশকে জিজ্ঞাসা করে,— কালই যাচ্ছ? উত্তরীয় পড়ে খাটে বসে বাইরে নামতে থাকা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলে,— হ্যাঁ, অনেকদিন হয়ে গেল।
কথাটা বলে আকাশ সাগরের উত্তরের অপেক্ষা করে। আকাশ মনে মনে চাইছে সাগর যেতে বারুন করুক।

গতকাল সারা রাত আকাশ দুচোখের পাতা এক করতে পারে নি। এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা মনে হলেই, বুকের ভিতরে একটা কেমন যেন অস্বস্তি হয়েছে। এই তিনটে দিন সাগরের সান্নিধ্যে থাকার পর আকাশ ভাবতেই পারছে না, এরপর সাগরকে ছাড়া কিভাবে থাকবে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে অনেক্ষণ ধরে চিন্তা করেছে,— 'রূপ তো অনেক মেয়েরই থাকে, কিন্তু এরকমন ভাবে মনকে আকর্ষন কবার ক্ষমতা কজনের আছে।'
অন্তত আজ অবধি এরকম একটা মেয়েও আকাশের চোখে পড়েনি। আকাশ নিজেকেই প্রশ্ন করেছে,— 'এত অল্প সময়ে কাউকে ভালোবাসা যায়? কাউকে না দেখতে পাওয়ার জন্য মন কাঁদে?'
সুলেখার কথা মনে করেছে আকাশ। এমন দিনও গেছে, সুলেখার সাথে অনেকদিন দেখা হয়নি। সুলেখাকে দেখতে ইচ্ছা করেছে, কাছে পাওয়ার জন্য মন ছট্‌ফট্‌ করেছে কিন্তু আজকের মতো করে নয় বোধহয়। অন্ধকারে পায়ের দিকের জানালা দিয়ে বাইরে গাছের অন্ধকারে জ্বলতে থাকা জোনাকী গুলেকে দেখতে দেখতে আকাশের চোখের ওপর বার বার ভেসে উঠেছে সাগরের মুখটা। কত নিস্পাপ, কত পবিত্র। সাগরের হাসিটাকে মনে হয়েছে উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে আছড়ে পড়া সফেন, শুভ্র ঝর্ণার উচ্ছ্বাস। বিছানা থেকে নেমে ভিতরের ঘরে হ্যারিকেনের আলোয় মেঝেতে শুয়ে থাকা নিদ্রাহীন সাগরকে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়েছে এক্ষুণি সাগরের কাছে গিয়ে মনের সব কথা বলে দিতে। বলতে ইচ্ছা করেছে সাগর, 'আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবো না, তোমাকে না দেখে আব আমি থাকতে পারবো না। এ তুমি

কি জাদু করলে আমায়। আকাশ ধীর পায়ে আবার ফিরে এসে দরজা খুলে দালানে দাঁড়িয়ে উঠোনময় চাঁদের আলোর দিকে তাকিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করেছে,— 'আচ্ছা, সাগরের কি এরকম মনে হচ্ছে? সাগরেরও কি মন খারাপ করছে, আমি চলে যাব বলে? এত সহজ সরল শিশুকে এবং তাড়াতাড়ি কাছে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা আছে মেয়েটার মধ্যে যে, মনের-তল খুঁজে পাওয়া কঠিন। শক্ত কথা গুলো বিদ্যুতের ঝিলিক্ দেওয়া দৃষ্টিতে আর দুষ্টুমি ভরা হাসি দিয়ে কত সহজ ভাবে বলে দেয়।'

মনে মনে একটু যেন আহত হয় আকাশ,— 'সাগরও তো আমাকে বারন করতে পারে, না যাওয়ার জন্য, অন্তত কিছু দিনের জন্যও।'

সাগরকে চুপ করে থাকতে দেখে আকাশ একটু পরখ করার জন্যই যেন বলে,— আমি এইসময় চলে যাচ্ছি বলে তুমি রাগ করছ?

সাগর হ্যারিকেনটা টেবিলের ওপর রেখে বলে,— তোমার ওপর কখনো রাগ করতে পারি ঠাকুর? আর তোমায় আটকাবো না। এবার তোমার ছুটি।

সাগরের উত্তর শুনে আকাশ একটু আশা হত হয়। আকাশ ভেবেছিল সাগর রাগ বা অভিমান করবে। তাহলে থেকে যাওয়ার একটা রাস্তা পাওয়া যেত।

আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে ভাবে,— 'নিজের মনের কথাটা বলবে কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, যদি সাগর খারাপ ভাবে! না না, অনেক ছোট হয়ে যাবে সাগরের চোখে।'

সাগর মনে মনে বলে,— 'তোমায় কি দিয়ে আটকাবো ঠাকুর? আমার যে কিছুই নেই, যা দিয়ে তোমায় আটকে রাখব। আমি যে গল্পের শুরুটা জানি, শেষটা তো জানা নেই।'

আকাশ যেন সাগরের মনের কথা গুলো শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে,— কিছু বললে আমায়?

সাগর মাথা নীচু করে বলে,— না।

একটু হতাশ ভাবে আকাশ বলে,— ও, আমি ভাবলাম তুমি আমায় কিছু বললে বুঝি।

সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— ফিরে গিয়ে এই মেয়েটাকে যেন ভুলে যেও না। আমাকে মাঝে মাঝে মনে কোরো।

চোখ জলে ভরে আসে সাগরের। আকাশ সাগরের দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে বলে,— 'তোমাকে ভুলে যাব? এত বড় ক্ষমতা আমার নেই। তুমি যে সত্যিই দিগন্ত বিস্তৃত, অন্তহীন সাগর।'

সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,— আমায় কিছু বললে?

— কই না তো। — মাথা নাড়িয়ে আকাশ বলে।

— ও। — কথাটা বলে সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অধৈর্য্য হয়ে নিজের মনেই আকাশ সাগরের উদ্দেশ্যে বলে,— 'একবার আমায় থেকে যেতে বলতে পারছ না?'

— সা - গ - থাকতে না পেরে আকাশ হঠাৎ সাগরকে ডাকতে গিয়েও চুপ করে যায়।

সাগর খুব উসাহী হয়ে জিজ্ঞাসা করে,— কিছু বলবে ঠাকুর?

আকাশ সাগরের চোখে চোখ রেখে কিছু বলতে গিয়েও বলে,— না।

সাগর এগিয়ে এসে খাটে বসে চুপ করে থাকে।

ঘরের পরিবেশটা হঠাৎ যেন থম্‌থমে হয়ে যায়। আকাশ জানালা দিয়ে বাইরে জোনাকীর আলো দেখতে দেখতে সাগরকে জিজ্ঞাসা করে,— তুমি তো একদম একা হয়ে গেলে, কি করবে এবার?

— এবার আমার মুক্তি হল ঠাকুর। — বিছানায় আঙুল দিয়ে আঁকচিড়ে কাটতে কাটতে বলে সাগর।
মনের কথাটা সাগরের কাছ থেকে শুনতে না পেয়ে আকাশ মনে মনে রেগে গিয়ে ভাবে,— 'আমার জন্য কি সাগরের একটুও মন খারাপ করছে না? অথচ কত কথাই বলল। আমি নাকি কতদিনের চেনা, কত আপনার। সবকটা মেয়েই একই রকম। ওপরে এক ভিতরে আর এক। সাগরের দিকে তাকিয়ে আকাশ বলে,— কিসের মুক্তি? তুমি এর আগেও কথাটা বলেছ।
— ও তুমি বুঝবে না। — একই ভাবে মাথা নীচু করে বলে সাগর।
আকাশ মনে মনে ভাবে,— 'সাগর হয়তো চাইছে কিছু বলতে, হয়তো চাইছে আমি না যাই, কিন্তু মুখে বলতে পরছে না হয়তো। কিন্তু কথা শুনে তো বোঝা যাচ্ছে না কিছু। কিন্তু কেমন যেন মনমরা লাগছে। অবশ্য বাবার জন্যও হতে পারে।'
আকাশ মনে মনে কৌতুহল জাগে,—'সাগর এই বাড়িতেই থাকবে তো? কাল যদি চলে যেতেই হয়, তাহলে অন্তত কয়েকদিনের মধ্যে সাগরকে দেখার অজুহাতেও এখানে আবার আসা যাবে। কিন্তু যদি এখানে না থাকে?'
আকাশ নিজের মনেই বলে,— 'যাবেই বা কোথায়? হয় এখানে, না হলে মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি। তখন না হয় মাস্টার মশাইয়ের সাথেই কথা বলা যাবে। কিন্তু সাগর যদি রাজী না হয়?'
মনটা খারাপ হয়ে যায় আকাশের। জিজ্ঞাসা করে সাগরকে,— তুমি এই বাড়িতেই থাকবে তো?
সাগর একটু হেঁয়ালি করে উত্তর দেয়,— আকাশের আশ্রয়েই তো সাগরের বাস।
এরকম ঘুরিয়ে উত্তর আসবে আকাশ ভাবতে পারেনি। বুঝতে না পেরে অধৈর্য্য মুখে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে।
সাগর মনে মনে আকাশকে বলে,— 'আমার তো আর কিছু পাওয়ার নেই। শুধু শুধু এই শরীরটাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি? আমার আশ্রয় ঠিক করাই আছে। কিন্তু ঠাকুর, যেদিন আমি থাকব না, সেদিন সবার ভীড়ে সাগরকে ভুলে যাবে নাতো? আমিতো তোমার কাছে আর কিছুই চাইনি, শুধু এইটুকু কথা দিও।'
— তুমি কিছু বললে? — আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করে আকাশ।
— কই! নাতো। — সাগর উত্তর দেয় আকাশকে।
আকাশ একটু হতাশ ভাবে বলে,— ও, আমি ভাবলাম —
কথা শেষ না করে চুপ করে যায় আকাশ।
খুব উৎসাহ নিয়ে সাগর আকাশকে জিজ্ঞাসা করে,— আমার কথা ভাবছ বুঝি?
আকাশ কিছু বলতে গিয়েও বলতে না পেরে মাথা নীচু করে বলে,— না।
দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

একটু পরে সাগর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— এতটা পথ যাবে, একটু ভোর ভোর বেরিয়ে যেও। রোদের তেজটা কম থাকবে।
আকাশ আর থাকতে না পেরে সাগরকে নিজের মনের আভাস দেওয়ার জন্য বলে,— আমি চলে গেলে তোমার কষ্ট হবে না?
উত্তর না দিয়ে সাগর চুপ করে হ্যারিকেনের আলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে,— 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, তুমি শরীরেরই ডাক্তার, রোগীর শরীরটাই শুধু বোঝ, মন বোঝ না। নাহলে কি আর একথা জিজ্ঞাসা করতে? আমার মনের কথাতো গতকালই তোমায় বলে দিয়েছি।

কেমন পুরুষ মানুষ তুমি? একটা মেয়ের তোমাকে ঘিরে তার মনের কথা বুঝতে পারছ না?'
সাগরের থেকে উত্তর না পেয়ে হতাশ হয়ে আকাশ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মনে মনে বলে,— 'আমার মনের কথাটা তুমি বুঝতে পারলে না?'

(১৪)

অন্ধকারের রেশ থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়ে আকাশ। পাখীদের ডাক আর ডানা ঝাপটানোয় মুখরিত পরিবেশের মধ্যে দিয়ে উত্তরীয় পরিহিত সুটকেশ হাতে আকাশের পিছনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সাগর আকাশকে বলে,— নদীর ধারে গিয়ে অন্য জামা কাপড় পড়ে নিয়ে উত্তরীযটা নদীতে দিয়ে দিও।

কথা না বলে আকাশ ধীর পায়ে এগোতে থাকে। সাগর আঁচলের গিট খুলে একটা ছোট ভাঁজ করা কাগজ বের করে আকাশের পিছনে পিছনে বেড়ার দুভার কাছে গিয়ে বলে,— ঠাকুর, এই কাগজটাও নদীতে ভাসিয়ে দিও।

আকাশ বেড়ার বাইরে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাগজটা সাগরের হাত থেকে নিয়ে তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে, মনে মনে ভাবে,— 'এখনও কি একবার বলবে না, আর দু একটা দিন থেকে যেতে?'
সাগর আকাশকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে বলে,— কিছু বলবে ঠাকুর?
আকাশ মনে মনে বলে,— 'এখনও বুঝতে পারছ না তুমি?'
আকাশ করুন মুখ করে বলে,— আমি তাহলে আসি?
— হ্যাঁ ঠাকুর, তুমি এবার এসো। — অনেক কষ্টে চোখের জল আটকে অন্যদিকে তাকিয়ে সাগর আকাশকে কথাটা বলে।
সাগর মনে মনে বলে,— 'তোমাকে আটকে রাখার চেষ্টা করলেই বা পারছি কোথায়? তোমায় থাকতে বলব কিসের জোরে?
— আমায় তুমি আসতে বলবে না আবার? — শেষ চেষ্টা করে বলে আকাশ।
সাগর মনে মনে বলে,— 'সেদিনতো আমি থাকব না ঠাকুব'
আকাশের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে,— সাগরের যে কারুর কাছে যাওয়ার ক্ষমতা নেই ঠাকুর। তাইতো সবাই সাগরকেই দেখতে আসে।
— আমায় আর কিছু বলবে না? — জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বলে আকাশ।
সাগর আকাশের চোখে চোখ রেখে বলে,— হ্যাঁ — পৃথিবীর সমস্ত সুখ যেন তোমার দরজায় ভীড় করে।
আকাশ সাগরের অন্তরের ব্যাথাটা অনুভব করতে পারে না। সাগরের দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে বলে,— 'ঠিকই বলেছ তুমি। সবাই এসে সাগরের জলে স্নান করে মনের সমস্ত গ্লানি, ক্লান্তি ধুয়ে পরিস্কার করে চলে যায়। পড়ে থাকা সেই মনের গ্লানি, ক্লান্তি সাগর বুকে করে নিয়ে বয়ে বেড়ায়। সাগরতো সবাই দেখে, সাগর জলে স্নান করে মনের আশা পূর্ণ করে, কিন্তু নিজের মতো করে নিতে কজন পারে সাগরকে?'
সাগর আকাশকে বলে,— কিছু বলবে?
আকাশ মনে মনে বলে,— 'অনেক কিছুই তো ছিল বলার, কিন্তু পারছি কোথায়? তুমিই তো বোঝার চেষ্টা করছ না।'
আকাশ মাথা নাড়িয়ে 'না' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোনোর জন্য পা বাড়ায়। সাগর পিছন থেকে

আবার ডাকে,— শুনছ! একটু দাঁড়াও না।
আকাশ দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বলে,— কিছু বলবে?
সাগর কোন কথা না বলে, গলায় আঁচলটা জড়িয়ে নিয়ে, মাটিতে হাঁটুমুড়ে বসে পড়ে। আকাশ কিছুক্ষণের জন্য অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সাগর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে আকাশকে। আকাশ তাড়াতাড়ি করে নীচু হয়ে সাগরকে তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে বলে,— একি করছ? সাগর আকাশের হাতটা ধবে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হেসে বলে,— আমার ঠাকুরকে আমার ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজিয়ে পুজো দিলাম।
সাগর যেন ভোরের এক ঝলক টাটকা ঠাণ্ডা বাতাস। যে, শরীর, মন শান্ত করে, নির্মল করে ভালো লাগা বোধ জাগায়। কিন্তু আকাশ বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে ভাবে,— 'অতীতে পুরুষদের সম্পর্কে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সাগরের হয়েছে, আমাকে তাদের চেয়ে আলাদা মনে করেই অন্য আসনে বসিয়ে এত সম্মান শ্রদ্ধা জানাচ্ছে, কিন্তু আমার মনের কথা শোনার পরে হয়তো মনে করবে আমিও তাদের মতোই একই ভাবে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছি।'
সাগর আকাশকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করে,— কি দেখছ ঠাকুর, কিছু বলবে আমায়?
আকাশ উত্তর না দিয়ে বলে,— আমি যাই এবার।
সাগর মাথা নাড়িয়ে বলে,— যাই বলতে নেই, বলো আসি।
আকাশ মনে মনে বলে,— 'আসতেই তো চাইছি। আসতে তুমি দিচ্ছ কোথায়।'
— আসি। — অনেক কষ্টে কথাটা বলে, ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যায় আকাশ।
সাগর আকাশের পিছনে হাঁটতে হাঁটতে বলে,— এসো, সাবধানে যেও, ট্রেনে উঠে খেয়ে নিও। আর চলন্ত ট্রেনে উঠো না যেন।
কয়েকপা এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরেই ডাকে,— সাগর।
সাগরকে ডেকে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ায়। সাগর তাড়াতাড়ি করে কাছে এসে মুখ তুলে, আবেগ মেশানো গলায় জিজ্ঞাসা করে,— কিছু বলবে?
আকাশ সাগরের চোখে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলে,— না।
একটু থেমে আবার বলে,— তুমি কিছু বলবে?
— নতুন করে আরতো কিছু বলার নেই আমার। আমার মনের সব কথাতো আগেই বলে দিয়েছি তোমায়। — একই ভাবে বলে সাগর।
— কি বলছে? — তাড়াতাড়ি করে খুব উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করে আকাশ।
সাগর মনে মনে আকাশকে বলে,— 'বা-রে, তোমায় সেদিন বললাম না, বাবা আমায় বলেছিল যদি কোনদিন মনের মতো কোন মানুষ পাই, তাকে আমার জীবনের সব কথা খুলে বলতে, আমার কুমারী স্ত্রী সাজার গোপন কথা জানাতে! তাই তো তোমাকেই জানিয়েছি আমি।'
সাগর হেসে বলে আকাশকে,— যা তুমি বুঝেছ এবং যা তুমি বোঝনি।
— ও। — হতাশ হয়ে আকাশ কথাটা বলে পিছনে ঘুরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়।

আকাশের মনে হয় পা দুটো যেন আর চলছে না। কেউ যেন টেনে ধরেছে পিছন থেকে। গলাটা শুকিয়ে যায় আকাশের। মনে মনে ভাবে,— 'যা হবে দেখা যাবে সাগরকে মনের সব কথা বলে দিয়ে হাল্কা হই। সাগর নিশ্চই ফিরিয়ে দেবে না, নিশ্চই বুঝতে পারবে আমার মনের

অবস্থাটা। আমার কথা নিশ্চই বিশ্বাস করবে।'
কিন্তু কিছুই বলতে না পেরে দ্বন্দে ভরা দুঃখিত মন নিয়ে এগিয়ে যায় আকাশ। কিছু দূর গিয়ে সাগর দাঁড়িয়ে যায়। তাকিয়ে থাকে আকাশের চলে যাওয়ার দিকে। সাগরের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ার সাথেই দূরত্ব বাড়তে থাকে আকাশের সাথে।
সাগর মনে মনে বলে,— 'আমি যে তোমার যোগ্য নই ঠাকুর, তাইতো তোমায় আর আটকালাম না। তুমি ভালো থেকো।'

অন্ধকার মুছে গিয়ে একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। নানা রকমের বিচিত্র ভাষায় কথা বলা পাখীরা নতুন ভোরের খবর পেয়ে আনন্দে মেতে উঠেছে। সাগর শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দূরে চলে যাওয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বলে,— হরি মধুসূদন, হরি মধুসূদন, হরি মধুসূদন।
আকাশ হাঁটতে হাঁটতে একবার পিছন ঘুরে দূর থেকে তাকিয়ে থাকা সাগরকে দেখে নিয়ে একটা বাড়ির ডান দিকে বাঁক নেয়।

(৯৫)

গলায় মালা পড়ানো রাধা মাধবের মূর্তির সামনে ধূপের গন্ধে আর প্রদীপের আলোয় চোখ বুজে ধ্যানরতা সাগরকে দেখে মনে হয় আর এক জীবন্ত প্রতিমা।

আজ কিছুতেই পূজোয় মন বসছে না সাগরের। বার বার বৃদ্ধর মুখটা ভেসে ওঠে চোখের ওপর। সাগর রাধা মাধবের মুখ মনে করার চেষ্টা করে আবার, কিন্তু মন আজ বড় চঞ্চল হয়ে রয়েছে। চোখের সামনে মায়ের মৃত্যুর দৃশ্যটা ফুটে ওঠে। মায়ের বলা কথা গুলো মনে পড়ে,— 'এখন থেকে তোকে একা লড়াই করতে হবে। মধুসূদন তোর সাথে রইল।'
চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে সাগরের। মাস্টার মশাইয়ের বলা কথা গুলো যেন ভেসে আসে,— 'যে তপস্যা তুমি করছ, একদিন না একদিন শিবের ধ্যান ভঙ্গ হবেই।'
সাগর আবার চেষ্টা করে রাধা মাধবের মুখটা মনের মধ্যে নিয়ে আসার, কিন্তু তার বদলে ভেসে ওঠে আকাশের হাসি মুখটা, কানের কাছে বেজে ওঠে বৃদ্ধর বলা কথাটা,— 'খোকা রইল, ও তোমায় দেখবে। আর কেউ না দেখুক, তোমার মধুসূদন তোমার সবসময় পাশে আছে।'
মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে সাগর চোখ খুলে তাকিয়ে থাকে রাধা মাধবের দিকে। বলে,— এবার আমায় মুক্ত করো মধুসূদন। এবার আমায় ছুটি দাও তুমি।

গলায় আঁচল জড়িয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে করতে বলে,— তোমার কাছে এবার আমায় টেনে নাও প্রভু।

সাগর মাটি থেকে মাথা তুলে হাত জোর করে সোজা হয়ে বসে রাধামাধবকে বলে,— আজ ভালো করে তোমার পূজো করতে পারলাম না, আমায় তুমি ক্ষমা কোরো।

আসন থেকে রাধামাধবকে বুকে তুলে নিয়ে হেসে বলে,— তোমায় আমি কাউকে দেব না। আমার সাথে করে নিয়ে যাব।

রাধামাধবকে বুকে চেপে ধরে সাগর উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে ভিতরের ঘরের দরজার পর্দা

সন্নিত্রে তাকিয়ে থাকে শূণ্য খাটটার দিকে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দরজাটা খোলা রেখেই ধীর পায়ে ফিরে আসে দালানের দরজার কাছে। আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকটা দেখে নিয়ে রাধামাধব হীন খালি আসনটার দিকে তাকায় সাগর। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে দালানে।

ধূপের ধোঁয়া আর চন্দনের গন্ধের মাঝে ঠাকুরের আসনে জ্বলতে থাকে প্রদীপের কাঁপা আগুনটা।

(১৬)

হাতের সুটকেশটা বিরাট ভারী একটা বোঝা মনে হয় আকাশের। আকাশ আস্তে আস্তে পিয়ালী ছড়িয়ে দুধারে ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে দূরে সবুজ সীমা রেখায় মিলিয়ে যাওয়া সাপের চলার মতো আঁকা বাঁকা রাস্তাটা দিয়ে এগিয়ে চলে। একরাশ ক্লান্তি যেন চেপে ধরেছে আকাশকে। এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিতা একটা মেয়েকে যে আকাশের এত ভালো লেগে যাবে, তা কোনদিন ভাবতে পারেনি। সাগরকে ছেড়ে চলে আসতে এত কষ্ট যে হবে, একদিন আগেও অনুভব করতে পারেনি। আকাশ নিজের চারিদিকে একটা শূণ্যতা অনুভব করে। নিজেকে কেমন যেন নিঃস্ব বলে মনে হয়।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া আকাশকে হঠাৎ মনে করিয়ে দেয় দুদিন আগে বৃদ্ধকে দেওয়া কথাটা। সেদিনের ছবিটা আকাশের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বৃদ্ধ আকাশের হাত ধরে বলছে,— 'ওকে কোনদিন অবহেলা কোরো না, ওকে যথাযথ সম্মান দিও, না হলে আমি মরেও শান্তি পাবো না। আমায় কথা দাও।'
— হ্যাঁ বাবা।
— আমায় ছুঁয়ে কথা দিলে কিন্তু।
— হ্যাঁ বাবা।

বাঁদিকের ঢালু জায়গাটা দিয়ে নামতে নামতে আকাশের চোখের মেখের ওপর আর একটা ছবি ভেসে ওঠে। বৃদ্ধ সাগরকে বলছে,— 'খোকা রইল. ও তোমায় 'দেখবে।'
বৃদ্ধ ছেলের উদ্দেশ্যে ডাকে,—'খোকা।'
— 'এই তো আমি।'
— সাগরকে দেখো, ওর যেন কোন কষ্ট না হয়। — কাঁপা গলায় বলে বৃদ্ধ।
— আচ্ছা বাবা। — বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করে, শান্ত করে আকাশ।

পায়ে চুন হলুদ লাগিয়ে দেওয়া, গরম জলের সেঁক দিয়ে দেওয়ার দৃশ্য গুলো মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে আকাশের।

সামনেই একটু দূরে নদীটা দেখা যাচ্ছে। আকাশ দাঁড়িয়ে যায়। পিছন ফিরে তাকিয়ে থাকে ফেলে আসা রাস্তার দিকে। বুকের ভিতর একটা ব্যাথা যেন দলা পাকিয়ে আটকে আছে বলে মনে হয়।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আকাশ। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে ধীরে ধীরে আবার এগিয়ে যায় নদীর দিকে।

সুটকেশটা রেখে নদীর পাড়ের ঢালু জায়গাটা দিয়ে নেমে গিয়ে জলের কাছে এসে পকেট থেকে সাগরের দেওয়া কাগজটা বের করে জলে ফেলতে গিয়েও দাঁড়িয়ে যায় আকাশ। কৌতূহল বসত কাগজের ভাঁজ খুলে দেখে।

শ্রীচরণেষু বাবা,

দূর হতে কত ডাকি তোমায়,
তবুতো আসনা ঘরে।
আধার মনে জ্বলেনি প্রদীপ,
বুক যে ব্যাথায় ভরে।
তুমি যেখানেই থাকো ভালো থেকো। আমার প্রণাম নিও।
ইতি
তোমার মেয়ে সাগর।

আরো দুবার চিঠিটা পড়ে আকাশ। তারপর আস্তে আস্তে জলে নেমে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে চিঠিটা ভাসিয়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকে। জলের ধাক্কায় একটু একটু করে এগিয়ে যায় কাগজটা। আকাশ মুখ তুলে ওপরের নীল আকাশটার দিকে তাকায়। সূর্য্য ওঠার লাল সংকেত ছড়ানো।

(৯৭)

ঘর থেকে দালানে বেরিয়ে সাগর পিছন ফিরে ঘরের ভিতরে তাকিয়ে থাকে। একহাতে রাধামাধকে বুকে চেপে ধরে আর এক হাতে শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঝাপসা হয়ে আসা চোখ দুটো মুছে নেয়। এগিয়ে এসে অলস পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে আসে হাসনুহানা ঝোপের কাছে। সাদা হয়ে থাকা গাছ গুলোকে আলতো করে একদিক থেকে আর একদিকে হাত বুলিয়ে দিয়ে মাথা নীচু করে গন্ধ অনুভব করার চেষ্টা করে। আজ যেন সাগরের কোন তাড়া নেই, হাতে অফুরন্ত সময়। ধীর পায়ে উঠোনের মাঝখানে তুলসী মঞ্চের কাছে এসে তুলসী গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর মাথা নীচু করে মঞ্চে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলে,— আজ থেকে তোমায় সন্ধ্যে দেওয়ার কেউ থাকবে না।

সাগর মুখ তুলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। লাল রঙে সজ্জিত কৃষ্ণচূড়া যেন অপর দিকে হলুদ শাড়ী পড়ে মাথা নীচু করে থাকা প্রেয়সী সোঁদালকে কিছু বলার চেষ্টা করে হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে। সাগরের মনে হয় কৃষ্ণচূড়া মাথা নাড়িয়ে 'না' বলে যেতে বারন করছে। বকুলবৌ আর গন্ধরাজকে আজ যেন কত ম্রিয়মান লাগছে। কথা বলতে না পারা গাছ গুলো সাগরকে যেতে মানা করতে না পেরে যেন নীরব দর্শক হয়ে গুমরে গুমরে কাঁদছে।

গোলাপ গাছ দুটো চোখে পড়ে সাগরের। লাজুক গোলাপ যেন বিরহের ব্যাথা আঁচ করে, দুরু দুরু বুকে, ভাষাহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে। সাগর এগিয়ে এসে গোলাপ গাছটার কাছে দাঁড়ায়। অনেকগুলো ফুল ফুটে রয়েছে। গোলাপ আর হাসনুহানা গাছ গুলো নিজে হাতে পুঁতেছিল। মুখে দুঃখের হাসি নিয়ে একটা ফুলের গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়।

আবার একবার পিছন ফিরে ঘরের খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে পিছু হেঁটে বেড়ার দরজার কাছে চলে আসে সাগর। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে পিছনে ঘুরেই কুসুমকে দেখতে পেয়ে অবাক

হয়ে ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করে,— কুসুম তুই, এতো ভোরে।
— রোজ সন্ধ্যেবেলা নদীর ধারে জঙ্গলে চাঁপা গাছের কাছে বাবাকে খুঁজতে যাই, কিন্তু একদিনও পাই না। তাই, কাল ঠিক করেছিলাম, আজ অন্ধকার থাকতে ভোরবেলা যাব। আজও দেখা পেলাম না। আসার সময় ভাবলাম ডাক্তারবাবুর জন্য ফুল নিয়ে যাই। — হাতের ফুল গুলো দেখিয়ে বলে কুসুম।
— তোর সাথে ডাক্তারবাবুর দেখা হয়নি? — সাগর একটু চিন্তিত গলায় জিজ্ঞাসা করে।
কুসুম জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে বলে,— নাতো! ডাক্তারবাবু কি নদীর ধারে গেছে?
একটু থেমে আবার বলে,— তুমি কাঁদছ কেন?
সাগর অন্যদিকে তাকিয়ে বলে,— ডাক্তারবাবু চলে গেছে।
কুসুম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,— চলে গেছে! কিন্তু আমাকে যে বলল যাবে না, তুমিওতো বললে।
সাগরের চোখ দুটো ভালো করে দেখে নিয়ে বলে,— সেইজন্য বুঝি তুমি কাঁদছ?
সাগর তাড়াতাড়ি চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে,— না, কাঁদব কেন।
কুসুমের চোখে জল এসে যায়। সাগরের হাত ধরে জিজ্ঞাসা করে,— কখন গেছে গো?
— একটু আগে। — চোখ মুছতে মুছতে সাগর উত্তর দেয়।
কুসুম জিজ্ঞাসা করে,— ইস্টিশানে না খেয়া ঘাটে? কোন দিক দিয়ে গেছে?
সাগর কুসুমের দিকে তাকিয়ে বলে,— আগে নদীর ধারে যাবে, তারপর স্টেশনে।
রেগে গিয়ে কুসুম বলে,— তোমার বরটা ভীষন মিথ্যুক।
কথাটা বলেই, কুসুম মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। সাগর কয়েক পা এগিয়ে উঠোনের বাইরে দাঁড়িয়ে কুসুমের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে,— কুসুম যাস না, শোন। কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

সাগর কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তা থেকে ভালো করে বাড়িটাকে, উঠোনটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর রাধামাধবকে দুহাতে বুকে ধরে পিছনে ঘুরে হাঁটতে শুরু করে।

(৯৮)

ভিজে ধুতিটা পরে নদীর পাড়ে বসে দূরে ভেসে যাওয়া কাগজটার দিকে তাকিয়ে থাকে আকাশ। একটা নীল রঙের মাছ রাঙা পাখী উড়ে এসে ঝুপ করে জল ছুঁয়ে আবার উড়ে যায়। ডানা নাড়িয়ে উড়ে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে আকাশ। সাগরের মুখটা ভেসে ওঠে আকাশের সামনে। বাইরের ঘরে বিছানায় বসে সাঁঝের বেলার কথা গুলো মনে পড়ে।
— 'তুমি একদম একা হয়ে গেলে, কি করবে এবার?'
— 'এবার আমার মুক্তি হলো ঠাকুর।'
— 'কিসের মুক্তি? তুমি এর অগেও কথাটা বলেছ।'
— 'ও তুমি বুঝবে না।'

উত্তরীয়টা নদীর জলে ভাসিয়ে দেওযার কথা ভুলে গিয়ে সুটকেশ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় আকাশ। পিছনে ফেলে আসা সবুজের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে থাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার চলতে শুরু করে। কিছুদূর এগিয়ে ডানদিকে পঞ্চবটি

শ্মশানটা চোখে পড়তে সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর আস্তে আস্তে অন্যমনস্ক হয়ে এগিয়ে চলে জঙ্গলের দিকে।

চাঁপা গাছটার কাছে এসে আকাশ চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। তাবপর ওপরে মুখ তুলে ফুল ফুটে থাকা গাছটার দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ মুকুন্দর মুখটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। জঙ্গলে দাঁড়িয়ে অট্টহাসি হাসছে। ঝিলের ধারের জঙ্গলে সেদিন দুপুরের দৃশ্যটা মনে পড়ে আকাশের। মুকুন্দ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সাগরকে বলছে,— এবার তোকে কে বাঁচাবে?'

চম্‌কে ওঠে আকাশ। চারিদিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখার চেষ্টা করে। কাউকে চোখে পড়ে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, নিজের মনেই মাথা নাড়িয়ে পিছনে ঘুরে হাঁটতে শুরু করে।

আকাশ এগিয়ে যেতে যেতে ভাবে,— 'একটা পুরুষের সাথে একটা মেয়ের মনের তফাৎ কোথায়? একটা মেয়ের যেমন কাউকে ভালো লাগে, একটা ছেলেরও কাউকে ভালো লাগতে পারে। একটা মেয়ের যেমন কাউকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, নিজের করে পাওয়ার ইচ্ছা জাগে, ঠিক সেরকমই একটা ছেলেরও সেই ইচ্ছা গুলো হয়। তাহলে অপরাধটা কোথায়? একটা ছেলের যদি কোন মেয়েকে ভালো লাগে, তাকে ভালোবাসতে, নিজের করে পেতে ইচ্ছা জাগে তাহলে তাকে মনের কথা চেপে রেখে নীরব দর্শক হয়ে অপেক্ষা করে থাকতে হবে, কবে সেই মেয়েটা তাকে নিজে থেকে ভালোবাসার ভিক্ষা দেবে বলে? কিন্তু মেয়েটা যদি ছেলেটার মনের কথা কোনদিনই জানতে না পারে বা ছেলেটার প্রতি ভালোবাসা না জাগে? কি করবে ছেলেটা? নীরব প্রেম বুকে নিয়ে সবার মধ্যে থেকেও অজ্ঞাত বাস, নাকি বাধ্য হয়ে ভালোবাসার প্রতিমাকে বিসর্জন দিয়ে, বুক ভরা বেদনায় অন্যএক বিজয়া সারা?'
মাথা নীচু করে হাঁটতে থাকে আকাশ।

(৯৯)

রাধামাধমকে বুকে চেপে ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে সাগর। মায়ের কথা মনে পড়ে। রাত্রে শোওয়ার আগে চুল বেঁধে দেওয়ার সময় মা প্রায়ই বলত,— 'আজ এত কষ্ট করছিস, কিন্তু দেখিস মধুসূদন তোকে একদিন খুব সুখী করবে।'
মনে মনে হাসে সাগর। মায়ের মৃত্যুর দৃশ্যটা মনে পড়ে,— 'ও সাগর, আমি যে চলে যাচ্ছি মা, আমায় ধর না, ও সাগর — সাগর।'
— 'এইতো মা, আমি তোমায় ধরেই আছি, এই দেখো।'
— 'সাগর, আমায় ধর, সাগর।'
তারপরেই মায়ের শরীরটা স্থির হয়ে যায়, মাথাটা হেলে পড়ে।

সাগর হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে বলে,— 'আমি আজ বড় একা মা, অনেকদিন তুমি আমায় আদর করোনি। আমি তোমার কাছে আসছি মা। তোমার কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমোব। আমি ভীষণ ক্লান্ত।'
চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া জলের ধারা আঁচল দিয়ে মুছে নেয় সাগর।
মনে মনে ভাবে,— 'আরোও একটু ভালো করে প্রিয়জনের ভালোবাসা, কাছে পাওয়ার সুখ

উপলব্ধি করার আগেই কেন চলে যায়।'
নিজেই মনে মনে বলে,— 'আসলে এই সুখানুভূতির কোন শেষ নেই, সর্বদাই মনে হয় আরো পেতে, চলে গেলে অতৃপ্ততা বোধ থেকেই যায়। প্রিয়জনের বিয়োগ বড় বেদনাদায়ক। তার চেয়েও বরং মানুষের মনের মধ্যে যদি দুঃখানুভূতি বোধটা না থাকতো, তাহলে এত কষ্ট পেতো না মানুষ। কিন্তু তাওতো সম্ভব নয়, তাহলে ঈশ্বরের সৃষ্টি, লয় খেলায় অপূর্ণতা থেকে যাবে। ভগবানের অস্তিত্ব থেকেও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। স্মৃতি দিয়েই অতীত, আর এই অতীত যদি যন্ত্রনাময় হয়, প্রিয়জনের স্মৃতি যখন ঘিরে ধরে ব্যথা দেয়, তার থেকে মানুষ পালাবে কি করে। এটাই মায়া। কাছের মানুষের ভালোবাসা, সেই মানুষের প্রতি নিজের মনের চাওয়া পাওয়া ভোলার, মায়া কাটানোর উপায় কি?'
হাঁটতে হাঁটতে স্বগতোক্তি করে সাগর,— পৃথিবীতে জন্ম নেওয়াটাই বোধহয় পাপ। মায়ায় আবদ্ধ হতেই হবে। একটাই রাস্তা, ঈশ্বরের কাছে মুক্তি ভিক্ষা করে নিজের মনকে সমর্পন করা। উদ্দেশ্য মোক্ষ লাভ। অর্থাৎ পরমব্রহ্মে আত্মার বিলীন হয়ে যাওয়া।

মায়ের বলা কথা গুলো মনে পড়ে সাগরের,— 'জানিস তো, বাবা মা কারো চিরকাল থাকে না, পরের জন্মে আবার নতুন বাবা মা হবে। তারপরের জন্মে আবার কেউ। কিন্তু ঈশ্বর যে রূপেই হোক, সে তোর মধুসূদনই হোক বা শিবই হোক বা কালী, দুর্গা যে কোন রূপেই হোক, সবসময় বর্তমান থাকে। সেই আসল, তাকেই অন্তরের ভক্তি, ভালোবাসা দিয়ে নিজের করে পাওয়ার চেষ্টা করতে হয়। সূর্য্যের আলো যেমন চাঁদের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়, তেমনি ঈশ্বরের আশীর্বাদও বাবা মায়ের মধ্যে দিয়ে বর্ষিত হয়।'

একে একে অতীতের ছবি গুলো মনের মধ্যে ভীড় জমায়। অনিলের মুখটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। অনিলের ছবি সরে গিয়ে সঞ্জয়ের মুখটা এগিয়ে আসে।

কিছুক্ষণ পরে সঞ্জয়ের মুখটাও মিলিয়ে যায়। সদ্য প্রয়াত বৃদ্ধর সাথে গঙ্গার পাড়ে আলাপ হওয়ার দৃশ্যটা মনে পড়ে সাগরের,— 'ছিঃ মা, জীবন অমূল্য, ঈশ্বরের দান। একে নষ্ট করার অধিকার তোমার নেই। আত্মহত্যা করা যে মহাপাপ।'
সাগর মনে মনে বৃদ্ধর উদ্দেশ্যে বলে,— 'আমায় ক্ষমা কোরো বাবা, আমি তোমার কথা রাখতে পারলাম না। আমার জীবনের আজ আর কোন মূল্য নেই। কোন কিছুরই আর আকাঙ্খা নেই আমার। তাইতো আমার মধুসূদন কাছে মুক্তি ভিক্ষা করেছি আমি। তীর বিদ্ধ বলাকা যেমন পথের পাশে অবহেলায় পড়ে থেকে কাতর নয়নে চেয়ে থাকে একটুখানি জলের আশায়, আজ আমিও আমার মধুসূদনের দিকে তাকিয়ে আছি মুক্তি ভিক্ষা পাওয়ার আশায়। শুধু একটাই দুঃখ রয়ে গেল। আমার মধুসূদন আমায় নিতে এল না, আমাকেই যেতে হচ্ছে বিনা আমন্ত্রণে।'

হঠাৎ সাগরের খেয়াল হয় জঙ্গলটা প্রায় পার হয়ে এসেছে। মুকুন্দর মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আজ কিন্তু একটুও ভয় করছে না। চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মনে মনে মধুসূদনের উদ্দেশ্যে বলে,— 'ঠাকুর তুমি মুকুন্দকে শুভ বুদ্ধি দিও।'

শাড়ীর আঁচলটা কখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই সাগরের। রাধামাধবকে বুকে চেপে ধরে অলস পায়ে জঙ্গলটা পেরিয়ে এসে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে ঝিলের দিকে এগোতে থাকে। মুদির দোকানের মালিক বাড়ীওয়ালার কথা মনে পড়ে সাগরের। সেদিন সবার সামনে বাড়ি থেকে

বার করে দেওয়ার দৃশ্যটা চোখের সামনে ছবির মতো ফুটে ওঠে।

সামনেই ঝিলটা দেখা যাচ্ছে। সাগর দাঁড়িয়ে যায়। পিছনে ঘুরে যতদূর দেখা যায় তাকিয়ে থাকে।

বুকে ধরা রাধামাধবকে আবার একবার দেখে নিয়ে তারপর পিছনে ঘুরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় ঝিলের ঘাটের দিকে। শাড়ীর আঁচলটা মাটিতে লুটিয়ে এগোতে থাকে সাগরের সাথে।

(১০০)

নদীর পাড়ে উঁচু জায়গাটা দিয়ে শূন্যে দৃষ্টি মেলে হাঁটতে থাকে আকাশ। মনে মনে চিন্তা করে সাগরের কাছে ফিরে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করবে কিনা। সাগর বড়জোর মুখের ওপর 'না' বলে দেবে। আবার না হয় ফিরে আসা যাবে। একেলার ট্রেনটা ধরা যাবে না। সে না হয় স্টেশনে বসে অপেক্ষা করা যাবে, কিন্তু মনের ভিতর এই ছট্‌ফটানিটাতো দূর হবে।
নিজের অজান্তেই ঠোটটা কামড়ে ধরে মনে মনে বলে,— 'আমি চলে আসাতে সাগরের কি একটুও কষ্ট হয়নি! সাগরও কি মনে মনে চাইছিল না আমি থেকে যাই! সাগর যে বড্ড চাপা, মনের কথা বোঝা মুশকিল। যতকষ্টই হোক নিজের চাওয়াটা কিছুতেই মুখ ফুটে বলবে না।'

কি করা উচিত আকাশ বুঝে উঠতে পারে না। সাগরকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই মন চাইছে না।

সূর্য্য ওঠার সময় হয়ে এসেছে। নদীটা দূরে যেখানে মিলিয়ে গেছে সেদিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে,— 'সাগর কি আমায় 'না' বলতে পারবে?'
একটু আগে বেরিয়ে আসার সময়, সাগরের বলা কথা গুলো মনে পড়ে আকাশের। — 'আমার মনের সব কথাতো বলেই দিয়েছি তোমায়।'
— 'কি বলেছ?'
সাগর হেসে বলে,— 'যা তুমি বুঝেছ বা বোঝনি।'
আকাশ নিজের মনেই বলে,— 'সাগর কি কিছু বলতে চেয়েছিল আমায়?'
আকাশের মনে বিদ্যুতের ঝিলিক্ খেলে যায়। সাগরের বলা একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে,— 'বাবা বলেছিলেন, বিবাহিতা স্ত্রী সাজো এখন থেকে। যতদিন না মনের মতো কোন মানুষ পাচ্ছো।'
আকাশ দাঁড়িয়ে গিয়ে অস্ফুট স্বরে স্বগতোক্তি করে,— 'তাহলে কি আমিই —'
সাথে সাথে আর একটা কথা মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায় আকাশের,— 'জানো ঠাকুর তোমায় যখন প্রথম দেখলাম, আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল, তুমি আমার কতদিনের চেনা, কত আপনার।'
আকাশের নিজের বলা কথাটা মনে পড়ে,— 'মন ভোলাচ্ছ?'
আমি কিন্তু শরীরের ডাক্তার। শরীর তত্ত্ব বুঝি, মনস্তত্ত্ব বুঝি না।'
— 'আমিও রাজনীতি করি না। কিছু চাহিদাও নেই আমার, তাই, রাজনীতি করা কিছু মানুষের মতো মন ভোলোনোর উপায়ও জানা নেই, আমি শুধু আমার মনের কথা বললাম।'
আকাশ মনে মনে অনুতপ্ত হয়, ওইভাবে সাগরকে বলার জন্য। মনে মনে নিজেকে দোষারোপ করে,— 'সাগরের কথাবার্তা, আচরণ দেখে আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। এত বোকা আমি! বুঝতে এতো সময় লাগলো আমার?'

আকাশ মাথা নাড়িয়ে আবার স্বগতোক্তি করে,— 'সাগরকে এভাবে ছেড়ে চলে আসাটা আমার উচিত হয়নি। ওকে একা ফেলে রেখে আমি এলাম কি করে?'
হঠাৎ মুকুন্দর মুখটা আর একবার ভেসে ওঠে চোখের সামনে। চাঁদের আলোয় উঠোনের বাইরে থেকে বলছে,— 'বাঁচতে তুই পারবি না, আমি আবার আসব।'
চমকে ওঠে আকাশ, মনে মনে বলে,— 'এ ভুলের কোন ক্ষমা নেই, কি মুখ নিয়ে সাগরের সামনে দাঁড়াব আমি?'

— ডা-ক্তা-র বাবু —
দূর থেকে ভেসে আসা ডাক শুনে পিছনে ঘুরে তাকায় আকাশ। দেখে, কুসুম ছুটতে ছুটতে আসছে। আকাশ তাড়াতাড়ি করে কুসুমের দিকে এগোতে থাকে। কুসুম দৌড়ে আসতে আসতে আকাশের থেকে একটু দূরে এসে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। চারিদিকে ছিট্‌কে পড়ে হাতের ফুল গুলো। কুসুম তাড়াতাড়ি করে উবু হয়ে বসে একহাতে হাঁটুতে হাত বোলাতে বোলাতে ফুল গুলো কুড়োতে থাকে। আকাশ দৌড়ে কাছে গিয়ে সুটকেশটা রেখে পাশে বসে কুসুমকে ধরে হাঁটুতে হাত বুলিয়ে দেয়।
— তুমি চলে যাচ্ছ? — আকাশের দিকে তাকিয়ে কুসুম হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করে।
আকাশ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,— না, কিন্তু তোমাকে কে বলল?
— তবে যে সাগর মাসী বলল?
কথা শেষ করার আগেই আকাশ বলে,— সাগরের সাথে তোমার দেখা হয়েছিল?
কুসুম ফুল কুড়োতে কুড়োতে বলে,— হ্যাঁ তো। তোমায় ফুল দিতে গিয়েছিলাম, দেখলাম সাগর বাসী রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। আমি মাসীকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলাম, মাসী তখন বলল।
আকাশ নিজের মনে মনে বলে,— 'রাধামাধবকে নিয়ে এত ভোরে?'
উদ্বিগ্ন মুখে তাড়াতাড়ি করে জিজ্ঞাসা করে,— কোথায় যাচ্ছে?
কুসুম ফুল গুলো হাতের মধ্যে গোছাতে গোছাতে বলে,— তা তো জানি না।
— কোন দিকে গেল দেখেছ? — আকাশ আবার জিজ্ঞাসা করে।
কুসুম আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,— তুমি চলে গেছ শুনে আমি তো দৌড়ে চলে এসেছি। আমি কি করে দেখব।
আকাশের কেমন যেন ভয় ভয় করে, গলা থেকে বুক অবধি একটা অস্বস্তি হয়, শিরদাঁড়া দিয়ে হিমেল স্রোত নামে। ভয়ের কারণটা বুঝতে পারার আগেই সাগরের বলা কথাটা মনে পড়ে যায়,— 'জানো ঠাকুর, যখন খুব কষ্ট হয় মনে, তখন কতদিন ভেবেছি বৌ ঠাকুরাণীর ঝিলে গিয়ে ডুবে মরি। কিন্তু পারিনি শুধু বাবার কথা ভেবে। বাবা চলে গেলে আমিও মুক্তি পেয়ে যাব। রাধামাধবকে বুকে করে বৌ —'
শরীরের ভিতরটা ভয়ে কাঁপতে থাকে আকাশের। গলা বুক শুকিয়ে যায়, মুহূর্তের মধ্যে আকাশের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অস্ফুট স্বরে বলে,— সাগর —!
কুসুম কিছু বুঝতে না পেরে নির্বাক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকায়। আকাশ দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে থাকে। সুটকেশটা পড়ে থাকে। কুসুম উঠে দাঁড়িয়ে সুটকেশটা দেখে নিয়ে, আকাশের দৌড়ে চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝে উঠতে পারে না কি করবে।

(১০১)

সাগর ঝিলের ঘাটে এসে দাঁড়ায়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। সূর্য্য ওঠার পূর্ব মুহূর্তের ভোরের শান্ত পরিবেশে ঝিলের চারিপাশের সবুজ দৃশ্যকে নয়ন ভরে উপভোগ করে সাগর।

আজ যেন সবকিছু কেমন নতুন করে দেখছে বলে মনে হয়। খুব ভালো লাগছে আজ সাগরের, বুকের ভিতরটা বেশ হাল্কা লাগছে। মুখ তুলে আকাশের রঙের খেলা দেখতে দেখতে মায়ের বলা কথাটা মনে পড়ে,— 'সংসারের মায়া আর মৃত্যু ভয়, এই দুটোকে যে করেছে জয়, সে সব কিছুতে থেকেও কোন কিছুতে নয়। ঈশ্বরের আশীর্বাদে পাবে মুক্তির অভয়।'

ঝিলেরা শান্ত কালো জলের দিকে তাকিয়ে সাগরের মনে হয়,— 'কত শান্তি লুকিয়ে আছে গভীরে।'
মাস্টার মশাইয়ের মুখটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে।
— 'আমায় শুধু আজ থেকে মা বলে ডাকিস।' — মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রীর বলা কথাটা যেন কানের কাছে বেজে ওঠে।
সাগরের মনে হয় মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী যেন বলছে,— 'মেয়ে হয়ে মাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিস!' গলার কাছে শুকনো একটা কিছু দলা পাকিয়ে আটকে আছে বলে মনে হয়। মনে মনে বলে,— 'মেয়েকে যে বাপের বাড়ি ছেড়ে যেতেই হয় মা। আজ যে তোমার মেয়ে এই প্রথম সুখী হতে যাচ্ছে।'
পদ্মর কথা মনে পড়ে,— 'আরতো কোনদিন দেখা হবে না, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি স্বামী পুত্র নিয়ে তোমার সংসার সুখের হোক।'

মনে মনে হাসে সাগর। চোখ থেকে জল গড়িয়ে বুকে ধরা রাধামাধবের মাথায় পড়ে। রাধামাধবকে তুলে ধরে তাকিয়ে হাসে। কান্না ভেজা গলায় বলে,— আমার ওপর রাগ কোরনা যেন, তুমিতো আমায় ডাকলে না, তাই আমি নিজেই যাচ্ছি তোমার কাছে।

নতুন করে একটা মিষ্টি গন্ধ অনুভব করে ডানদিকে ঘার ঘুরিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে দেখে সাগর। ফুলে ফুলে ভর্ত্তি হয়ে থাকা ঝিলের পাড়ে মহুয়া গাছটা নজরে আসে। উঁচু ডালটাতে একটা বৌ-কথা-কও পাখী যেন সাগরকে তাকাতে দেখে দুবার ডেকে ওঠে। সাগর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাধামাধবকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে ঘাটের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলে।

(১০২)

পিয়ালীকে পিছনে ফেলে বাগদী পাড়ার দিকে পাগলের মতো দৌড়তে থাকে আকাশ। পথ যেন আর শেষ হয় না। বহুদিন এভাবে জোরে দৌড়নোর অনভ্যাসে হাঁপ ধরে যায়, কিন্তু কোথাও দাঁড়নোর সময় নেই আজ। মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়ার সময় গলার ভিতর শুকিয়ে যাওয়া জায়গায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগে।

ডানদিকে বাঁক নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে পায়ে ধুতি জড়িয়ে লম্বা মেঠো রাস্তাটার ওপর আছড়ে পড়ে আকাশ। হাঁপাতে হাঁপাতে হাতে ভর দিয়ে ওঠার সময় কাঁপতে থাকে হাত দুটো। ওই অবস্থায় কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে আবার দৌড়তে থাকে আকাশ।

রাস্তার বাঁদিকে টালির চালের দোকান ঘর দ্রুত পিছনে চলে যায়। গায়ের ঢাকা দেওয়ার কাপড়টা কখন রাস্তায় পড়ে গেছে খেয়াল নেই আকাশের। খালি পায়ে ছুটতে ছুটতে ধুতিটাকে আরো একটু তুলে নিয়ে হাঁস গুলো ভাসতে থাকা পুকুরটাকে ডানদিকে রেখে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে আরো জোরে দৌড়নোর চেষ্টা করে। অন্যসময় হলে পুকুরটার কাছে দাঁড়িয়ে যেত আকাশ, কিন্তু আজ যে সময় বড় কম।

বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে আকাশের। পথ ফুরোচ্ছে না দেখে ভয়ে অধৈর্য্য হয়ে ওঠে।

(১০৩)

সামনে একটু দূরেই জল দেখা যাচ্ছে। ঝিলের শান্ত কালো জলের দিকে তাকিয়ে একটা একটা করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে সাগর।

বেশ কয়েকটা সিঁড়ি নামার পর একটা চওড়া চাতালের মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়। পিছন ফিরে ঘাটের উঁচু জায়গাটার দিকে তাকায়। চোখের নোনা জল গড়াতে থাকে। ঝিলের আশ পাশটা নজরে আসে। সকালের ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস এসে লাগে শরীরে। বুকে ধরা রাধামাধবের দিকে তাকিয়ে হাত বুলিয়ে দেয়। আকাশের মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আকাশের বলা কথা গুলো মনে পড়ে,— 'আমি চলে গেলে যাওয়ার পর তুমি কি করবে? তুমি এই বাড়িতেই থাকবে তো। আমায় আবার আসতে বলবে না?'
মনে মনে হাসে সাগর, বলে,— 'তুমি এখনো শিশুর মতই সরল।'
রাধামাধবের দিকে তাকিয়ে বলে,— তুমি ওকে দেখো।
সিঁড়ি দিয়ে আবার নামতে থাকে সাগর।

নেমে এসে জলের কাছে দাঁড়িয়ে যায়। পায়ে জলের ঠাণ্ডা স্পর্শে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে পায়ের গোড়ালী জলে ডুবেছে।। ঝিলের ওপারে গাছ গুলোর দিকে মুখ তুলে তাকায় সাগর। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ঋজু ছাতিম গাছটায় হাল্কা করে সোনালী আভা এসে পড়েছে। দুরন্ত রবি আবার একবার নতুন করে নিজেকে প্রকাশ করার পথে।

সকালের সূর্য্যদয়ের সাথে স্নিগ্ধ বাতাস গায়ে মেখে সাগরের জীবনের শেষ অঙ্কের খেলায় রাত্রির অন্ধকারের পদধ্বনি। গভীর ঝিলের শান্ত কালো জলের হাতছানির দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে সাগর। একটু একটু করে জলে নামতে থাকে। জলে বাড়তে বাড়তে হাঁটু অবধি ডুবে যায়।

(১০৪)

দুধারে সারি বদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে তাল গাছগুলো যেন আকাশকে এইভাবে ছুটে যেতে দেখে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। নিজেদের মধ্যে খেলায় মত্ত তিনটে ছাগলছানা আকাশকে দৌড়ে আসতে দেখে লাফাতে লাফাতে রাস্তার একধারে সরে গিয়ে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আকাশ কাছে আসতেই যত জোরে সম্ভব ছোট ছোট পায়ের সাহায্যে কচি গলায় কাঁপা স্বরে 'ম্যা -ম্যা' ডাক ছেড়ে প্রাণ ভয়ে পালাতে থাকে।

ধানের গোলাটাকে বাঁদিকে রেখে ডানদিকের দুধারে বেতের ঝোপের মাঝখান দিয়ে যাঁকা বাঁকা রাস্তাটায় বাঁক নিয়েই আর একটু হলে একজন মাঝবয়সী বিড়ি মুখে গামছা পড়া, কানে পৈতে জড়ানো লোকের সাথে ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল। কোন মতে দ্রুত কাত হয়ে লোকটার পাশ কাটিয়ে দৌড়তে থাকে আকাশ।

খালি গায়ে ধুতি পরে আকাশকে হঠাৎ বাঁক নিয়ে ধুমকেতুর মতো ধেয়ে আসতে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে তাড়াতাড়ি সরে যেতে গিয়ে বেতের ঝোপের খোঁচায় নিম্নাঙ্গের গোপন স্থানে ব্যাথা পেয়ে, মুখ দিয়ে ওক্ করে একটা আওয়াজ করে তড়িতাহতেব মতো ছিটকে আবার সরে আসে লোকটা। মুখ থেকে বিড়িটা পড়ে যায়, নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে থাকে।

আকাশ ততক্ষণে অনেকটা দূরে চলে গেছে। লোকটা নিম্নঙ্গের আঘাত প্রাপ্ত স্থানে হাত বোলাতে বোলাতে দূরে ছুটে যাওয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে রাগত ভাবে চেঁচিয়ে বলে,— পাগল নাকি, চোখের মাথা খেয়েছ!

আকাশ ভ্রূক্ষেপ না করে বিদ্যুত গতিতে এগিয়ে যায়।

হাত বোলাতে বোলাতে কিছু একটা অন্যরকম অনুভব করে লোকটা তাড়াতাড়ি করে হাত সরিয়ে স্থানটাতে দৃষ্টি দেয়। কয়েক মুহূর্তে তাকিয়ে থেকে নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে যায়,— হাই যা!
দ্রুত পিছন ঘুরে বেতের ঝোপের দিকে তাকিয়ে দেখে নিজের পরণের গামছাটা ঝুলছে।
— আ — মরণদশা, দেখো বেটাচ্ছেলের কম্ম।
কথাটা বলতে বলতে দুপা এগিয়ে গিয়ে গামছাটা হাতে নিয়ে আকাশের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আবার বলে,— সকাল বেলা আমায় ন্যাংটা করে দিয়ে চলে গেল গা।

আকাশ ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়াতে তাড়াতাড়ি করে গামছাটা কোমরে জড়াতে জড়াতে চারিদিকে একঝলক্ দেখে নেয়, কেউ দেখছে কিনা।

এগোতে গিয়েই মাটিতে পড়ে থাকা জলন্ত বিড়িটার ওপর পা পড়ে যাওয়াতে চমকে উঠে লাফিয়ে সরে যায়। পড়ে থাকা বিড়িটা সজোরে লাথি মেরে সড়িয়ে দিয়ে বলে,— ধ্যাস্ শালা। কথা শেষ হয় না, লাথি মারতে গিয়ে শরীরের ঝাঁকুনিতে গামছাটা আবার খুলে গিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। ওই্ভাবেই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, গামছাটার দিকে দেখতে দেখতে বলে,— আ-মোল যা, এটাও শুরু করেছে, বলি হলোটা কি!

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় লোকটা। কান থেকে পৈতেটা খুলতে খুলতে করুন মুখে বলে,— নাহ্ আজ আর হবে না। বেগটাই চলে গেছে। বিড়িও নেই আর।
পিছন ফিরে আকাশের উদ্দেশ্যে বলে,— অনামুখো, অনামুখো।
তারপর আক্ষেপের সুরে বলে,— আজ শালা দিনটাই খারাপ, এখন আমি কি করি?
রাগ মিশ্রিত গলায় বলে,— আমি তখনই জানতুম, যখনই দাওয়ায় বেরিয়ে হাঁড়ি খেকোটার মুখ দেখেছি। যাই, টেঁপার মাকে গিয়ে বলি। — কথাটা বলে তাড়াতাড়ি করে হাঁটতে থাকে লোকটা।

জলের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে নেমে যেতে থাকে সাগর।

আস্তে আস্তে ঝিলের জল সাগরের কোমর স্পর্শ করে। দাঁড়িয়ে গিয়ে একবার ওপরে মুখ তুলে চায় নতুন প্রভাতের নীল আকাশের দিকে। তারপর শেষবারের মতো আর একবার পিছন ফিরে চারিদিকের মায়া জড়ানো সবুজকে দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে ঝাপ্‌সা চোখ দুটো কনুই উঁচু করে ব্লাউজের হাতায় মুছে নেয়। বৌ কথা কও পাখীটাকে তখনও গাছের ডালে বসে থাকতে দেখে সাগর কয়েক মুহূর্তে তাকিয়ে থাকে। ছোট্ট পাখীটা কেমন যেন স্তম্ভিত দৃষ্টিতে পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে।

সাগর আবার ঝিলের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, পাথরের রাধামাধবকে আরোও শক্ত করে চেপে ধরে ধীরে ধীরে নামতে থাকে জলের মধ্যে।

কিছুক্ষণ আগেও ঘুম ভাঙা পাখীদের মিষ্টি মধুর ডাকে মুখরিত, নতুন আলোয় উদ্ভাসিত নতুন সকাল হঠাৎ কেমন যেন থমকে গেছে। অদ্ভুত একটা নীরবতা শুরু হয়েছে, বুঝি কোন আগাম কোন শোকবার্তায়।

একঝাঁক টিয়া পাখীর দল বিচিত্র সব কর্কশ আওয়াজ তুলে ঝিলের ওপর দিয়ে দ্রুত উড়ে যায়। যেন ঘটতে যাওয়া কোন মর্মান্তিক ঘটনার প্রতীক। এই নিদারুন দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে থাকতে চায়না ওরা। নিষ্ঠুর পরিণতির কঠিন বোঝা ওদের ছোট্ট হৃদয় বইতে পারবে না হয়তো।

ধীরে ধীরে ঝিলের জল বুক স্পর্শ করে সাগরের, রাধামাধবকে মুখের সামনের তুলে ধরে চোখে চোখ রেখে এগিয়ে যায় সাগর। আজ মধুসূদনের মুখে অদ্ভুত এক দুষ্টুমি ভরা রহস্যময় হাসি লক্ষ করে সাগর। মনে মনে বলে,— 'আজ আর আমায় কিছুতে ভোলাতে পারবে না তুমি। তোমার এই হাসি ভরা মুখ আমার চোখের সামনে রেখেই আমার জীবনের সমাপ্তি হবে। এই ঝিলের জলেই আজ তোমার সাগর চিরকালের মতো মিলিয়ে যাবে।'

আরো নীচে নেমে যায় সাগর। ঝিলের জল কাঁধ স্পর্শ করে। হঠাৎ একটা হাত এসে কাঁধটা শক্ত করে চেপে ধরে সাগরের। বাধা না মেনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সাগর। অন্যকাঁধে আর একটা হাত এসে আটকায় সাগরকে।

সাগর ঘুরে তাকায়। বিধ্বস্ত চেহারায় আকাশকে হাঁপাতে দেখে অবাক দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করে,— ঠাকুর তুমি!

আকাশ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,— উঠে এসো জল থেকে।

সাগর তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। আকাশ উদ্বিগ্ন মুখে ধমকেব সুরে বলে,— উঠে এসো বলছি।

সাগর এক হাতে আকাশের হাত ধরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে ঘাটের চাতালটায় দাঁড়ায়। আকাশ সাগরের হাত ছেড়ে দেয়। সাগর জিজ্ঞাসা করে,— তুমি যাও নি?

— তুমি যেতে দিলে?

— কেন ঠাকুর, আমি আবার কি করলাম?

গম্ভীর হয়ে আকাশ বলে,— জানো না কেন!

সাগর হেসে মজা করে বলে,— সেকি ঠাকুর! তুমি তো শরীরের ডাক্তার, মনের ডাক্তার হলে কবে?
— ঘরে চলো।
— আমার আবার ঘর কোথায়? এখনতো আমার আর কোন ঘর নেই।
কয়েক মুহূর্ত সাগরের চোখে চোখ রেখে আকাশ ডাকে,— সাগর।
— বলো।
— বলছি কি —
— বলোই না।
— না মানে, তুমি —
সাগরের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকে আকাশ। সাগর আকাশের চোখে চোখ রেখে মিটি মিটি হাসতে থাকে। আকাশের অস্বস্তি হয়। সাগর একটু এগিয়ে এসে বলে,— মানেটা বাদ দিয়ে বলেই দেখো না! লজ্জা করছে?
সাহসে ভর করে, একটু নীচু গলায় আকাশ বলে,— আমার নিজের অজান্তেই কখন যে তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি, বুঝতেও পারিনি। চলে না গেলে জানতেও পারতাম না। তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।
সাগর হেসে বলে,— মন ভোলাচ্ছ, না দয়া করছ?
— দয়া করবো তোমায়! তোমাকে যে দয়া করতে চাইবে, সে যে নিজেই দয়ার পাত্র হবে, সাগরকে কখনো দয়া করা যায়?
সাগরের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি করে ভিজে হাতে চোখটা মুছে নেয়।
— আমি ফিরে আসাতে তুমি খুশী হওনি?
— তোমাকে পাওয়াটা যে, আমার পরম সৌভাগ্য।
— তাহলে তো কই বললে না?
— কি?
— তুমি আমার হবে?
ধরা গলায় সাগর বলে,— এই ছোট্ট কথাটা বলতে এতটা সময় লাগিয়ে দিলে ঠাকুর! সে তো আমি কখন হয়ে গেছি। তুমিই তো আমায় গ্রহণ করতে পারোনি।
— বলোনি কেন?
— আমি যে সবসময় শুরুটা দেখেছি, শেষটা দেখতে পাইনি, তাইতো তোমায় বলিনি।
— তোমাকে এভাবে একলা ফেলে রেখে চলে গিয়ে যে অন্যায় আমি করতে চলেছিলাম তার কোন ক্ষমা হয় না জানি, তবুও বলছি, আমায় তুমি ক্ষমা কোরো।
— এরকম করে বোলো না গো, আমার যে পাপ হবে। আমার ঠাকুরের ওপর আমি কখনও রাগ কতে পারি! তোমার সাথে প্রথম দেখাতেই মনে হয়েছিল তুমিই সেই লোক, যাকে মধুসূদন আমার জন্যই পাঠিয়েছিল। আমি যে তোমার মধ্যেই আমার মধুসূদনের হাসি দেখেছি।
আকাশ হেসে বলে,— তুমি কিন্তু আজ হেরে গেছ। আমিই জিতলাম। কারণ, সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ, সংকোচ, আমার সব অহংকার ফেলে দিয়ে, আমিই তোমার কাছে প্রথম এলাম, তুমি কিন্তু পারোনি।
সাগর আকাশের চোখে চোখ রেখে বলে,— তোমার কাছে জিততে তো আমি কখনোই চাইনি!

তোমার কাছে হারাটাই যে আমার জিৎ, আমার অহংকার, আমার গর্ব।

— জানো সাগর, মানুষ নিত্য তার পূজো করে, যে নিরাকার, কোথায় থাকে জানে না। কিন্তু যে আমাদের পাশে আছে, কাছে আছে, তাকে আমরা চিনতেও পারিনা।

সাগর চোখ নাচিয়ে হেসে বলে,— জীবের সেবা!

— না, হৃদয়ের।

— সে কি গো ঠাকুর, তোমার চোখে জল! — কথাটা বলে সাগর আকাশের চোখের কোলে হাত দিয়ে আকাশকে আঙুলটা দেখায়।

— কই নাতো!

কথাটা বলতে বলতে আকাশ তাড়াতাড়ি করে চোখের তলায় হাত দিয়ে ভেজা অনুভব করে অস্বস্তিতে পড়ে যায়। বলে,— আরে— তাই তো! এই জলটা এতদিন পরে বেরিয়ে এলো কি করে?

কয়েক মুহূর্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে সাগর আরোও কাছে এগিয়ে আসে, তারপর আবেগ জড়ানো গলায় বলে,— ভালোবাসার কথা বলতে পারো, আর, সোহাগ করতে পারো না? সোহাগ এইভাবে করতে হয়।

সাগর আকাশের গায়ের সাথে মিশে গিয়ে আস্তে করে বুকে মাথা রাখে। আকাশ সাগরকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। সাগরের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। একটা পান কৌড়ি ঝিলের জলের ভিতর ডুব দেয়।

ওইভাবে কেটে যায় কয়েকটা মুহূর্ত।

আকাশ একহাতে সাগরকে জড়িয়ে ধরে আর একহাতে সাগরের মুখটা তুলে ধরে। সাগর টানা কালো চোখের বড় বড় ভেজা পাতা মেলে আকাশের চোখের দিকে তাকায়। আকাশ তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর এক হাত দিয়ে সাগরের চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলে,— তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছিল না। অনেক চেষ্টা করেও বলতে পারিনি।

— তবুতো চলে গেলে।

— যেতে আর পারলাম কই? সাগরকে ছেড়ে আকাশ কি কখনো যেতে পারে! সাগর আর আকাশের যে অনন্তকাল ধরে নিবিড় সম্পর্ক।

সাগর আকাশের বুকে মাথা রেখে আবার চোখ বোজে। আকাশ সাগরকে জড়িয়ে ধরে নিজের গালটা সাগরের মাথায় ঠেকিয়ে চোখ বোজে। পত্র বিরল শাল গাছটার মধ্যে দিয়ে সকালের প্রথম সোনালী রোদ্দুর এসে পড়ে দুজনের ওপর।

আঁধার প্রদীপ